প্রথম ভাগ

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

কোন্ সালের কোন্ তারিখে আমার জন্ম হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। সেকথা বাবা-মার মুখ থেকে শুনলেও ভুলে গেছি। আমি বড় হয়ে নিজের মনেই একটা সালের কথা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। আমার জন্ম তারিখ না দিলে যেসব জায়গায় নেহাতই কাজকর্ম চলেনা, সেসব জায়গায় কাজে লাগিয়েছিলাম সেই কল্পিত তারিখটা। কারো প্রয়োজন হলে আমার প্রচারিত সেই কল্পিত সন-তারিখটা জানাতে পারি এখন। সেটা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস। অবশ্য এর দ্বারা কার যে কী লাভ লোকসান তা বলতে পারিনে। এই পৃথিবীতে আমার আরোপিত এই সালটির দুচার বছর আগে বা পরে অন্নাসুর ধ্বংস করতে আমার আসল যেদিন জন্মগ্রহণ—তার সঠিক খবর শুনে কিম্বা জেনে লোকসমাজের কিই বা লাভ-লোকসান বা উপকার-অনুপকার হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে।

আমাদের পরিবারে কারো যে জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী করা হয়নি, তা নয়; বরং এই রীতিই নিখুঁতভাবে প্রচলিত এবং এখনও সেটা চলে আসছে। পূর্বাপর প্রচলিত প্রথামতে আমার কোষ্ঠীও করিয়েছিলেন পিতৃদেব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; এবং সেই কোষ্ঠী বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠীর মতো অতি যত্ন করে এবং সাবধানে একটা পোঁটলার মধ্যে যে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেকথাও নিশ্চিত আমি জানি। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম সেই পোঁটলাটি। বাবার হুকুম ছিল না বলে আমরা ছেলেমেয়েরা সেই পোঁটলাটি ঘাঁটাঘাটি করতে পারতাম না। পিতৃদেবের প্রতি যে আমাদের অশেষ ভয় ও ভক্তি ছিল, সেকথা আর বেশী কি বলব! তিনি যদি কোন কাজ করতে আমাদের বারণ করতেন তা আমরা মোটেই করতাম না। কোন বিষয়ে তাঁর অবাধ্য হওয়া অথবা তাঁর মুখে মুখে জবাব দেওয়া আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমাদের উপরি-উক্ত এই ভাগ্যের লিখন ভাল করে বেঁধে-ছেদে পোঁটলায় রেখে আমাদের হাত দিতে বারণ করেছেন যখন—ব্যস! আমরা তার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রায়। তবুও একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন,

আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ দু একজনে লুকিয়ে চুরিয়ে কখনও সখনও সেই পোঁটলারূপী জ্ঞানবৃক্ষের স্বাদ যে একেবারে আহরণ করে নি তা নয় এবং সেই ফলের এক-আধটুকরো আমরাও যে পাইনি—এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগর গবর্নমেণ্ট হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে আমি কলকাতায় এসেছিলাম পড়তে। তার দুবছর পরে আমি যখন এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম আমি আর সেই আগেকার ছোট ছেলে নেই ; বড়দের দলে 'প্রমোশন' পেয়ে গেছি। অতএব ছোটবেলাকার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে এরপর আর কোন বাধা থাকবে না, আশা করে নিলাম। তাই কলকাতা থেকে আমার কোষ্ঠীখানা চেয়ে বাবাকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু এফ. এ. পাস করেই যে আমি স্বাধীন হয়ে গেছি, একথা ভাবতে বাবার বিশেষ আপত্তি না থাকলেও আমার চিঠিতে কী যে দূরদৃষ্টির আভাস দেখতে পেলেন তিনি—যার ফলে আমাকে ভুল বুঝলেন একেবারে! তিনি ভেবে নিলেন মনে মনে আমি এখন বিলেত যাবার ফন্দি এঁটেছি এবং সেই কারণেই হয়তো বা আমার কোষ্ঠীর এত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাজেই চিঠির জবাবে কোষ্ঠীর পরিবর্তে পেলাম বকুনি ও বিলেত যাত্রার বিরুদ্ধে শুনতে হল অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞা। তবে আমার এই কোষ্ঠী চাওয়ার ব্যাপারে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না সেকথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য কিছুকাল পরে আমার মনে ঐ রকম একটা আকাঙ্ক্ষার কথা যে জাগেনি তা নয় এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে যে চেষ্টাও করিনি—এমন কথা শপথ করে বলতে পারিনা। কিন্তু পিতৃদেবের সেই অলঙ্ঘনীয় নিষেধ আমার অদম্য আকাঙ্ক্ষার মঞ্চে চড়ে আমার চুলের মুঠি ধরে যে পিতৃভক্তির পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে এবং তাতে শুধু আমার মন নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠেছিল মাত্র। প্রপিতামহ পিতামহদের আমলের সংগৃহীত পুঁথিগুলো আমার পিতা অত্যন্ত যত্নসহকারে রেখেছিলেন এবং তারই সঙ্গে রাখা ছিল আমাদের কোষ্ঠীগুলো, কিন্তু পিতৃদেব পরলোকগমন করার পর পুঁথিগুলো ও কোষ্ঠীর সেই পোঁটলাটি যে কোথায় হারিয়ে গেল, আজ অবধি তার কোন হদিশ মেলেনি। এই সব কারণে আমার জন্ম সাল সম্পর্কে আমার এই অজ্ঞতার ইতিবৃত্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত কৈফিয়ৎ, পাছে কেউ চায়

তার সন্তুষ্টির জন্য এইটুকু লিখলাম নতুবা এ নিছকই অনাবশ্যক ও অবান্তর মাত্র।

আমার জন্মস্থান—কোথায় যে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল, আমি ঠিক করে বলতে পারলাম না। জীবিতদের মধ্যে কেউ জানে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। তবুও এর প্রকৃত কারণটা বলতে আমি অবশ্যই বাধ্য। আমার জন্ম বিবরণের শোনা কাহিনী নিচে উদ্ধৃত করলাম।

পিতৃদেব মুন্সেফের কাজে নগাঁও থেকে বরপেটা বদলি হয়ে নৌকো করে যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে আসামে আজকের মতো জাহাজ চলাচল করত না। তখন সন্ধেবেলা। আহঁতগুরি নামে একটি জায়গাতে নদীর কিনারে নৌকা বাঁধা হল। আমার মা বালির চরে কিছুটা কাপড় আড়াল করে দিয়ে তার ভিতরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে ঢুকলেন। এমন সময় তাঁর শরীর অসুস্থ বোধ হওয়াতে তিনি রান্নাবান্না ফেলে দিযে নৌকার ভিতরে ঢুকলেন। আজকের এই জীবনস্মৃতির লেখক তখনকার কোন এক শুভ মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ না হয়ে নৌকায় জন্ম নিল। শুনেছিলাম, সেদিন ছিল লক্ষ্মীপূর্ণিমা। তাই এই লেখকের নামকরণ করা হয়েছিল লক্ষ্মীনাথ। সেই ঘটনাটি ছিল এই রকম। আঁহতগুরির কাছের ব্রহ্মপুত্রের বালির চরে রাঁধা সেই ভাত কখন যে তলিযে গেল, সেই বালির ঢিবি খসিয়ে শান্তনুকুলনন্দন অমোঘ-গর্ভসম্ভূত লৌহিত্য আবার তাকে কোথায় নিয়ে বসাল, আমার ভারসহিষ্ণু ব্রহ্মপুত্রের সেই চলমান স্রোত কোথায় বয়ে গেল, আমার জন্মকোঠা কাঠের সেই নৌকোখানা ফেটে ভেঙে পচে কোথায় কোন্ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল তা কে জানে, কে বলতে পারে? হয়ত ব্রহ্মপুত্রের সেই চলমান জলের স্রোত সাগরের জলে মিশে কালক্রমে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে মেঘ হয়ে বাতাসের প্রকোপে আবার বৃষ্টিধারায় ব্রহ্মপুত্রে বর্ষিত হয়ে সেই জল বয়ে গিযে আবার সমুদ্রে বিলীন হযে কতবার যে পরিবর্তনের খেলা খেলেছে—আবার হয়তো তারই একফোঁটা জল কালো এই কালির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আজকের এই লেখকের মসীপত্রে ঢুকে লেখকের জীবনস্মৃতি লেখার সহায়ক হয়ে পড়েছে, তা কে জানে, কেই বা বলতে পারে?

আমাদের আসামে ছেলে জন্মগ্রহণ করলে উলু দেয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়। মেয়ে জন্মালে ঢেঁকি ভানে, কুলো বাজায়। প্রবাসে এই বালুর চরে আমার

জন্মোৎসব উপলক্ষে কে কী করেছিল বলতে পারিনে, তবে আমার একজন দাদা নাকি আনন্দে পিছনে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে নেচে নেচে বলেছিল—আজ থেকে আমরা পাঁচজন হলাম। এই কথা আমি অবশ্য জানতে পেরেছিলাম বড় হওয়ার পর।

বরপেটাতে বাবা মুন্সেফ হয়ে বছর তিনেক ছিলেন। বরপেটার সেই স্মৃতির মধ্যে চারটে কথা আমার আবছা আবছা মনে আছে।

প্রথমটি : বর্ষাকালে শহরটি নদীর জলে ডুবে যেত। একবার সেরকম বৃষ্টি হলে আমাদের ঘরের উঠোনে এক হাঁটু সমান জল জমে যায়। তখন আমরা দাদা ও ভাগনেরা মিলে জলে নেমে সারাদিন একজন আরেকজনকে তাড়া করে বেড়াতাম। সন্ধেবেলা বাবা কাছারী থেকে ফিরে এই কথা জানতে পেরে আমাদের কয়েক ঘা লাগান।

দ্বিতীয়টি : সেইরকম বর্ষায় বাবার সঙ্গে নৌকো করে কোথাও বেড়াতে গেলে দেখতে পেতাম—দূর থেকে বন্য মোষগুলোর কালো কালো শিং আর নদীতে ওদের সাঁতার কাটার দৃশ্য।

তৃতীয়টি : পিতৃদেবতার সঙ্গে প্রায়ই আমরা বরপেটার কীর্তনঘরে যেতাম। কীর্তনঘরের মাঝের বড় থামগুলো, প্রদীপ সাজাবার জায়গা আর বসবার চাতাল এই তিনটে স্মৃতি আজও আমার মনে পড়ে।

চতুর্থটি : সত্রের চাতালে সত্রের অধিকারীর ঘরের ভিতর হাতীখুজীয়া[১] বাটিতে মোষের দুধের পাতা দৈ আর গুড় দিয়ে সুবাসিত কোমল চাল বা বোকা চাউল[২] সহযোগে জলপান করতাম।

বরপেটা থেকে বাবা বদলি হয়ে আসেন তেজপুরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বের নানা উপসর্গ এবং প্রত্যয় দূর হল। নৌকো করে আসার সময় মনে আছে, বাবা আমাদের দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে—'ঐ যে হাতী-মূরা পর্বত! ঐ তো পোরাপাহাড়, ঐটে শিঙগরি ইত্যাদি' বলতেন।

মনে আছে একদিন আমাদের নৌকো যখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে বেয়ে আসছিল, তখন দেখতে পাই একটি মাদী হরিণ পারের কাছে মরে পড়ে আছে।

---

১ হাতীখুজীয়া বাটি অর্থাৎ হাতীর পদচিহ্ন আঁকা চওড়া এক প্রকারের বাটি।

২ বোকা চাউল—এক প্রকার চাল, চিঁড়ের মত ভিজিয়ে দিলে ফুলে ভাত হয়ে যায়। যেমন সুন্দর গন্ধ, তেমন সুন্দর খেতে।

নৌকো কাছে আসতেই মাঝিরা হরিণটাকে নৌকাতে তোলে। দেখে অনুমান হল, কিছুক্ষণ আগেই হয়তো হরিণটা নিহত হয়েছে। কারণ তখনও হরিণটার গায়ে বাঘের আঁচড়ের দাগ; ওর ক্ষত থেকে রক্ত টুপ্‌টুপ্‌ করে ঝরে পড়ছিল। বোধহয় পাহাড়ের গায়ে বাঘ হরিণটাকে ধরে আর দুজনে ধস্তাধস্তি করে গড়িয়ে নদীর পারে পড়ে যায়। ঠিক এমন সময় আমাদের নৌকোটা দেখে বাঘটা যায় পালিয়ে। সে যাই হোক, আমাদের নৌকোর মাঝিমাল্লাদের তো মহা আনন্দ যে ওরা একটা গোটা হরিণের মাংস পেট ভরে খেতে পাবে। আমাদের মনেও সেইরকম ভাবনা যে খেলেনি তা নয়। কিন্তু আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হল না—হল মাঝি মাল্লাদের। কারণ হরিণটা মাদী, সেজন্য তার মাংস বাবাও খান নি আর আমাদেরও খেতে দেন নি। বালকগণের মৃগ মাংস ভোজনের প্রবল প্রবৃত্তি এইরকমভাবে নিবৃত্ত হল। জীবিত অবলা জাতীয় প্রাণীর শক্তির কথা ছেড়েই দিলাম, মৃত অবলা যে কত প্রবলা হতে পারে তার প্রমাণ পেলাম হাতে হাতে।

তেজপুরে এসে আমরা কোথায় উঠেছিলাম, কার ঘরে ছিলাম আর কখন যে নিজেদের আলাদা বাড়ীতে চলে এলাম সেসব কথা আমার কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে তেজপুরের পাহাড়ের উঁচু নিচু টিলা আর লাল মাটির রাস্তাঘাট। এইসব দেখে আমার মনে কী আনন্দই না হত! তেজপুরের আরও কয়েকটা কথা আমার মনে আছে: যথা (১) আমাদের বাড়ীর কাছেই খোলা জায়গা এক টুকরোতে সুন্দর সুগন্ধ ফুলে ভরা বন্য 'ঢেপাইতিতার' গাছগুলো। (২) বাবার সঙ্গে আমাদের নিকামুল সত্রে যাওয়ার কথা। (৩) তেজপুরে কুমোরদের একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের কুমোরেরা প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ী আর আমাদের জন্যে নিয়ে আসত মাটির ঘুণ্টি আর খেলনা। (৪) আমার ভাই লক্ষ্মণের জন্ম হয়েছিল তেজপুরে; লক্ষ্মণ জন্মাবার দিন চারেক পরেই আহিনী নামে আমাদের এক পরিচারিকার একটি ছেলে হয়। লক্ষ্মণকে যখন বিলিতি 'পেরাম্বুলেটর' বা শিশু ঠেলাগাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত তা দেখে আহিনীর ছেলে টৌরামও সেই ঠেলাগাড়ীতে ওঠার জন্য বায়না করে কাঁদত। সেজন্য বাবা একজন ছুতোর ডাকিয়ে কাঠের তক্তার তৈরী খোলা কাঠের গাড়ী একটা ওকেও করিয়ে দেন। সেই গাড়ীতে উঠে টৌরামের যে কী আনন্দ হত তা বলা যায় না আর তা দেখে বাবাও মহা আনন্দ পেতেন।

আমাদের সর্বদা তত্ত্বাবধান করতেন এবং বেড়াতে নিয়ে যেতেন আমাদের এক দূর সম্পর্কের দাদু, তাঁর নাম রবিনাথ মাজুমদার বরুয়া। সম্পর্কে তিনি যদিও আমাদের দাদু কিন্তু বয়সে আমার বাবার চেয়ে অনেক ছোট। তিনি আমাদের খেলার সংগী, অভিভাবক, গল্পের থলে, আর রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ আদি কাহিনীর বটুয়া ছিলেন। সন্ধেবেলা তিনি আমাদের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে ভাল ভাল উপাখ্যান গল্পের ছলে এত সুন্দর করে বানিয়ে বলতেন যে আমরা শুনে ভীষণ আনন্দ লাভ করতাম। পুরাণের কাহিনী ব্যতিরেকেও দাদু আমাদের রাজা-রাজড়া এবং ভূত-প্রেতের গল্প বলে আনন্দ দিতেন ও ভয়ও দেখাতেন। আমরা কাঁদলে তিনি 'বড় বুড়ো' 'মাজু বুড়ো' আর 'সরু বুড়ো' অর্থাৎ ছোট বুড়ো—এই তিন বুড়োর গল্প এমন রঙ চড়িয়ে ভয়ংকর করে বানিয়ে বলতেন যে আমরা কান্না ছেড়ে দিয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু। একদিন রাস্তা দিয়ে এক অদ্ভুত পোশাক পরা এক বুড়োকে যেতে দেখে তিনি আমাদের ডেকে বলেন—'ছেলেরা দেখবে এস. ঐ যে মেজ বুড়ো যাচ্ছে।' দৌড়ে গিযে মেজো বুড়োকে ঐ রকম পোশাকে দেখতে পেয়ে এমন ভয় পেযে গিযেছিলাম যে প্রায মাস খানেকের জন্য আমরা কান্না কাটি, বদমাযেসি ও দুষ্টুমি প্রাযই ছেড়েই দিয়েছিলাম। তখন দাদুকে অনুনয় বিনয় করে বলি, তিনি যেন মেজ বুড়োকে আমাদের ধরে না নিতে বলেন। সব দিক দিয়েই আমাদের এই পরাজয় এবং নিজের জযটাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতেন দাদু। কিন্তু পরাজযের এই হীনমন্যতা আমাদের মনে স্থাযী হয়নি বেশীদিন এবং তা হওয়াও সম্ভব নয। অচিরেই আমাদের কোমল হৃদযে সঞ্চিত 'মাজু বুড়ো' সম্পর্কীয় বিভীষিকা কোথায় যে উড়ে গেল। এরপর থেকে দাদু যখন বলতেন মাজু বুড়ো এসেছে তখনই আমরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটতাম তাকে খতম করার জন্য।

সুযোগ পেলেই আমরা দাদুকে ঠাট্টা না করে ছাড়তাম না। একদিন আমরা দাদুর মাথায় দু-একটা পাকা চুল আবিষ্কার করে তৎক্ষণাৎ দাদুর কাছ থেকে সরে এসে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে গাইলাম—'দাদু বুড়ো হযেছে, দাদু বুড়ো হয়েছে'। দাদু তক্ষুণি আমাদের দিয়ে পাকাচুলগুলো উঠিযে ফেললেন। সেদিন থেকে আমরা ছড়া কেটে দাদুকে এরকমভাবে রাগাতাম ; আর উনি যখন আমাদের দিকে তেড়ে আসতেন, তখন আমরা

খিল্ খিল্ করে হেসে পালিয়ে যেতাম। দাদুকে খেপিয়ে যে ছড়াটা আমরা বলতাম, সেটা আমরা নিজেরা কেউ রচনা করিনি, কারণ সেরকম ছড়া সেই বয়সে আমাদের দ্বারা রচনা করা সম্ভব নয়। দাদুর মাথায় পাকা চুলের এই আকস্মিক আবির্ভাবের কথা আমাদের কাছ থেকে দাদুর কোন বিপক্ষদলের কোন্ যে প্রতিভাবান রসিক দাদুর পাকা চুলের বিষয়ে কবিতা রচনা করে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা মনে নেই আমার। কিন্তু দাদুকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখবার মত এমন ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের হাতে দ্বিতীয় আর কিছু ছিল না।

দাদুকে বাবা নাম ধরে না ডেকে মাজুদলর বরুয়া বলে ডাকতেন। দাদুদের পরিবার এই উপাধি পেয়েছিলেন রাজপরিবার থেকে। ঠাকুরঘরে মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা পুজো করার ভার ছিল দাদুর ওপর। ঠাকুরঘরে নাম প্রসঙ্গ শেষ হলে তিনি অনেক বিস্তারিত পাঠ শোনাতেন। আশীর্বাদ পাঠ শোনাতেন বাবাকে এবং আমাদের। পাঠ শেষ হলে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করতেন। দাদুর আশীর্বাদ পাঠের বিস্তারিত গৎ আজও আমার মনে আছে।

সকালে দাদু কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। অথচ আমাদের বাবা খুব ভোরে উঠতেন, ব্রাহ্ম মুহূর্তেই তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। বেলা অবধি কাউকে ঘুমুতে দেখলে বড়ই অসন্তুষ্ট হতেন বাবা। দাদু বেলা অবধি ঘুমুতেন বলে তাঁকে বকুনি দিয়ে ঘুম থেকে ওঠানো বাবার একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে বাবা দাদুকে 'ঘুম-কাতুরে' 'আল্সে গতর' প্রভৃতি ডাকে সম্বোধন করতেন। দাদু কিন্তু নিদ্রাসুখে অটল। হাজার বকুনি খেয়ে তিনি একটা কথাও বলতেন না। 'ঘুম-কাতুরে' প্রভৃতি উপযুক্ত সম্ভাষণের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেও সকালের নিদ্রাসুখ ষোল আনা তিনি উপভোগ করতে ছাড়তেন না। কাজেই পিতৃদেব ও পিতামহের এই প্রাত্যহিক প্রাতর্যুদ্ধটা আমাদের একটা উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

বাবার সঙ্গে একত্র মেঝেতে বসে আহার করা আমাদের নিত্য নিয়ম ছিল। আমাদের বাড়ীতে ভাত খাবার ঘর বা জায়গা ছোটখাট ছিল না; তাতে বিশ পঁচিশজন নির্বিবাদে চারদিকে সারি পেতে বসে খেতে পারত। আর সেরকম-ভাবেই রোজ খাওয়া হত আমাদের। বাবা পূর্বদিকে পশ্চিমমুখো হয়ে

বসতেন আর অন্যান্য সবাইকে উত্তর দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখোমুখি হয়ে বসতে হত। বেড়ার উপরে যে কাঁসার থালা রাখা হত তাতে করে বাবা ভাত খেতেন আর সেই থালার চারপাশে তিন চারটে তরকারির বাটি দেওয়া হত সাজিয়ে। বাবার থালার পাশে জামবাটিতে করে দুধ দেওয়া হত। খাবার ঘরের বেড়াতে খেতে বসার পিঁড়ি, মুখ ধোবার পিকদানি ও খড়কে কাঠি রাখার পাত্রও থাকত। খড়কে কাঠির পাত্রে এক থোকা ভাল করে কাটা খড়কেও রাখা হত। বাকী সবাইয়ের থালা রাখা হত মেঝেতে। সভায় সভাপতির যা কাজ আমাদের মেঝের সভাতেও বাবার অনুরূপ কাজ ছিল। খেতে বসে কত যে সব গুরুগম্ভীর কথাবার্তা ও আলোচনা সমালোচনা হত তার শেষ ছিলনা। এই সভাতে আমাদের দাদু রবিনাথ বরুয়া একজন সর্ববাদীসম্মত সংবাদদাতা ও সুবক্তা ছিলেন। বাবার অনুপস্থিতিতে সারাটা দিন ঘরে বাইরে যেসব কার্যকলাপ হত তার সংক্ষিপ্ত বা বিশদ বিবরণ তাঁর ইচ্ছেমত তিনি সেই সভায় বাবার সামনে পেশ করতেন। বাবা কাছারী গেলে তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই সময়টুকু আমাদের একেবারে রামরাজত্ব ছিল। আমরা সারাটা দিন ঘুরে বেড়িয়ে হেসে খেলে ছোটা-ছুটি করে বেড়াতাম। তখন আমাদের দুষ্টুমির মাত্রা চড়ে যেত স্বভাবতই। দাদু কিন্তু আমাদের এই দুষ্টুমিতে ক্ষুব্ধ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, দাঁড়াও আজ মহাশয়কে বলে তোমাদের মজা দেখাব। দাদুর এই গুরু গম্ভীর গর্জনে অনেক সময়ে আমরা বালক সুলভ চপলতায় কান দিতাম না। অনেক সময় দুপুরে খাবার পর দাদু যখন বিশ্রাম করতেন, তখন তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বা ঘামাচি মেরে এইভাবে সেবার ঘুস দিয়ে তাকে শান্ত করে সম্মুখ বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতাম। কিন্তু এক একদিন শত ঘুষ দিয়েও শাস্তির হাত থেকে আমরা রেহাই পাইনি। দাদু আমাদের কাছ থেকে দিব্যি এই রকম ঘুষ নিয়ে পরমুহূর্তেই নেমকহারামি করে বালক আসামীদের বিপক্ষে রায় দিতেন। ফলে দোষের গুরু-লঘু মাত্রা অনুসারে আমরা শাস্তি পেতাম। সেই খাবার সভাতে আমাদের দোষত্রুটির কথা বাবাকে নালিশ করার আগে দাদুর গায়ে কতকগুলো লক্ষণ প্রকটিত হয়ে উঠত। পূর্বলক্ষণগুলো এমন-ভাবে দেখা যেত যে, তা আমাদের তীক্ষ্নদৃষ্টির অগোচর হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। তাঁকে ঐ রকম লক্ষণাক্রান্ত দেখলে আমাদের খাবার আনন্দ ঘুচে যেত, মন খারাপ হয়ে পড়ত। দাদুর মাথাটা কামানো হলেও মাঝখানটায়

কিছু জায়গায় চুল ছিল। তার লম্বা চুলের টিকির গেরোটা সর্বদাই ঘাড়ের ওপর পড়ে থাকত। ভূমিকম্পের আগে প্রকৃতির যেমন একটা থমথমে ভাব দেখা যায়, আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করার আগে দাদুরও তেমন একটা গুরুগম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হত। দাদুর গলায় সুগন্ধ ফুলের মালা ও তুলসীর নির্মালি। দাদু যখন রেগে উগ্রমূর্তি ধারণ করতেন, তখন সকল সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়ে তিনি ঘাড়ের কাছে পড়ে থাকা টিকিটা হাত দিয়ে উপরে উঠিয়ে ব্রহ্মতালুতে রাখতেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অংগভংগি করতে থাকতেন। এইরকম লক্ষণ আমাদের আর জানাতে বাকী রাখত না যে এখন আমাদের মহা দুর্যোগ। আমাদের বিরুদ্ধে দাদুর এই যুদ্ধং দেহি ভাবের এইটেই প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় অবস্থাটিকে বজ্রপাত হওযার আগে বিদ্যুতের চমকের সংগে তুলনা করা যায়। এই অবস্থায় তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে দুচারবার মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। তৃতীয অবস্থা —এর পর বাবার প্রশ্ন 'কী হয়েছিল?' চতুর্থ অবস্থায়, 'আজ লক্ষ্মীনাথ' ইত্যাদি অভিযোগ। পঞ্চম পর্যায়ে বাবার হাতে সেদিনই অথবা পরের দিন আমাদের লাঞ্ছনাভোগ। যাইহোক এত সব কাণ্ড কারখানা হলেও দাদুকে কিন্তু আমরা প্রাণভরে ভালবাসতাম। কারণ দাদু আমাদের দাদু, দাদু আমাদের খেলার সহচর, গল্পের থলে। দাদুর অন্তর ছিল বড়ই কোমল। আমাদের দুষ্টুমির কথা বাবাকে নালিশ করে যদিও আমাদের প্রহার খাওযানোর মূলে ছিলেন তিনি, বাবা আমাদের একবার কি দুবার পেটাতে আরম্ভ করলেই আমাদের গায়ের ওপর ঝাঁপিযে পড়ে সেই প্রহারের হাত থেকে উদ্ধারও করতেন তিনি। এই মহৎ গুণটি দাদুর ছিল।

সেই সময় দাদুর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী ছিলনা, কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন অবিবাহিত। আগের দিনে আসামে পুরুষদের কম বয়সে বিবাহ করার চল ছিল না বললেই হয়। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের উপার্জনক্ষম হলে তবে তার বিবাহের চেষ্টা করা হত কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল আসামেও বংগদেশের ঢেউ এসে লাগার দরুন অথবা অসমীয়া সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটার দরুনই হয়তো সেই পুরানো সুস্থ প্রথা বদলে গিয়ে তার পরিবর্তে শ্বশুর বাড়ী থেকে টাকা পয়সা নিয়ে কম বয়সে বিয়ে করার ঘৃণিত প্রথা চালু হয়েছে। অসমীয়া পরিবারে বাঙালী শাড়ীর আক্রমণের উপদ্রবের

মতো এটাও আধিভৌতিক উপদ্রব মাত্র। হে মাতৃ আমার! তুমি কি এই উপদ্রব প্রতিরোধ করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। এই উপদ্রব তোমার ক্ষণেক আত্মবিস্মৃতির ফল মাত্র।

তেজপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার সংগে পিতৃদেব আমাদের এই পিতামহ অর্থাৎ দাদুর বিবাহ দেন। বিয়ের দিন থেকেই দাদুর পত্নী আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। আমাদের ছোটখাট এই ঠাকুমাটিকে পেয়ে আমাদের মন আনন্দে উপচে পড়ে। বুড়ী ঠাকুমাও সব সময়ের জন্য আমাদের সংগী হন।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

তেজপুর থেকে পিতৃদেব লখীমপুরে বদলি হয়ে এলো আর আমরা ছেলেমেয়েরাও তাঁর সংগে এসে হাজির হলাম। এখানে পেঁাছে আমরা যে ঠিক কার বাড়ীতে উঠেছিলাম মনে নেই, কিন্তু দশ বারো দিনের মধ্যেই আমাদের নতুন বাড়ীটা সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে গিয়েছিল। নতুন বাড়ীটার ঘরগুলো ছিল প্রশস্ত, দরজা জানালা বেড়ায় একেবারে স্বয়ং সম্পূর্ণ। গৃহপ্রবেশের দিন যে পুজো ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করা হয়েছিল—সেইসব উৎসব-আনন্দের কথা আজও আমাদের বেশ মনে আছে।

আমাদের বাড়ীর কাছেই সিদ্ধেশ্বর নামে একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তিনি সোনারুপোর অলংকার গড়তেন আর সবাই তাঁকে সিধাই স্বর্ণকার বলে ডাকত। সুযোগ পেলেই আমরা তাঁর কারখানায় গিয়ে একান্তমনে লক্ষ্য করতাম তিনি কেমন করে সোনারুপো গলান মাটির পাত্রে ছাগলের চামড়ার হাপর দিয়ে হাওয়া দিতেন। ফোঁস ফোঁস শব্দে হাওয়া চালিযে দিযে সোনা রুপোগুলো ঠাণ্ডা জলের পাত্রে কিছুক্ষণ ডুবিযে রেখে শক্ত করে নিয়ে তা নিহাইযের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কত রকমেরই না অলংকার গড়তেন তিনি। এই প্রত্যেকটি কাজই আমরা খুব মনোযোগ দিযে নিরীক্ষণ করে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতাম। সিধাই স্বর্ণকার কানের দুল ও হাতের বালাতে লাল, নীল আর কলাপাতা রঙের কাঁচের নকলী পাথর ভেঙে, তার এক এক টুকরো আসল পাথরের সংগে মিলিয়ে বসিয়ে দিতেন, তার ওপর মিনার কাজগুলো কেমনভাবে করতেন এই সব দেখেশুনে আমাদের এত ভাল লাগত যে অনেক সময় উৎসাহের চোটে হাপরে হাওয়া দিয়ে আমরা স্বর্ণকারকে সাহায্য করতাম। কোন কোনদিন আমি আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক করে চেযে চেয়ে একটা ডবল পয়সা নিয়ে গিয়ে এবং তা দিয়ে স্যাকরার হাতে একটা ছোট বাটি বানিয়ে নিতাম এবং সেই বাটিতে অনেকদিন আমার কোমল হৃদয়ে সঞ্চিত ভালবাসা ভরে রেখেছিলাম। বাবা এঁকে দিয়েই আমার মায়ের জন্য বারোশ' টাকা মূল্যের একজোড়া সুন্দর পাথর বসানো বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তখন তাঁর কারখানায় সেই বালা গড়ার প্রথম দিন থেকে অর্থাৎ বোধনের দিন থেকে বিসর্জন অবধি তার সম্পূর্ণ অবস্থা আমার আগ্রহ আর নিরীক্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সিধাই স্বর্ণকারের একটি মেয়ে ছিল তার নাম জয়া। মেয়েটির গায়ের রঙ ছিল সোনার মতো, সে যেমন ফুটফুটে তেমন সুন্দর। কে আমায় বলেছিল বলতে পারিনে, অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনে এই ধারণাই হয়েছিল যে সুন্দর মেয়েটিকে সিধাই স্বর্ণকার তাঁর কারখানায় গড়েছেন। জয়া আমাদের খেলার সংগী হলেও সে সর্বদা আমাদের সংগে খেলত না, খেলত মাঝে মাঝে।

আমাদের প্রতিবেশী ছিল দুর্গেশ্বর শর্মা নামের একজন কেরানী। তাঁদের বাড়ীতে আমাদের খুবই যাতায়াত ছিল, বিশেষ করে দুর্গোৎসবের একমাস আগে থেকে যাতায়াত বেড়ে যেত। দুর্গেশ্বর শর্মা মূর্তি তৈরী করতে পারতেন। নিজের হাতেই প্রতিমা গড়তেন। প্রতিমা তৈরী করার প্রথম দিন থেকেই তাঁর কাছে আমরা যেতাম। কত উৎসাহ নিয়েই যে খড়ের আটি বেঁধে কাদা মাটি ঘেঁটে আমরা তাঁকে সাহায্য করতাম তার কি শেষ আছে? আমাদের ইচ্ছাগুলোকেও তেমনি কল্পনার সাহায্যে মেখে ঘেঁটে মনের মধ্যে কি এক অপরূপ মায়াপুরী সাজিয়েছিলাম ভাবলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমি ভাবতাম কেবলই, দুর্গেশ্বর ভাস্কর যেমন করে এই প্রতিমার প্রতিটি অংশ নিজের সুনিপুণ হাতে গড়ে তুলেছে, তেমন করে আমাদের বড় ভাস্কর ভগবানও অনেক পরিশ্রম করে গড়ে আমাদের এই পৃথিবীতে খেলতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টির এমন সরল ব্যাখ্যা তখনই আমার মনে উদয় হয়েছিল সহজভাবে।

প্রতিমা গড়ার সময় শর্মাদেবের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ আমি লক্ষ্য করতাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সাদা, হলদে, লাল রঙ বেটে নিয়ে তিনি প্রতিমার গায়ে যখন লাগাতেন, কি সুন্দর উজ্জ্বল তখন দেখাত প্রতিমাকে, আমার মনটাও সংগে সংগে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। মনে আছে, একদিন দুর্গেশ্বর শর্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দাদা, এই লাল হলদে সাদা রঙগুলো কোথায় পাওয়া যায়? তখন বেলা পড়ে গেছে; পশ্চিম আকাশ বিচিত্র রঙে চিত্রিত হয়ে উঠেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—এইগুলো আমি ঐ আকাশ থেকে এনেছি বাবা। আবার শুধালাম—আমি কি আনতে পারিনে ঐগুলো আকাশ থেকে? তিনি বললেন—না

তোমরা পারবে না। দেবী পুজোর সময় আমি ঐগুলো আকাশের দেবতার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসি। উনি শুধু আমাকেই দেন। আমি তখন মিনতি করে বলি—দাদা আমাকেও কিছু রঙ এনে দেবেন? তিনি শুধু বলেন--দেব। এর পরেও অনেকদিন অবধি তাকে তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভুলিনি। তিনি কিন্তু 'দেব দেব' করেই আস্তে আস্তে বেমালুম ভুলে গেলেন সেই প্রতিশ্রুতি আর আমিও হতাশ হয়ে একেবারে আশা ছেড়েই দিলাম।

শর্মাদেব যখন প্রতিমা গড়তেন তখন তাঁর টুকিটাকি কাজে আমি সাহায্য করতাম বলে তিনি সেই মাটি দিয়ে আমাকে একদিন একটি বাঁশি তৈরী করে দিলেন। বাঁশির ফুটোতে মুখ লাগিয়ে কি করে বাজাতে হয় তার কৌশলটাও তিনি শিখিয়ে দিলেন আমাকে। বাঁশিটা পেয়ে আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। দুচারবার বাজাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন আমি ফুঁ দিয়ে দিয়ে আর আঙুল চালিয়ে সত্যি বাঁশিতে সুর তুললাম তখন তার মৃদু কম্পনধ্বনি চারিদিক কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। আমার হৃদয় তন্ত্রীর আনন্দ লহরীও চারিদিক ভরে দিতে থাকে। আহারের সন্ধান পেয়ে পিঁপড়ের দল যেমন সারি সারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতে থাকে আমার বাঁশির সুরগুলোও তেমনি একের পর এক বাজতে থাকে এক টানেই। কাঁচা মাটির দাগ লেগে আমার ঠোঁট সাদা হয়ে গেল কিন্তু তবুও তার দিকে আমার ভ্রুক্ষেপ নেই; আমার বাঁশির সুর বেজেই চলে অবিরাম। আমার স্নেহমাখানো চুম্বন পরশের আঠাতে বাঁশি আমার মুখে আটকে রইল। বাঁশির দৌরাত্ম্য বাড়লে আমাদের গতিবিধি যিনি লক্ষ্য করতেন সেই রবিনাথদাদা হঠাৎ আমার সমস্ত কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করে বাঁশিটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন এবং নিষ্ঠুরভাবে সেটা শিলের ওপর আছড়ে ফেললেন। ওঁর এ রকম নিষ্ঠুর আচরণে আমার দুচোখ বেয়ে জল পড়ল, আমি দুঃখে শোকে ভেঙে পড়লাম। মন খারাপ নিয়ে আবার দুর্গেশ্বর শর্মার কাছে গেলাম। আমার মুখের ভাব দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করে যখন সব কথা জানতে পারেন তখন তিনি আমায় আদর করে আরেকটা বাঁশি তৈরী করে রোদ্দুরে শুকুতে দেন। সেইদিন বিকেল বেলাতেই আমি আমার হারানো নিধি অর্থাৎ নতুন বাঁশি ফিরে পেলাম। অনতিবিলম্বে বাঁশির মধ্যে দিয়ে আনন্দের করুণ সুর বেজে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই বাঁশির আয়ুও বেশীদিন টিঁকল না। কংসাবতাররূপ দাদু খবর পেয়ে পুনর্জন্ম লাভ করা এই বাঁশিটিকে আগের মতোই আছড়ে ফেলে দিলেন শিলের ওপর। এইবার তিনি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁশির সৃষ্টি-কর্তা দুর্গেশ্বর শর্মাকে বিশেষভাবে বলে দিলেন যেন তিনি আর কক্ষনো আমায় বাঁশি তৈরী করে না দেন। ফলে বাঁশি সৃষ্টির আদ্যাশক্তি নিষ্ক্রিয় হল। কিন্তু উপায়হীনের সহায় হল উপায়দাতা, তিনি আমাকে নতুন একটা রাস্তা দেখিযে দিলেন। আমি তখন আমাদের বাড়ীর চাকরের শরণাপন্ন হলাম ; সে আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা বাঁশি তৈরী করে দিল। এই বাঁশিটাতে আগের মত সুন্দর ফিনিশ ছিল না—ছিল না মিষ্টি সুর সুধা, কিন্তু তা নাহলে কি হবে এই 'কানামামা'ই আমার অনেকখানি অভাব পূর্ণ করল। আমি বাঁশিটিকে প্রাণভরে বাজিয়ে নিয়ে অতি গোপনে লুকিয়ে রাখলাম। কিন্তু কংসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে বাঁশিটা পার পেল না, কোন গুপ্তচরের সাহায্যে তিনি সেই বাঁশির সন্ধান পেলেন আবার সেই গুপ্ত নিধি আবিষ্কার করে লুপ্ত করে দিলেন। অনেক খোঁজ খবর নিযে দাদা জানতে পারলেন এবারের বাঁশির জন্মদাতা দুর্গেশ্বর শর্মা নয়—আমাদের পরম ভৃত্যটি। তখন তাকে ডেকে নিয়ে রবিনাথ দাদু একচোট বকুনি দিয়ে বলেন যে ভবিষ্যতে সে যেন আর এমন কাজ না করে। এর পর উপায় না পেযে দুদিন আমি নিরুৎসাহ হয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর মতোই আমার মনে উৎসাহ খেলে যায়, আমি তো নিজের হাতে একটা বাঁশি তৈরী করে নিতে পারি। যেমন ভাবোদয় তেমনি কার্য। দৌড়ে গিয়ে শর্মার বাড়ী থেকে খানিকটা মাটি নিযে এসে বাঁশি তৈরী করতে লেগে গেলাম। প্রথমবার চেষ্টা করে পারিনি, দ্বিতীয়বার চেষ্টাতে মাঝামাঝি অবস্থায় রইলাম, তৃতীয়বারের চেষ্টায় কৃতকার্য হলাম। কাজ চলে যাওয়ার মত একটা বাঁশি আমি নিজের হাতে তৈরী করে ফেলি আর ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিযে তার থেকে আওয়াজও বের করলাম। কৃতকার্যতার সফলতায় আমার মন আনন্দে ভরে গেল। সেদিন দুপুর বেলা ভাত খেয়ে উঠে দাদু বিছানায় পড়ে ঘুমুবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় বাঁশির সুরের রাম নাম তার কানে পড়ল। তিনি রেগে উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে আমার দিকে তেড়ে এলেন, আমিও দিলাম দৌড়। বেশীদূর আমাকে তাড়িযে নিয়ে গেলে কোন ফল হবে না দেখে, তিনি দূর থেকেই আমায় শাসন করে বললেন—

দাঁড়াও, আজ মহাশয় কাছারীবাড়ী থেকে ফিরে আসুন, তোমার দেখাচ্ছি মজা। এই শাসনবাণী শুনে আমার মন দমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে তাঁর হাতে আমার বুকের মানিক হেন বাঁশিটি সমর্পণ করে মিনতির সুরে বলি— দাদা প্রসন্ন হও। নাও তুমি এটা, একে শিলে আছড়ে ফেল, নয়তো ভেঙে চুরমার করে দাও, নয়তো যা মন চায় তাই কর, আমি আর বাঁশি বাজাব না।

এবারে আমার লেখাপড়া শুরু করা হবে বলে শুনতে পেলাম একদিন। ভীষণ আনন্দ হল আমার— বই পড়তে পারব, লোককে চিঠি লিখতে পারব। একদিন ভাল দিন ক্ষণ দেখে এই কাজ সুসম্পন্ন করা হল। আমাদের গুরুর বাড়ী কমলাবারী সত্রে সোনার ফুল উৎসর্গ করে, বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আনিয়ে পুজোপালা করে, নাম কীর্তন ঘরে পুজোর ডালি দিয়ে সবাই মিলে ঠাকুরের নাম করতে থাকি। নাম শেষ হলে রবিনাথদাদা আমাকে একান্তমনে আশীর্বাদ করলেন যে, আমি যেন সর্ববিশারদ হয়ে আমাদের বংশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি। এই সব স্মৃতি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

দাদা গোড়ায় গোড়ায় আমায় কলাপাতার ওপর ক খ লিখতে শিখিয়ে দিলেন। রোজ কিরকমভাবে কলাপাতা কেটে এনে তার ধুলো মাটি মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে তার ওপর অক্ষর লিখতে হয়, সে-সবও দেখিয়ে দিলেন। কলম তৈরী করে নিয়ে মাটির পাত্রে লেগে থাকা ছাইতে গোমূত্র মিশিয়ে কিরকমভাবে কালি তৈরী করে নিতে হয় এবং কালি ভরে রাখার জন্য কি করে বাঁশের চোঙার দোয়াত বানিয়ে দোয়াতগুলোতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয় এই সমস্ত কলাকৌশল আমাকে শিখিয়ে দেন রবিনাথদাদাই।

ক খ পড়তে শিখে দুদিনেই যে আমি ওস্তাদ বনে গিয়েছি এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছেলে বলে আমি নিজেকে কখনও ভাবতাম না। কারণ লেখা-পড়াতে আমি কখনও খুব ধারালো বুদ্ধিসম্পন্ন বলে খ্যাতি লাভ করি নি। পরবর্তীকালে স্কুল কলেজেও আমি মাঝারি ধরনের অত্যন্ত সাধারণ বলেই পরিচিত ছিলাম। ক খ লিখতে পড়তে শেখার পর মদনমোহন তর্কালংকারের বাংলা শিশুশিক্ষা আমাকে পড়তে দেওয়া হল, কারণ তখনকার দিনের দেশের শাসনকর্তাদের বিপরীতবুদ্ধির ফলে আসামের বিদ্যালয়সমূহে অসমীয়া ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা শেখানো হত, অসমীয়াদের নিজের মাতৃভাষা অসমীয়া ভাষা জায়গা পেয়েছিল আবর্জনা ফেলা জায়গাতে আর বিদেশিনী বাংলা ভাষা

মায়ের স্থান অধিকার করে নিয়ে অসমীয়া শিশুগুলোর মাতৃস্তনের স্থানে 'ফিডিং বটল' দিয়ে তাদের 'কাল কাক ভাল নাক' শিখিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বরের চরণে প্রণাম জানাই যে কালক্রমে দেশশাসনকর্তাদের এই ভুল ভাঙল এবং অসমীয়াগণ মাতৃস্তনের স্বাভাবিক ক্ষীরধারা পান করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করল। অসমীয়ার মাতৃভাষা যে অসমীয়া, বাঙলা নয়, এই সত্য পুনরায় দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

পিতৃদেব যদিও অতি নিষ্ঠাবান পুরানো ধরনের হিন্দু ছিলেন তবুও তাঁর মন আশ্চর্য ধরনের উন্নত ছিল। সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তিনি উচিত বিবেচনা করতেন না। বরং দেশ কাল পাত্র বুঝে অনেক ব্যাপারে সাহায্যই করতেন। তিনি যখন দেখলেন যে, জল থেকে মাছ ডাঙায় তুললে যে অবস্থা হয় ইংরেজ রাজত্বের আমলে বাস করে ইংরেজী ভাষা না জানলে সেই একই অবস্থা হয়, তখন তিনি নিজেও একটু আধটু ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন ও ছেলেমেয়েদেরও ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং ইংরেজী শিখতে উৎসাহ দেন। তখন লখীমপুরে কোন ইংরেজী স্কুল ছিল না বলে পিতৃদেব আমাদের শিখবার জন্য সেখানে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপনা করেন। এই স্কুলে আমি আমার বড় দুই ভাই ও আমার চেয়ে বড় একজন ভাগনে শিক্ষা লাভ করি। সেই স্কুলে পড়াবার জন্য পিতৃদেব শিবসাগরের তীর্থনাথ উকীলের পুত্র পদ্মনাথ শর্মা নামে আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় একজনকে এনে বাড়ীতে রাখলেন। দু-তিনজন ইংরেজী জানা লোককে যোগাড় করে এনে তাঁদের মাস্টারও নিযুক্ত করেন। বাবা যতদিন লখীমপুরে মুন্সেফ ছিলেন ততদিন স্কুলটা সুচারুরূপে চলেছিল।

লখীমপুরের স্মৃতির মধ্যে আরেকজন ভাল লোকের কথা আমার মনে আছে। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ঘিনারাম বরুয়া মৌজাদার। মৌজাদার ঘিনারাম বরুয়া সকাল বিকেল সর্বদাই আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং বাবার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরাও তাঁকে খুবই ভালবাসতাম। কারণ তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের লোক ছিলেন আর আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। ভালবাসা স্নেহ দ্বারা যেমন ছেলেদের মন জয় করা যায় তেমন আর-কিছুতেই যায় না। তিনি বাবার কাছ থেকে চলে এলেই আমরা সবাই তাঁর কোলে চড়ে বসতাম। তিনি বেশ মোটা-সোটা নাহলেও তেমন রোগা ছিলেন না। তাঁকে দোয়াত

কলম নিয়ে সেই যুগের বড় বড় গোল গোল লাল কালো ছাপের স্ট্যাম্প কাগজে দলিল লিখতে দেখতাম আমরা। তাঁর তিন ছেলে, তারা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসত ও আমাদের সংগে খেলাধুলা করত। মৌজাদারের একটি ছেলে আমার চেয়ে বেশ বড় ছিল আর দুটি আমার সমানই হবে নয়তো কিছু ছোটও হতে পারে। সেই দুজনের মধ্যে একজন হল আজকের সুবিখ্যাত পদ্মনাথ বরুয়া।

সিপাহী বিদ্রোহের ঢেউ আসামের গায়ে এসেও যে লেগেছিল এই সম্পর্কে গবেষণা করে বিশেষরূপে যিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তিনি হলেন হরনাথ পর্বতীয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত হলিরাম বরুয়া (যিনি পরে একস্ট্রা অ্যাসিস্টেন্টের পদ পেয়েছিলেন)। তিনি কাছারীতে হেডক্লার্ক পদেই হোক বা অন্য কোন পদেই হোক লখীমপুরে এসে আমাদের টোলে বাবা যে ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন তাতেই থাকতেন। কে যেন আমার মনে মিছিমিছি সন্দেহ ঢুকিয়ে দিযেছিল যে তিনি হিন্দুর অখাদ্য মুরগীর মাংস ভোজন করেন, আর এই বিশ্বাসের দরুন তাঁর ঘরের দিকে মোটে ও পা বাড়াতে পারতাম না আমি। সম্ভবত তিনি নিজেই হযতো মজা করার জন্য এইসব কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতেন। কারণ আমার মনে আছে একদিন তিনি ভাত খাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে বাটিতে করে পায়রার মাংসের ঝোল নিয়ে খেতে বসেছিলেন আর বাটির সেই মাংসের ঝোলকে মুরগীর মাংস বলে তার থেকে ছোট এক টুকরো হাড় আমার দিকে ছুঁড়ে মারেন; আমি তখন অপবিত্র হযে যাওয়ার ভয়ে দৌড়ে বাড়ীতে পালিয়ে এসেছিলাম। এই কারণে শ্রীযুত হলিরাম বরুয়ার ওপর আমার দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। কয়েকদিন আগে তাঁর ঘরের চালে একটা পেচা এসে বসেছিল। এটা একটা অমংগলের ঘটনা মনে করে তিনি ব্রাহ্মণের দ্বারা পুজো পালা করে সেই অমংগলের প্রতিবিধান করেছিলেন। একদিন সন্ধেবেলা আমি যখন আমার পড়ার বাঙলা বই নিয়ে পডতে বসেছিলাম সেই সময় তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। বইটাতে ছিল একটি পেচার ছবি। তিনি ছবিটা দেখার সংগে সংগেই তাতে দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে সেই জায়গাটুকু পুড়িয়ে ফেললেন। পেচার মুখশোভিত আমার বইয়ের পাতার ঐ টুকু পুড়ে সেই জায়াগাটুকু একটা ফুটো হয়ে রইল। মুখাগ্নি করা পেচার শোকের আগুনে আমার কোমল অন্তঃকরণও দগ্ধ হল।

আমি কাঁদতে থাকলাম। আমাকে যদিও বাড়ীর অন্যান্য সকলে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল, কিন্তু বরুয়ার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা বেড়েই যেতে থাকে ক্রমশ। আরও বেশী করে হল এইজন্য যে, পেচা পোড়ানো বরুয়া মহাশয় তাঁর দুষ্কৃতির জন্য একটুও দুঃখ প্রকাশ করলেন না, উপরন্তু লঙ্কা দাহ করে হনুমান যেমন বীরদর্পে অশোকবনে চলে গিয়েছিলেন, তিনিও তেমনি আমার কাছ থেকে উঠে বুক চিতিয়ে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

আমাদের বাড়ীর কাছেই তোলন সাজতোলা নামের দিহিঙের গোঁসাই বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন একজন। সাজতোলা বয়সে বুড়ো, জাতে আহোম এবং দিহিঙের গোঁসাইর খুব নিষ্ঠাবান সেবক। নামপ্রসঙ্গ, গীতপদ আদিতে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল আর বাবাকেও উনি খুব ভক্তি মান্য করে চলতেন বলে বাবাও ওঁকে খুবই ভালবাসতেন। আমরাও ভালবাসতাম তাঁকে। সাজতোলা স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে ভরপুর ছিলেন।

আমাদের একটা চাকর ছিল, তার নাম ধনী। তার বাড়ী ছিল যোরহাটের কাছে সাওঘাত মৌজাতে। প্রকৃতপক্ষে, তখনকার দিনে সাওঘাতে আমাদের বাড়ীর চাকরদের ভাঁড়ার ছিল বলা যায়। ব্যাঙ্কে চেক পাঠিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাওয়ার মতোই আমাদের বাবা কাকারা আবশ্যক হলেই সাওঘাতে খবর পাঠিয়ে দিলেই সেখান থেকে চাকর চলে আসত। ধনীর সঙ্গে তার দাদা গোছের একজন আর ভাই সিদ্ধিরাম এই তিনজনে পালা করে এক বছর দুবছর ধরে বাবার সঙ্গে নগাঁও, বরপেটা, তেজপুর, লখীমপুর আর গৌহাটিতে কাজ করেছিল। আর কালক্রমে তারাও আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে পড়েছিল। আজকাল মালিক আর চাকরের মধ্যে শুধু বেতনেরই সম্পর্ক, আগেকার কালে কিন্তু তেমনটি ছিল না। তখনকার কালে ঝি-চাকরেরা পরিবারের এক একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। টাকা পয়সার চেয়েও স্নেহ-মমতার সম্পর্কটাই ছিল বেশী। হিন্দুশাস্ত্রের সুন্দর বাণী—"ছায়া সদাসবর্গশ্চ" অর্থাৎ দাস-দাসীরা গৃহস্থের বাড়ীর ছায়ার মতো, এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হত। অসমীয়া 'লগুয়া' শব্দটাই এই কথার সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়। মনে আছে, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় চাকর-ঝিদের আমরা নাম ধরে ডাকতাম না, তাদের সম্মান দিয়ে কথা বলতাম। তোলন আর ঘিনলাগী স্বামী-স্ত্রী। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ পরিবার। এরা আমাদের রংপুরের

ঘরের টোলে সব সময়ই থাকত। তোলনকে 'দাদা' আর ঘিনলাগীকে 'দিদি' বলে ডাকতাম। কখনও যদি তোলনকে 'তোলন' আর ঘিনলাগীকে 'ঘিনলাগী' বলে আমরা ডাকতাম, তাহলে অভিভাবকদের কাছ থেকে অনিবার্যভাবে বকুনি খেতে হত আমাদের।

ওদের তিনজন ভাইয়ের ভিতর ধনীই একমাত্র ধূর্ত, বুদ্ধিমান, চটপটে ও আমুদে। ও কাজ করে আনন্দ দিত সবাইকে। রাতদিন আমাদের বাড়ীর অনেক ফাই ফরমাস ধনী খুব উৎসাহের সঙ্গেই করত। সুযোগ পেলেই ও নানা রকমে আমাদের সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করত। ওর গায়ের রঙ শ্যামলা, গা হাত পা বেশ আটো সাটো, আর পেটে একটা বড জরুল ছিল। ধনী সবাইকেই এই কথা বলে বেডাত যে, ওর জরুলটাতে ঈশ্বর ওকে টাকা ভরিয়ে রাখতে বলেছে আর সেজন্যই ওর নাম হচ্ছে ধনী। ওর এই কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করত। আমি কিন্তু অনেকদিন এই কথাটা মনের মধ্যে পুষে রেখে নানা কথা ভাবতাম।

সেই সময় ধনীর ভরা যৌবন। গায়ের শক্তিতে মনের স্ফূর্তিতে সে যেন ভাজা খৈ-এর মত উড়ে বেড়াত। উড়ে বেড়ানোতেই সে অভ্যস্ত ছিল। ওর গায়ের উপচে পডা শক্তি ওকে সর্বদাই কারুর সঙ্গে না কারু সঙ্গে লড়বার জন্য উৎসাহিত করে তুলত। লড়তে গিয়ে হেরে গেলেও অম্লানবদনে মাথা পেতে নিত তার গ্লানি। দুপুরবেলা যখন মাছ-ধরতে-যাওয়া জেলের ডাকাডাকি শুনতে পেত, তখন ধনীকে আর ঘরের মধ্যে রাখা যেত না। বাড়ীর সমস্ত কাজ কর্ম ফেলে দিয়ে, কারুর কথা না শুনে হাতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে দৌড়ত। আর কখনও সে খালি হাতে ফিরত না। খালি হাতে ফিরত না মানে যে সর্বদাই সে যে মাছ ধরতে কৃতকার্য হত এমন নয়, বরং ষোল আনা দিনের মধ্যে পনের আনা দিন তার উলটোটাই ঘটত। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলা যায় ব্রাহ্মণ বাড়ীর বিধবাদের মাছের তরকারির সঙ্গে যেরকম সম্পর্ক, ধনীর ছিপের সঙ্গে মাছের সম্পর্ক ঠিক তেমনই। সে তার আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য অনেক রকমের ভণ্ডামি ও ধূর্তামির আশ্রয় নিত। যারা মাছ ধরত তারা যখন ডাঙায় উঠত তাদের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে নয়তো জবরদস্তি করে চেয়ে নিয়ে বাড়ীতে এসে ও নিজে মাছ ধরেছে বলে মিথ্যে কথা বলত। ওর এই মিথ্যে কথার বাহাদুরী অনেকদিন কেউ বুঝতে না পারলেও একদিন সে ধরা পড়ল।

কলসীতে ফুটো থাকলে যেমন জল বেরিয়ে যায় ওর এই হোমরা চোমরা কথাগুলো একদিন বেরিয়ে গেল ওর গুণগ্রাহীদের সামনে। মাঘ মাসের বিহুতে হাসের ডিমের যুদ্ধের খেলাতেও ধনী পিছিয়ে পড়ত না। কিন্তু ওর মাছধরা বিদ্যার মত এই বিদ্যার জালজুয়াচুরিও একদিন ধরা পড়ল। সারা দিনের পরে ও যখন এক চুবড়ি ডিম জিতে এনেছে বলে বাড়ী ফিরল, তখন বোঝা গেল, এই গুলো সে জেতেনি—লোকের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে এসেছে।

মুন্সেফ হাকিম মহাশয়ের প্রধান ভৃত্য বলে ধনীকে কি রাস্তার লোক, কি হাটের লোক, কি দোকানী সবাই যেমন খাতির করত তেমন ভয়ও করত আর ধনীও সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিত ষোল আনা। ক্রমে ক্রমে ওর দুষ্টুমির মাত্রা এত বেড়ে যেত লাগল যে সে মাছ কিনবার জন্য বাড়ী থেকে পয়সা নিয়ে গিয়ে সেই পয়সা মাছওয়ালাকে দেওয়ার অভ্যাসটা বদ্ অভ্যাস মনে করতে লাগল। পয়সা না দিয়ে ও জোর জবরদস্তিতে মাছ কেড়ে নিয়ে আসতে থাকে এবং সেই পয়সা ওর কোমরে গোজা জালের থলের মধ্যে গুজতে থাকে। গোড়ায় গোড়ায় ওর এরকম অবিচার-অত্যাচার, দোকানী বাজারীরা নির্বিবাদে ভয়ে সহ্য করত আর সেও বেশ 'চালাও পান্সী' বলে ব্যবসায়ের পান্সী নৌকোখানা চালিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু একদিন ধনীর নৌকোখানা মাটিতে লেগে গেল উল্টে। ওর এরকম অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে বাজারের একদল ব্যবসায়ী বাবার কাছে এসে ধনীর নামে নালিশ করল। সামনে বিপদ উপস্থিত দেখে ধনী পালিয়ে যায়। বাবা 'আসামী ফেরার' দেখে সেই দোকানের লোকগুলোকে যতদূর সম্ভব ওদের মাছের দাম মিটিয়ে দিলেন। পরের দিন ধনীকে খুঁজে ধরে আনলেন আর বেশ একচোট কিল ঘুষিও মারলেন। এই কিল ঘুষির ফল যে বেশীদিন ধরে ফলল এমন নয়, কারণ সে তার পান্সী নৌকোর ব্যবসায় এত লাভজনক মনে করত যে দিন চারেক বাদে সে আবার সেই ব্যবসায়ে রত হল। ওর এই রোগ দুরারোগ্য হয়ে উঠেছে দেখে বাবা তাকে 'সাসপেন্ড' করে ওর ঘর সাওঘাতে বদলি করে দেন এবং ওর পরিবর্তে ওর দাদা গোজরকে এনে বাহাল করেন। বছর খানেক বাদে যখন ও রীতিমতো ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন আবার ওকে এখানে নিয়ে এসে আগের কাজে নিযুক্ত করা হল।

মহাপুরুষ শ্রীমাধবদেবের প্রিয়তম শিষ্য, মহাপুরুষের অবতার পদ্ম আতা বা বদলা আতার সত্র কমলাবারী পিতৃদেবের প্রাণস্বরূপ এবং কমলাবারীর গোস্বামী ভক্তগণ ওঁর বুকের সম্বল ছিলেন। এই সত্র আর ভক্তগণের জন্য তিনি সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন আর দিতেনও। পিতৃদেব সর্বদাই বলতেন 'মহাপুরুষ গুরুজনেরা নিজের নৌকো থেকে সর্বস্ব জলে ফেলে দিয়ে ভক্তগণকে তুলে নিয়েছিলেন' ; সেজন্য ভক্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আমার মনে আছে, কমলাবারী সত্রের ভক্তরা দল বেঁধে বাবার কাছে যাতায়াত করতেন। বাবা তাঁদের কাঁচা খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার উপরিও শীতকালে গায়ে দেবার জন্য একখানা করে লাল পশমের চাদর দিতেন। কমলাবারী, বরপেটা ও মধুপুর সত্রের গোসাঁই ভক্তদের দান কার্যে পিতৃদেবের মাসিক বেতনের প্রায় অর্ধেক টাকা খরচ হয়ে যেত। বাবা লখীমপুরে থাকতেই কমলাবারী সত্রে ঝগড়াঝাটি হয়ে সত্রটি দুভাগ হয়ে যায়, এবং একভাগ নতুন কমলাবারী সত্রে পরিণত হয এবং এই নতুন সত্রের প্রধান কর্ণধার ছিলেন পিতৃদেব।

কমলাবারী সত্রের ভক্তরা একবার কি দুবার পিতৃদেবের আমন্ত্রণে লখীমপুরে এসে যাত্রা অভিনয় করেছিলেন। সেই যাত্রা দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ হয়েছিল বলে শেষ করতে পারিনে। যাত্রা শেষ হয়ে যাওয়ার বছর খানেক পরেও আমরা যাত্রার পদগুলি সময়ে অসময়ে যেখানে সেখানে বলতাম আর আমরা স্থান অস্থান না দেখে যাত্রার অভিনয় করে যেতাম। একটা পালা বোধহয় ছিল জরাসন্ধ বধ—আমি ও আমার দাদা শ্রীনাথ কলাগাছের গোড়া দিয়ে দুটো গদা করে নিয়ে ঘরের উঠোনে বীররসাত্মক পদ গেয়ে পরম বিক্রম প্রকাশ করে যুদ্ধ করে বেড়াতাম আর দুজনে দুজনের পিঠে কলাগাছের গোড়ার গদাটাকে টুকরো টুকরো করে দিতাম। আমাদের দুজনের তুমুল যুদ্ধে প্রজ্বলিত বলবিক্রম দেখে বাড়ীর মহিলাগণ ও চাকর বাকরেরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দর্শকদের প্রশংসা ও উৎসাহ বাক্যে আমরা দুই ভাই ভীম ও জরাসন্ধ এক ভীষণ যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধের তেজ এত বেড়ে গেল যে আমাদের 'সুপার ভাইজার' রবিনাথদাদা আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য তাঁর দ্বারা প্রচারিত ও প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনের কোন একটা ধারামতে হুকুম জারি করে দিলেন। কোন স্রোত বা বেগের স্বাভাবিক রাস্তা বন্ধ করে দিলে যেমন সে বন্ধ না হয়ে

তলায় চাপা পড়ে থাকে, সেইভাবে এই ক্ষুদ্র যোদ্ধা দুজনের যুদ্ধ বন্ধ না হয়ে শাসকদের চোখ এড়িয়ে তারা সবজী বাগানে নয়তো ঘরের পিছন দিকের উঠোনে নইলে বা সুযোগ বুঝে গরুর গোয়ালেও যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। কালক্রমে এই ক্ষুদে যোদ্ধাদুটির যুদ্ধের তৃষ্ণা মিটে গেলে এই দুর্ঘোর মহাযুদ্ধের শেষ হল। আবার দুই ভাইকেই যাত্রার ভূতে পেল। পদ গেয়ে গেয়ে আবার দুজনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করল। মনে আছে, একদিন আমি হিরণ্যকশিপু হয়ে—

রহ রে রহ রহ
ভ্রাতৃবৈরী হরি।
হাতে শূল ধরি
পাঠাইবো যম নগরী।

এই পদগুলো বলে বলে হাতে লাঠি একটা নিয়ে আমার দাদা, যাত্রার ভূমিকায় নরসিংহের, দিকে দৌড়তেই কোথা থেকে রবিনাথ মাজুদলর বরুয়া এসে হিরণ্যকশিপুর উপরে লাফ দিয়ে পড়ল। নিমেষের মধ্যেই নরসিংহ আলেয়ার মত অদৃশ্য হয়ে যায় আর হিরণ্যকশিপু কান মলা খায়।

একবার এক যাত্রা হয়েছিল তার নাম ছিল মঙ্গল কাঠুরিয়ার যাত্রা—এই যাত্রাটির কথা বেশ মনে আছে আমার। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। মঙ্গলা যাচ্ছে কাঠ কাটতে জঙ্গলে। পাড়া প্রতিবেশীরা দিনটা ভাল নয় দেখে সেদিন ওকে কাঠ কাটতে যেতে নিষেধ করে; কিন্তু মঙ্গলা কারুর কথা শুনল না আর ওকে বাঘে খেয়ে ফেলল। যাত্রা সভায় পিতৃদেব, রবিনাথ দাদা আর অন্যান্য একসঙ্গে অনেকে বসে যাত্রা দেখছেন। মঙ্গলা কাঠ কাটবার সময় পিছন দিক থেকে মুখোস পরা বাঘ একটা এসে হাজির হয়, এমন সময় ভীম জরাসন্ধের নায়ক বীররসাত্মক বাক্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দাদা শ্রীনাথ ভয়ে চেঁচিয়ে দিল দৌড়। যাত্রা সভায় হাসির রোল পড়ে যায়। অবস্থা ভীষণ দেখে উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন রবিনাথ দাদা এক দৌড়ে গিয়ে শ্রীনাথ দাদাকে এনে নিজের কোলে বসিয়ে বুকের মধ্যে চেপে বসলেন; আর গোয়াতুঁমি করে লোকের হাক ডাক না শুনে যে মঙ্গলা কাঠ কাটতে গিয়েছিল তাকে বাঘে নির্বিবাদে খেয়ে ফেলল।

অথচ ভর্তি সভাঘরের একজন কেউ একটা টু শব্দও করলনা, এমন কি

একবারও ইস্ ইস নয়তো হরিনামও বলল না। লাঠি ঠোকা তো দূরের কথা কেউ একজনও তার তর্জনী বা কেরো আঙুল দেখিয়ে নিরস্ত্র করল না, আশ্চর্য !

আমি লখীমপুরে থাকতেই আমার দাদা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বেজবরুয়া ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র বেজবরুয়া কলকাতায় পড়তে গিয়েছিল। তখনকার দিনে কলকাতায় পডতে যাওযাটা আজকের মত সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন আসামে রেল চলত না বা ডাক জাহাজের প্রচলন ছিল না। মাত্র সদাগরী জাহাজগুলো চলাচল করত। আর সেজন্য কলকাতায় পেঁাছতে প্রায পনের বিশ দিন লেগে যেত। কলকাতায় গিয়ে বাঙালীর হাতে রান্না খেলে আমার দাদাদের জাত যাবে এই ভযে আমাদের বাড়ীতে বিষম সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যার সমাধান করতে শশধর নামের অসমীয়া ব্রাহ্মণ একজনকে তাদের রাঁধুনে হিসেবে পাঠানো হয। কিন্তু ক্রমেই দেখা গেল যে দাদার কাছে শশধর অচিরেই অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হল। একবছর বাদে শশধর বাংলা দেশ থেকে পুনরায আসামের মাটিতে এসে পা দেয়। ওদিকে কলকাতাতে, দুই ভাই রাঁধুনে বামুনের ঠাণ্ডা কন্‌কনে ভাত আর তরকারি খেয়ে দিব্যি দিন কাটাতে লাগল। সন্তানদের বিপরীত বুদ্ধি দেখে পিতৃদেব কলিকালের অখণ্ড প্রতাপের কথা অনুভব করে ঈশ্বরকে চিন্তা করে মনের দুঃখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এই দুজন ভাইযের চুল কাটা নিয়েও আমাদের বাডীতে কম আলোড়ন হয়নি। অথচ ঐ ধরনের চুল কাটা বা টিকি কাটার ঘটনা সাতটা বারের ছাপান্ন প্রহরে নিত্যই ঘটছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্যরাও নির্বিবাদে তাদের মাথার টিকি কেটে ফেলছে এবং এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে অগণিত কাকের কোন একটা কাকও 'কা' 'কা' করেনি বা অসংখ্য চিলের একটা চিলও 'চিঁ' 'চিঁ' করেনি, এমন কি বট গাছও এক ফোঁটা শিশির ফেলেনি ; পৌষমাসের জ্বালানী কাঠ দিয়ে রান্না করতে রাধুনী কাঠ জ্বালাতে সোঁ সোঁ করে ফুঁ দেয়নি একবারও—এর উপরে সনাতনী ধর্মসম্প্রদায় থেকে লাট এবং বডলাট বাহাদুরের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত প্রস্তাবের সিদ্ধান্তও পাঠানো হয়নি এবং সেই 'বিরাট' সভার সেই কার্যাবলীও কোন দৈনিক, মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সদিয়ার থেকে ধুবরী পর্যন্ত কোন আলোড়নের ঢেউ তোলেনি। কালের কি দুর্দান্ত প্রতাপ—আগেকার

আন্দোলনের মতো এই টিকি বিনাশ আন্দোলন আমাদের বাড়ী থেকে লুপ্ত হযে গেল। আর টিকি তো দূরের কথা, সাহেবদের হ্যাট কোট চাপিয়ে দিব্যি সাহেব হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো—এত বড় কথাগুলোও আর কেউ বড় করে দেখছে না আজকাল।

পিতৃদেব যখন লখীমপুরে ছিলেন, সেই সময় কিছু দুষ্টু লোক ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যে অভিযোগ করে। সেই অভিযোগের বিচারের জন্য তাঁকে ডিব্রুগড়েও যেতে হয়। তখন আসামে রেল বা জাহাজ ছিল না; কাজেই তাঁকে নৌকো করে আসতে হযেছিল। পিতৃদেব যখন পথে সেই সময় ডিব্রুগড়ের কাছারীঘরটা কিরকমভাবে পুড়ে যায়। তিনি লোক লাগিয়ে কাছারীবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে যে দুষ্টু লোকগুলো অভিযোগ উত্থাপন করে, তারা এই কথা তোলে ডেপুটি কমিশনার কর্নেল ক্লার্কের কানে। কর্নেল ক্লার্ক কোন বিচার বিবেচনা না করে, 'ঘর পোড়ানো' অভিযোগের দণ্ডবিধি আইনের ধারাতে ফেলে পিতৃদেবকে হাজতে দিল। তখনকার দিনে এই মোকদ্দমা আসামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সকল লোকের মনের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল এই কাজ পিতৃদেবের মত পুণ্যাত্মা ও ধার্মিক লোকের দ্বারা যে সম্ভব নয় সেটা সহজবুদ্ধিতেই সবাই ধরে নিয়েছিল এবং তাঁরা দুঃখে অভিভূত হয়ে পিতৃদেব যাতে এই অগ্নি পরীক্ষা থেকে উদ্ধার পান তার জন্য ভগবানের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা জানিয়েছিল। তাঁর এই বিপদের সময়েও দীননাথ বেজবরুয়া ধীর স্থির অটল হয়ে ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর নিষ্পাপ নির্মল অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয়নি। ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, তাঁর পৌরুষোচিত ব্যবহার, নির্ভীক উত্তরে কর্নেল ক্লার্ক থেকে শুরু করে শত্রুদলের সকলের প্রাণে আতঙ্ক ও ডিব্রুগড়ের জনসাধারণের মনে বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল। বিচারের শেষে পিতৃদেব মেঘমুক্ত চন্দ্রের মতো নিজের পূর্ণ যশের জ্যোতিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলেন। গবর্নমেণ্ট তাঁকে আবার পূর্বের কাজে নিযুক্ত করে, কাজের থেকে বিরত থাকাকালীন কয়েকমাসের পুরো বেতন দিয়ে দিলেন। এর পর তাঁর শত্রুদলের যে কি হাল হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়ে আর কলমকে কলুষিত করতে চাইনে। সেই মোকদ্দমায় পিতৃদেবের অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। ব্রেম্সন

নামে (পরে ইলবর্ট বিলের সময় ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালীদের গালাগালি করে বিখ্যাত) একজন বড় ব্যারিস্টার, এবং শরৎচন্দ্র ব্যানার্জী নামে একজন বাঙালী উকীলকে পিতৃদেবের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল। ব্রেশন আসার আগেই উকীল শরৎচন্দ্র ব্যানার্জী সেই মিথ্যে মোকদ্দমার জাল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ব্রেশন গোয়ালপাড়া এসে পৌঁছতেই পিতৃদেবের নাতি সুবিখ্যাত হাকিম পূর্ণানন্দ বরুয়া তাঁকে ফেরৎ পাঠান। সেই মোকদ্দমার সুযোগ্য উকীল শরৎচন্দ্র ব্যানার্জী পরে গবর্নমেণ্টের চাকরী নিয়ে 'একস্ট্রা অ্যাসিস্টেন্ট' হয়ে আসামে রইলেন।

আমার সুযোগ্য ব্যবসায়ী বন্ধু শ্রীযুত ভোলানাথ বরুয়া মহাশয় আমাকে একদিন কলকাতাতে বলেছিলেন যে তিনি ঢাকাতে থাকার সময় ডিব্রুগড়ের কাছারী পোড়ার রহস্য একদিন তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। ঢাকার কোন এক মুসলমান ব্যবসায়ী নথিপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করার জন্য সেই ব্যবসায়ীরই এক মুসলমান কর্মচারীর দ্বারা এই কাজ করিয়েছিল। অনেক বছরের পর সেই রহস্য প্রকাশের বিপদ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে জেনে কোন কথা প্রসঙ্গে সেই সত্য প্রকাশ করে নিজের বাহাদুরী করছিলেন ভদ্রলোকটি।

লখীমপুরের স্মৃতির মধ্যে ওখানকার পুটি মাছ ও পাবদা মাছের কথা খুব মনে পড়ে। এমন বড় রকমের তেলতেলে আর মিষ্টি পাবদা মাছ আমি আজ অবধি কোথাও দেখিনি। লখীমপুরের সেই দুরকম মাছের কথা আমার মন থেকে অন্তর্হিত হলেও তার স্মৃতি এখনও যায়নি।

এই জীবনস্মৃতি লেখক লখীমপুরেই গুদু খেলা বিদ্যা শিখে কোন এক অস্থায়ী ক্লাবের সভ্য হয়েছিল। এই ক্লাবে অনেক বড় বড় লোকও ছিল তাদের মধ্যে একজন শ্রীযুত হারবর দাস ; অন্য একজন ছিলেন শ্রীযুত গম্ভীরচন্দ্র দাস।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

লখীমপুর থেকে পিতৃদেব বদলি হয়ে আসেন গৌহাটিতে। এখানে এসে আমরা উঠেছিলাম আসামের ইতিহাস রচয়িতা কাশীনাথ তামুলী ফুকনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকমলানাথ ফুকনের বাড়ীতে। ফুকনদের পরিবারের সংগে বেজবরুয়া পরিবারের অনেকদিনের অন্তরংগ সম্পর্ক। তাছাড়া, কমলানাথ ফুকনের ভাই শিবসাগর নিবাসী শ্রীযুত মুক্তানাথ ফুকন খাজাঞ্চী পিতৃদেবের জামাতা। মাত্র কয়েকদিন ফুকনদের বাড়ীতে আমরা ছিলাম। তারপরেই আমরা আমাদের বংশের সুবিখ্যাত ৺লক্ষ্মীনাথ গজপুরীয়া মহাশয়ের খালি বাড়ীতে উঠে গিয়েছিলাম।

গৌহাটির বিশাল ব্রহ্মপুত্র এবং তার আশপাশের পর্বতমালার মনোরম দৃশ্যে আমার মনটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছিল। সেই দৃশ্যের ছবি আমার হৃদয়ে চিরকাল আঁকা হয়ে থাকবে। অশ্বক্রান্ত, উমানন্দ, উর্বশী, নবগ্রহ, শুক্রেশ্বর, বশিষ্ঠাশ্রম আদি তীর্থস্থানে পিতৃদেবের সংগে গিয়ে আমি যে কত আনন্দ লাভ করতাম তা বলে শেষ করা যায় না। আমি তখন ছোট ছিলাম বলে কামাখ্যা আর হাজোতে বাবা আমায় নিয়ে যান নি।

গৌহাটিতে এসে আমি প্রথম স্কুলে যেতে আরম্ভ করি। প্রথম প্রথম স্কুলটা আমার যেন জেলখানার মতো মনে হত। স্কুলে মাত্র চার পাঁচ ঘণ্টা থাকলে কি হবে, অতক্ষণ ওখানে থাকতে আমার মনে হত আমি যেন খাঁচার পাখী। আবার কালকে স্কুলে যেতে হবে, এই চিন্তাই আমাকে যেন মনমরা করে তুলত। কিন্তু পিতৃদেবের হুকুম, স্কুলে যেতেই হবে। ঝড় হোক, জল হোক, আমার যেতেই হবে—যেতেই হবে।

স্কুলে গিয়েই দেখি ছাত্রদের সংযত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে বেত হাতে নিয়ে মাস্টার মশাইদের গুরুগম্ভীর আওয়াজ স্কুলবাড়ীর শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁছেচে। আমার তখন কাহিল অবস্থা। স্কুলে ঢুকলেই আমার এমন অবস্থা হয়, কোন কিছু শেখা বা বোঝা তো দূরের কথা যেটুকুও বাড়ী থেকে শিখে আসতাম তাও ভুলে যেতাম। স্কুলটা যদি ভয়ের কারণ না হয়ে

আনন্দের কারণ হত, তাহলে আমাদের দেশে কত না সুস্থ সবল দেহের ও মনের ছেলে গড়ে উঠতে পারত। আমাদের দেশে স্কুলে শিক্ষা দেবার কঠোর নির্মম প্রথার পরিবর্তে যদি শিথিল প্রথার প্রচলন হত, তাহলে যে কত না হাসি মুখ নিয়ে প্রফুল্ল ছাত্রছাত্রী বেড়ে উঠে জন্মভূমিকে উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে তুলত তার শেষ নেই। দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক পুজো-অর্চনা ছাত্রদের পক্ষে কত আনন্দদায়ক, তেমনি তাঁর দৈনিক পূজাও যদি এমন আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠত তাহলে তাঁর অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান রত্ন আহরণ করে কত লোকই সুখী ও বিদ্বান হতে পারত।

আমাদের স্কুলে একজন অঙ্কের মাস্টার ছিলেন ; তাঁর নামটা (যদিও আমি ভুলে যাইনি) সাখাওত আলি। তাঁকে দেখলেই আমার মাথায় অঙ্কগুলো সব যেন গোলমাল হয়ে যেত। মুন্সী সাহেব তাঁর লাল চোখ আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিয়ে যত উত্তরের আশা করতেন ততই উনি নিরাশ হতেন আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে। মোটের উপর এই কথা বলতে হবে যে গৌহাটির স্কুল আমার পক্ষে আনন্দালয় না হয়ে যমালয় হয়ে উঠেছিল।

মনে আছে, আমি যখন স্কুলে এইরকম সঙ্কটময় অবস্থাতে কাটাচ্ছি, এমন সময় কলকাতা থেকে আমার দাদারা কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে এসে পেঁছাল। আমার কলকাতার দাদারা আজ বাড়ীতে আসবে এই আনন্দে মাটিতে আমার পা পড়েনি সেদিন। দাদারা এল। গুরুজনদের প্রণাম করে ওরাও স্নেহসংবর্ধনা লাভ করল। ছোটদের সঙ্গে মিষ্টি করে কথাবার্তা বলল এবং তারাও দাদাদের নমস্কার করল। কিন্তু এই দুর্ভাগার অবস্থার কথা কি বলব! আমাকে দেখেই দাদা ডেকে বলে—বাবাঃ এ এত বড় হয়ে গেল? তুই কি পড়ছিস ? কথাটা শুনে আমার মনের আনন্দের জোয়ারে এক নিমিষেই ভাটা পড়ে গেল এবং মাটির নীচের উঁচু নীচু জায়গাগুলো বেরিয়ে পড়তে থাকে। আমার মুখ শুকিয়ে কড়াই ভাজার মতো হয়ে গেল। ভাবলাম, হরি হরি! আমাদের স্কুলের বড় বাঘটি তেড়ে এসে আজকের দিনের মতো সব আনন্দ ম্লান করে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদা আমাকে দিয়ে আমার পাঠ্য পুস্তকগুলো আনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা নিতে বসে গেলেন আমার। আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলাম না বলে তাঁর ভীষণ রাগ হল। তখন তিনি আমায় প্রহার করার

জন্য তেড়ে উঠলেন, আর আমিও দিলাম দৌড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আমাদের বাগানে দৌড়তে লাগলাম আর দাদাও আমার পিছন পিছন তাড়া করতে থাকেন। তিনি আমাকে ধরতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, আর আমার দৌড়ের গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। সকলেই এই দৃশ্য দেখতে থাকে অবাক বিস্ময়ে। শেষকালে এই দৌড়ানো ও তাড়া করার হিড়িক যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমার মা তাঁর বড় ছেলেকে মৃদু ভৎ'সনা করে বলেন যে—তুমি কলকাতা থেকে এসেছ বলে ও কত আশা করে তোমায় দেখতে এল তা না, এসেই তুমি ওকে মারবার জন্য তাড়া করতে লাগলে ? কোথায় ওকে দুচারটে কথা বলে আদর করে জিজ্ঞাসা করবে, না কি এই রকম ভাবে ভয় দেখাতে থাকবে ?

মার কথা শুনে দাদা তখনকার মতো ক্ষান্ত হলেও, মাকে প্রতিবাদ করে বলেন, যে তোমরা ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খাচ্ছ। এত বড় ছেলেটা পড়াশুনা করে না, একটা আস্ত গাধা। এই ঘটনার পর থেকেই আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, দাদা যে কয়টা দিন এখানে ছিলেন, সে কয়টা দিন আমি ওদের থেকে দূরে দূরে থেকেই কোন রকমে কাটিয়ে দিয়েছিলাম দিনগুলো। এই ঘটনাটি ঘটেছিল পিতৃদেব গৌহাটির কর্মস্থল থেকে পেন্সন নিয়ে অবসর নেবার আগেই ; কারণ আমার মনে আছে আমরা শিবসাগরে যাওয়ার জন্য গৌহাটির ঘাটে নৌকায় উঠেছিলাম, রাত্রে বালির চরে ভাত খাবার সময়, দারুণ ঝড় এসে আমাদের খাবার-দাবার বালির নীচে পুঁতে দিল আর বালিতে যে কাপড়টা টাঙিয়ে ছিলাম, সেইটে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল ! সেদিনকার রাত্রে সেই দুর্যোগের সময় বাবা, দাদারা আর অন্যান্য লোক ও মাঝিরা সবাই মিলে নৌকটা তাঁদের কাঁধে তুলে নিয়ে কোনমতে রক্ষা করেছিল। ঝড়ের পরে সেই রাত্তিরেই ওঁরা দুজন কলকাতায় যাওয়ার জন্য সদাগরী জাহাজে উঠে যাত্রা করেন। ওঁরা চলে যাওয়ার পরদিন মা দুঃখ করে কাঁদছিলেন যে 'ছেলেরা গতকাল এত কষ্ট করেও রাত্রে মুখের বাড়া ভাত খেতেও পায়নি'—এই সব কথা আমার বেশ মনে আছে আজও।

আগেই বলেছি, পিতৃদেব গৌহাটিতে একস্ট্রা অ্যাসিস্টেণ্ট কাজের থেকে অবসর নিয়ে পেন্সন পান। গৌহাটির অনেক লোক, বিশেষ করে লক্ষ্মীনাথ গজপুরীয়া বরুয়া মহাশয় পিতৃদেবকে শিবসাগরে ফিরে না গিয়ে গৌহাটিতেই

ঘর বাড়ী তৈরী করে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পিতৃদেব নিজের জায়গাতে ফিরে যাওয়াটাই মনস্থ করেন।

গৌহাটির ভদ্রলোকসকলের মধ্যে উকীল শ্রীমন্ত সেন, যশোমন্ত সেন এই দুজন আর গোবিন্দ চৌধুরীর কথা আমার মনে আছে। এরা আমাদের বাড়ীতে সর্বদাই যাতায়াত করতেন আর বাবার খুবই স্নেহের পাত্র ছিলেন। গোবিন্দরাম চৌধুরী লম্বা-চওড়া আর দেখতে ছিলেন বেশ সুপুরুষ। হাজারের মধ্যে ওঁর চেহারাটা চোখে পড়ার মতো।

কমলানাথ ফুকনের কথা আগেই বলেছি। ফুকন মহাশয়, বড় আমুদে, রসিক, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন আর লোককে কায়দা করে ঠাট্টা-তামাসা করতে ওস্তাদ।

কোন একজন লোক তাঁর কাছ থেকে ডবা[১] কিনতে টাকা ধার নিয়েছিল। লোকটি ডবা বাদ্যযন্ত্র কিনে তাঁর বাড়ীতেই বাজাতে লাগলেন রোজ কিন্তু টাকা ধার অনেকদিন হয়ে গেল শোধ করার নাম নেই তার। ফুকন মহাশয ওর এরকম আচরণ দেখে বার চারেক ধারের টাকা ফেরত চাইলেন, কিন্তু কোনই ফল হলনা। শেষে নিজের তৃপ্তির জন্য এই কবিতাটি রচনা করে বন্ধু বান্ধবের সামনে সুর করে গাইতে লাগলেন,

দলৈ (অমুক) রে
ডবা বাদ্য করে,
তার ধন আজিলৈকে বাকী।
(অমুকর) কথা শুনি
মারো টকা ভরি,
ইকি (অমুকর) ফাঁকি ॥

এই বিদ্রূপাত্মক কবিতায় কয়েক পঙক্তি রচনা করে যে উনি ধারের টাকা ফেরত পেয়েছিলেন কি না বলতে পারিনে, কিন্তু এর দ্বারা যে ওর মনের খেদ অনেকটা দূর হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বলা যায় : কারণ তখন প্রায় সকল রসিক ভদ্রলোকের মুখে মুখে এই কবিতার লাইনগুলো উচ্চারিত হয়ে তার উদ্দেশ্য একপ্রকার সিদ্ধি করেছিল।

গজপুরিয়া বরুয়া মহাশয়ের সম্পর্কেও একটা ছোট মজার কথা মনে আছে।

---

১ এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র

ওঁর একটা ঘোড়া ছিল, ঘোড়াটা তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারত না। বরং তার মন্থর গতিতে বরুয়া মহাশয় বিরক্ত হয়ে বলতেন আর ভৎর্সনা করতেন—ইস্ দেখছনা, যেন ইন্দ্রর উচ্চৈশ্রবা ? ভেজানো ছোলা তো খেতে জান হাঁটতে চাও না কেন ?

শুয়ালকুছির দুটো বড় নৌকা করে আমরা গৌহাটি থেকে শিবসাগর যাত্রা করলাম। গৌহাটি থেকে শিবসাগরে নৌকা বেয়ে আসতে আমাদের বাইশ চব্বিশ দিন লেগেছিল। ব্রহ্মপুত্র থেকে নৌকা করে আসা এই কালটুকু আমার পক্ষে অপার আনন্দের কাল। ফাল্গুনের শেষের দিকে আর চৈত্রের প্রথম দিকে বোধহয় এই নৌকাযাত্রা হয়েছিল। সাদা বালুচর দুপাশে মাঝখানে চিক্‌চিক্ করছে রুপালী ব্রহ্মপুত্র—যেন একটা বড় সাদা চাদর বিছানো। আর সেই বিছানো সাদা চাদরের উপর আমাদের নৌকা দুটো যেন দুটো কালো পিঁপড়ের মতো পিল্‌পিল্ করে চলেছে। দূর থেকে বালির পর্বত এক একটাকে যেন 'দানাদার দোবরা' চিনির পর্বত মনে হত আর এক একটা কাশীর চিনির দলার মতো লাগত। দুপুরবেলা টক খেতে ইচ্ছে, বালির পর্বতকে মনে মনে নুনের পাহাড় বলে কল্পনা করে নিযে সাধ মেটাতাম। দুপুরবেলা আর সন্ধেবেলা বালির চরে নৌকা রাখলেই আমি আনন্দের চোটে যেন ময়ূরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতাম। বালি দেখে আমার এত আনন্দ লাগত যে যতদূর চোখ দিয়ে দেখা যায় দিগন্ত অবধি বালুচরে আমি ইচ্ছে মতো ঝাঁপিযে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম।

একদিন বিকেল চারটে নাগাদ একটা বালির ঢিপির কাছে আমাদের নৌকা বাঁধা হল। আকাশ এবং বাতাসের অবস্থা ভাল নয় দেখে তাড়াতাড়ি চরে নৌকা লাগান হল। দমকা হাওয়া বেড়ে গেলে রাত্রের দিকে ঝড়ও হতে পারে এই আশঙ্কা দেখা দিল। বালিয়ারিটা ভাল ছিল। এখানে নৌকা বাঁধা থাকলে কোন ভয় নেই আর তাড়াতাড়িতে এরকম বালিয়ারি হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে। দূরে বালির উপর দিয়ে দুটো তিনটে কচ্ছপ হেঁটে চলেছে। মাঝিরা বলে এই কচ্ছপগুলো এমন আবহাওয়াতে সাধারণত ডিম পাড়তে বালির উপরে ওঠে। আমাদের চাকর ধনী এই খবর পেযেই কচ্ছপের পিছন পিছন ছুটল। আমরাও দিলাম দৌড়। লোকের শব্দ টের পেয়ে কচ্ছপগুলো ডিম পাড়তে না গিয়ে নদীর দিকে দৌড়তে থাকে প্রাণপণে। ধনী কচ্ছপের চেয়েও এগিয়ে গিয়ে একটা কচ্ছপকে ধরে ফেলে, তার বুকে একটা মস্ত লাথি

ঘা মারল কচ্ছপটা এক লাথি খেয়েই অবশ হয়ে গেল। বাকীগুলো ইতি-মধ্যেই জলের মধ্যে ডুব দিয়ে প্রাণরক্ষা করল। কচ্ছপটা কাটলে তার পেট থেকে দুই কুড়ি ডিম বেরুল।

একদিন নৌকাখানা বালির পার ঘেঁষে যেতে থাকলে নদীর ধারে মাঝিরা একটা কচ্ছপ ধরেছিল। কচ্ছপের পিঠে একটা কাঁটা খড়্গোর মতো ছিল। সেই কচ্ছপটাকে নল-দুরা বলে, সেটা অখাদ্য। মাঝিরা কচ্ছপটাকে নিয়ে কি করল বলতে পারিনে; সম্ভবত তাকে রেঁধে বেড়ে খাবার উপযোগী করে খেযে ফেলে। আমাদের ধনী সেই মাংস খেয়েছিল কি না বলতে পারিনে. কিন্তু বাবার কাছ থেকে এই মাংস অখাদ্য শুনে আমাদের সামনে সে এর অদ্ভুত ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে, 'দুরাচার মন মোর রাম হরিবোল।'

একদিন আমাদের একজন মাঝি বালিতে তার ধুতির কোচা উপড়ে কচ্ছপের ডিম ঢেলে দিল। তার কতকগুলো দেখতে গোল আবার কতকগুলো লম্বাটে। গোলগুলো বড় কচ্ছপের ডিম আর লম্বাটেগুলো ছোট কচ্ছপের। সেই ডিম অনেকদিন ধরে খেযে তৃপ্তি লাভ করেছিলাম আমরা।

একদিন রাত্রে আমরা নৌকোয় শুয়েছিলাম ; এমন সময় মাঝিরা এসে বলে, পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, ভীষণ ঝড় আসতে পারে। সেই কথা শুনে বাবা তাড়াতাড়ি করে মাঝিদের দিয়ে নৌকো দুটোকে ভাল করে খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন আর অন্যান্য সতর্কতাও অবলম্বন করলেন। পনের মিনিটের মধ্যে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে ফেলে ; হুর্ হুর্ গির্ গির্ শব্দে আকাশ কাঁপছে। বিদ্যুৎ চমকান শুরু হল আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড় বইতে লাগল। ঝড় আমাদের নৌকো দুখানাকে নদীর জলে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমাদের গৌহাটির ঘাট থেকে যাত্রা করার দিন যেরকম ঝড়ের রাতে বাবা এবং সবাই মিলে নৌকো কাঁধে করে তুলে রাখতে হয়েছিল, সেদিনও সেরকম নৌকা কাঁধে নিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হল। পরের দিন নৌকা বেয়ে যেতে দেখলাম, আমাদের মতোই একটা নৌকা বালির চরে উল্টে পড়ে আছে। পরে শুনেছিলাম, সেই নৌকার আরোহীগণ নদীগর্ভে ডুবে গিয়েছিল চিরকালের জন্যে। কালের করাল গ্রাস কোন্ দুর্ভাগা পরিবারকে একরকমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিল, কে জানে ?

একদিন সকাল বেলা নৌকোয় যেতে যেতে কাশ ফুলের ঝোপের কাছে

একদল বন্য মোষ দেখতে পেলাম। এই মোষগুলোকে দেখে মাঝিরা ভয় পেয়ে নৌকো ওপারে নিয়ে যাবার কথা ভাবছে, এমন সময় দেখি কি মোষগুলো নিজেরাই ভয় পেয়ে বনের দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। বড়দের সংগে সংগে চার পাঁচটা ছোট্ট সুন্দর সুন্দর মোষও পালাচ্ছে। ওদের দেখতে এত ভাল লাগছিল আমার—ইচ্ছে হচ্ছিল বাচ্চাগুলোকে ধরে আদর করে পুষি।

একদিন দেখতে পেলাম একটা মাছ-খাওয়া পাখী বড় একটা গাছে বসে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ খাবার চেষ্টা করছে। আমাদের নৌকোর সামনের মাঝি একজন পাখীটার গায়ে একটা জ্বালানী কাঠ ছুঁড়ে মারে। খেতে-বসা পাখীটা ভয় পেয়ে উড়ে পালাল, আর মাছটাও ওর মুখ থেকে খসে পড়ল মাটিতে। তখন সেই মাঝিটা ডাঙা থেকে বুক চিতিয়ে মাছটা নিয়ে এসে আমাদের সামনে ফেলল। প্রকাণ্ড বড় মাছ। মাছটা কাটলে ওর ভিতর থেকে প্রায় তিন সের ডিম বেরুল। মাছ-খাওয়া পাখীটা ব্যতীত আর সবাই বেশ তৃপ্তি করে মাছটা ভোজন করল।

একদিন বালির চরের একটা ঝুপড়ি থেকে বুড়োবুড়ি জেলে দুজনকে আমাদের নৌকোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। 'বাবা, একটুখানির জন্য নৌকোটা রাখুন' বলে ওরা চেঁচাতে থাকে। ওদের চীৎকার শুনে আমাদের নৌকোটা তো থামান হল। তখন ওরা বাবার সামনে একটা বড় কচ্ছপের বাচ্চা রেখে বলল—বাবা ঈশ্বর পেন্সন নিয়ে চলে যাচ্ছেন শুনে বাবা ঈশ্বরকে আমাদের প্রণাম জানাতে এলাম। বাবা তখন মিষ্টি কথা বলে ওদের আপ্যায়িত করার পর বুড়ো তার অসুস্থতার কথা বলতে বাবা ওদের ওষুধ দিলেন। নির্জন বালির পারে এই বুড়োবুড়ি কিরকম করে একলা একলা থাকে দেখে আমার মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। ভাবলাম আমাকে যদি আমার অভিভাবকগণ এরকমভাবে একলা ছেড়ে দিয়ে যান তাহলে বালির তীরে একটা সুন্দর কুঁড়েতে থেকে সারা জীবন আমি কাটাব।

কচ্ছপের বাচ্চার টুপ করে ডুব দেওয়ার দৃশ্যটা আমার দেখতে খুব ভাল লাগত। আমি ভাবতাম আমিও যদি কচ্ছপের বাচ্চা হতাম, তাহলে এরকমভাবে টুপ করে ডুব দিয়ে কোথাও চলে যেতাম। এরকম কচ্ছপ দেখলেই আমি গুণতে থাকি। একদিন একটার পর একটা গুণতে গুণতে এককুড়ি তিনটে পেলাম।

ব্রহ্মপুত্রের পারে এক এক জায়গায় মাদুরি বন হয়। মাদুরির ছাল ছাড়িয়ে

তার শাঁসটা খেতে বেশ ভাল লাগে। বাবা কিন্তু আমাদের মাদুরি খেতে দিতে চাইতেন না, কারণ এই মাদুরি দিয়ে মারামারি করে যদু বংশ ধ্বংস হয়েছিল ; সেজন্য মাদুরি খেতে নেই। এমন একটা নিরীহ মাদুরির সংগে এমন ভীষণ স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে, জানতে পেরে সেইদিন থেকে মাদুরি খাওয়া থেকে নিবৃত্ত হলাম।

নদীর এক এক জায়গায় চোরাবালি থাকার জন্য সেই দিকে নৌকা নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। সেজন্য এরকম চোরাবালির আভাস পেলে এপার থেকে ওপারে নৌকা নিয়ে যেতে হয়। দিগন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের এপার ওপার দেখা যায় না। এই বিশাল বিস্তৃত নদীর মধ্যে দিয়ে আমাদের কতবার পারাপার করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এরকমভাবে পার হবার সময় নৌকার সামনের মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় টানত। অনেক কষ্টে এই কার্য সম্পন্ন করত তারা। এই রকমভাবে আমরা এপার থেকে ওপার যেতে পিতৃদেব মাঝিদের কাছ থেকে বৈঠা কেড়ে নিয়ে নিজেই তা ধরতেন। নৌকা পার হবার সময় পিতৃদেব 'রাম পার কর হে, রঘুনাথ সংসার সাগরে,' এই পদগুলো গাইতেন আর আমরা সবাই তাঁর সংগে চীৎকার করে গাইতাম। এই গানের তালের সংগে নৌকার দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মিল মাঝিদের মনে এক অপূর্ব আনন্দ জাগাত আর উৎসাহের চোটে তাদের নৌকা তর্‌তর্ করে এগিয়ে যেত। এরকমভাবে একদিন ব্রহ্মপুত্র পার হযে যেতে নদীর মাঝখানে আমাদের নৌকাটা একটা বালির চাঙরায় আটকে গেল। তক্ষুণি আমার পিতৃদেব নৌকা থেকে নেমে পড়লেন এবং মাঝিদের সংগে মিলে সেই চোরাবালির চাঙরায় আটকান নৌকাটাকে টেনে বের করলেন।

একদিন পিতৃদেব দূর থেকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে বলেন, 'ঐ দেখ কমলাবারী সত্র।' পিতৃদেবের আদেশ মতো আমরা সত্রের উদ্দেশে হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তি জানালাম। পিতৃদেব সত্রের উদ্দেশে প্রণাম করে নামঘোষা সুর করে গেয়ে পরে আমাদের তা ব্যাখ্যা করে শোনান :

যিদিশত মহাভক্ত সবে শ্রীমন্ত কমললোচনক
পরম সন্তোষে কীর্তন যিটো করয়।
সিদিশক নমস্কার করি দুর্ঘোর সংসার সুখে তরি
আপুনি অচ্যুত-স্বরূপ সিটো হোয়য়॥

রমানন্দ-পদ-যুগলর মকরন্দ-মধুব্রত-প্রায়
ভকতসকলে যিদিশত প্রকাশয় ।
সিদিশ জানিবা গঙ্গাদেবী অনেক প্রবাহরূপে আতি
পরম নির্মল স্বরূপে শোভা করয় ॥
শ্রীমধুদ্বিষ ঈশ্বরর কীর্তন মঙ্গল নিরন্তর
যিটো ভূমিভাগে শুদ্ধরূপে হোয়ে জাত ।
তার ধূলি যিটো শিরে ধরে, নিশ্চয়ে জানিবা সিটো নরে
কৃষ্ণর পরম বল্লভ হোয়ে সাক্ষাত ॥

আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, যেদিন আমরা দিখৌমুখের কাছে ঢুকতে যাচ্ছি, সেদিন দুপুরে কাছেরই একটা মিরি গ্রাম থেকে একটা ছেলের ভীষণ একটানা কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। বাবা তখন সেখানে নৌকা থামিয়ে কাঁদুনে ছেলেটির বাবা মাকে ডাকতে পাঠালেন। ওরা এসে হাজির হল বাবার কাছে। বাবা ওদের জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেটাকে এত কেন কাঁদাচ্ছে এবং আর যেন না কাঁদায় সেই কথা বলে বিদায় নিলেন। ওরাও বাবার কথায় খুব সন্তুষ্ট হল। তারপর বাবাকে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকা থামিয়ে রাখতে অনুরোধ করে ওরা। দৌড়ে গিয়ে একটা বড় কচ্ছপ এনে বাবাকে উপহার দিয়ে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে মিরি গ্রামের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে এসে জমায়েত হল আমাদের নৌকার কাছে। বাবা তখন সেখানেই কচ্ছপটাকে কাটালেন এবং নিজে এক আধ টুকরো রেখে দিয়ে বাকীটা ওদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ওরাও খুশি হয়ে বাবাকে প্রণাম করে চলে গেল। বড় জাপির সমান এতবড় কচ্ছপ আগে আমি কখনও দেখিনি।

তখন আমার কত বয়স ছিল বলতে পারিনে। আমি যদিও তখনও ধুতি পরতাম, কিন্তু সব সময় নয়। আমি জানতে পারলাম, দু একদিনের মধ্যে আমরা রংপুর পেঁছাব। আমি তখন ভাবতে থাকি, আমাদের রংপুরের বাড়ীর নতুন লোকজনদের সামনে একবার ক'রে ধুতি পরে আর ছাড়লে খুব লজ্জার কথা হবে, সেজন্য সব সময় পরবার জন্য মাকে আমার জন্য দুখানা ধুতি কিনে দিতে বলি। মা আমার কথা ঠিক ভেবে দুখানা ধুতি কিনে দিলেন আর আমিও বেশ সভ্য ভব্য হয়ে আমাদের রংপুরের বাড়ীতে ঢুকলাম।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

তখনকার কালে আসামের রাজধানী ছিল, রংপুর বা শিবসাগর। এই শিবসাগরের দৃশ্য রাজপ্রতিনিধিদের শহর গৌহাটির চেয়ে আলাদা। গৌহাটির অপরূপ রূপ মাধুর্য, লুইত নদীর মনোরম শোভা রিহা-মেখলার রূপে তার গায়ে বিরাজ করছে, তার গলায় পর্বতের সাতনরী হার, মাথায় ভুবনেশ্বরীর ধবল মুকুট, বুকের উপর উমানন্দ আর উর্বশী। শিবসাগর সমতল, দুচোখ ভরে যতখানি দেখা যায় তা পর্বতশূন্য নিরাভরণা ; মাত্র তার ক্ষীণ হাত দুখানি দিখৌ এবং দিচাং নামের ছোট নদীর বালা একজোড়া দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে। গৌহাটি থেকে নৌকা করে আসতে ব্রহ্মপুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে যখন দিখৌর বুকে ঢুকছি তখন আমার মনে যে ভাব হয়েছিল, নিম্ন আর মধ্য আসাম পার হয়ে রংপুর শহরে ঢুকতেও আমার সেরকমই মনোভাব জেগেছিল। নতুন জায়গায় আমাদের নিজেদের পুরানো বাড়ীতে যাচ্ছি এই আনন্দই আমাকে সারাটা পথ আপ্লুত করে রেখেছিল। কিন্তু যখন রংপুর পেঁছিলাম তখন একটা অনির্বচনীয় বীতরাগ আমার মনের সেই আনন্দকে শুকিয়ে দিল, কেন কে জানে।

আসাম দেশকে সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর সংগে তুলনা করে কেউ কেউ ঠাট্টা করে মাছধরা জায়গা বলত। নিম্ন আসাম বা নামনি আসামের সংগে উজনি অসম বা উচ্চ আসামের সেরকম তুলনা করে শিবসাগরকে ঠাট্টা করা হত। কিন্তু কিছুদিন বাদেই শিবসাগর সম্পর্কে আমার এমন বীতরাগ দূর হল এবং তার পরিবর্তে অনুরাগ জন্মাতে শুরু করল। তার কারণ হচ্ছে বিশাল সুন্দর বরপুখুরী অর্থাৎ বড় পুকুর এবং তার পারে তিনটে দেউল। শংকরদেবের ভাষায় বলতে গেলে, এই দেউল তিনটে—বিষ্ণুদেউল, দেবীদেউল আর মাঝখানে শিবদেউল :

সুবর্ণ রজত লোহা জ্বলে তিনি শৃংগ।
চক্ষুত জমক লাগে দেখিতে বিরিংগ ॥

মন্দিরের দুটো দেউলে রজত শৃংগের পরিবর্তে ত্রিশূল বিরাজ করছে,

মাঝেরটায় অর্থাৎ শিবদেউলের মাথায় চকমকে শৃংগ বিরাজ করছে। ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল ভরা এই পুকুরকে সরোবরের সম্মান দিয়ে শ্রীশংকরদেব বলেছেন :

তাহার মাঝে সরোবর এক।
সাগর-সংকাশ দেখি প্রত্যেক ॥
সুবর্ণময় পদ্মে আছে জুরি।
ভ্রমরে মধু পিয়ে তাত পরি ॥
রাজহংস আদি যতেক পক্ষী।
পরি পার থাকে নাযায় উপেক্ষি ॥

এই রকমের বড় পুকুরটা আশ্চর্যভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছিল। তাছাড়া দিখৌ নদীর প্রবল স্রোত—আমার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কোন সুদূরে। দিখৌ নদীর ওপারের রংঘর, কারেংঘর, তলাতলি ঘর, জয়-সাগরের দেউল আর প্রকাণ্ড পুকুরগুলোও আমার মনকে যে ভরে দিয়েছিল সে কথা না বললেও চলে। খুব শীগগিরই শিবসাগর আমার কাছে আনন্দ সাগরে পরিণত হল আর রংপুর হল রঙের আলয়।

শিবসাগরের বাড়ীতে খেলার সাথী হল আমার দুজন ভাইপো। একজন আমার চেয়ে দেড় বছরের বড় আর অন্যজন আমার চেয়ে ছোট। প্রথম দিনই আমি আবিষ্কার করলাম যে ওরা আমার চেয়ে অনেক বেশী পড়েছে। অবশ্যি সে সবই বাংলা বই। ওদের বাংলা বিদ্যের 'তুবড়িবাজিতে' ওরা আমাকে অবাক করে দিত। পদ্যপাঠের বাংলা পদ্য আমার সামনে আবৃত্তি করে আমাকে যেন ওরা কোণঠাসা করে দিত। সেই কবিতার একটা আমার এখনও মনে আছে :

পৰ্ব্বতে ধূসর মেঘ হইল উদয়।
ভয়ংকর শব্দ করি বেগে বায়ু বয় ॥
পাতা উড়ে ফল পড়ে ভাঙিগতেছে ডাল।
উড়িল বাতাসে সব কুটিরের চাল ॥
নদী জলে উঠে ঢেউ পর্বত সমান।
উপায় না পায় মাঝি করে হায় হায় ॥

ওরা দুজনে যখন প্রচণ্ড শব্দ করে এই কবিতার কয়েক লাইন এমনভাবে আবৃত্তি

করতে থাকে তখন ওদের কাছে আমার লখীমপুর এবং গৌহাটির বিদ্যার দৌড় এমন ভাবে ধরা পড়ে যায় যে আমার মন-নদীর শান্ত জলে পর্বতের সমান উঁচু ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে। আমার বিদ্যাহীনতা আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে থাকে। তখনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ওদের কাছ থেকে আমি বাংলা শিখে নিয়ে ওদেরই জব্দ করব রীতিমতো। যেমন সংকল্প তেমন কাজ। ওদের কাছ থেকে বাংলা কবিতার বইখানা নিয়ে দুচারদিন পড়ে ওদের মুখস্ত করা কবিতাগুলো আমি মুখস্ত করে নিলাম। তারপর ওরা কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেই আমিও তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমানে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলে এই কবিতা যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি স্থাপিত হল। ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনিনের দ্বারা সাময়িক বন্ধ হলে পরে আবার তা প্রকাশ পাবার মতোই আমাদের এই কবিতার যুদ্ধ সাময়িক ভাবে বন্ধ হলেও তা আবার অন্য আকারে প্রকাশ পেল। ঐ দুজন যোদ্ধা আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে গেরিলা যুদ্ধ অর্থাৎ অনিয়মিতভাবে হয়রানি যুদ্ধে মেতে উঠল। আমরা শিবসাগরে যাওয়ায় কিছুদিন আগেই বরপেটার বিখ্যাত তিথিরাম বায়ন তাঁর বাংলা যাত্রা-গানের দল নিয়ে উজনি আসাম দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন। বায়নের সেই যাত্রাগানের অন্তর্গত রাধার 'মানভঞ্জনের পালা' থেকে এক একটা গানের বিকৃত সুরের টুকরোতে তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিল। সেই গানের এক এক টুকরো কথা আজকেও আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে,

ও রাই! আগে প্রেম করিলি হেসে হেসে।
এখন কান্দ কেন নির্জনে বসে॥

আমি ভাবলাম, একি হল। এইবার তো আর আমার রক্ষে নেই। কারণ তখন পর্যন্ত আমি কোন বাংলা যাত্রাগান দেখিনি বা শুনিনি, সেইজন্য এই দুজনের হাতে এবার আমার পরাজয় অনিবার্য। আমি যে সব অসমীয়া ভাওনা বা যাত্রা দেখেছি তার থেকে দু একটা পদ গেয়ে ওদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলো ওরা যা তা বলে উড়িয়ে দিল, কোন আমলই দিলনা। তখনকার দিনে বাংলা গান, বাংলা ভাষা, বাঙালীর মত চুল কাটা, বা ধুতি চাদর পরাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর যাত্রাগুলোতেও অসমীয়া অংকীয়া ভাওনার পরিবর্তে বাঙালী যাত্রাগান দেখান হত। সত্রের মহন্তরা

অশুদ্ধ বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করত ও দর্শককে খুশি করত। মোটের উপর যা কিছু বাঙালী তা সবই ভাল—এই ধারণা সবার মনকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। বড়রা যেদিকে যায়, ছোটরাও সেদিকে যায়, সেজন্য আমি ভাবলাম যে আমারও বাংলা জ্ঞানের অনভিজ্ঞতা অমার্জনীয়। আবার পরমুহূর্তে ভাবলাম, আমারই বা দোষ কি, আমিই বা কোথায় বাংলা যাত্রা দেখার বা শোনার সুযোগ পেলাম যে আমি এদের সংগে সমানভাবে পাল্লা দেব, এই ভেবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনের কাছে হার মেনে চুপ করে গেলাম।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, অবিলম্বে আমি আমাদের বাড়ীর ছেলেদের ও পাড়াপড়শীর ছেলেদের কাছেও অন্যান্য সব বিষয়েই নেতার স্থান অধিকার করে নিলাম। ছেলেদের সংগে খেলতে খেলতে অনেক রকমের খেলায় আমি নিপুণ হয়ে উঠেছিলাম—হৈ ওদু, ডাংগুলি, লুকোচুরি, পাঁচ, কচুগুটি, বাঘ-গোরু খেলা, গাছে ওঠা, বঁড়শি দিয়ে মাছধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময়ে ফুটবল, হকি আর টেনিস খেলার প্রচলন ছিল না। পরে অবশ্যি ক্রিকেট খেলা আমি দেখেছিলাম। এবং বড় হয়ে আমি খেলেওছিলাম। আমাদের একটা জল খাবার পুকুর ছিল। আর সেটা বেশী বড় ছিল না যাতে কেউ পড়ে ডুবে যেতে পারে। বর্ষায় সেখানে জল উপচে পড়ত না। আর গরম কালে জল শুকিয়ে খট্‌খটে হত না। বর্ষাকালে পর্বতের গায়ে যেমন ময়ূরের নাচ দেখা যায়, তেমনি আমাদেরও এই পুকুরে উদ্দাম সাঁতারের নৃত্যের মহড়া চলত। দিন নেই, রাত নেই, সময়-অসময় নেই, কারণে অকারণে, সেই পুকুরে আমাদের সাঁতারের ঝাঁপ আর ডুব। দাঁড়ানো সাঁতার, চিত সাঁতার, আর কত রকমের যে সাঁতার আমরা কাটতাম, তা আমরাই জানতাম আর জানত সেই পুকুরটা। আমাদের এই বাড়াবাড়িতেই বোধ হয় একদিন পুকুরের জল উথলে উঠতে লাগল। চারিদিক থেকে জল এসে মধ্যিখানে জমা হয়ে পর্বতের উঁচু চুড়োর আকার ধারণ করে, তারপর জলরাশি আবার চারদিকে আছড়ে পড়তে থাকে। ঠিক যেন পুরীর সমুদ্রের মত উত্তাল তরংগ,—ঢেউয়ের খেলা এই ছোট্ট পুকুরে। এরকমভাবে মিনিট দশেক ঢেউয়ের আলোড়নের পর পুকুরটা আবার আগের সৌম্য শান্তরূপ ধারণ করল। এই ধরনের ঘটনা আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক উপদ্রব ভেবে পিতৃদেব ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতদের দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করালেন। নামঘরে বা ঠাকুরঘরে নাম কীর্তনও করালেন তিনি। এই ঘটনার পর কিছুদিন আমরাও পুকুরের জলে আমাদের সাঁতার খেলা বন্ধ রাখলাম। কিন্তু তার পরেই আবার যথা পূর্বং তথা পরং। সবার চেয়ে বেশীক্ষণ আমি জলের তলায় ডুবে থাকতে পারতাম। আর এক ডুবেই আমি এই চারকোণা পুকুরের এদিক থেকে ওদিকে চলে যেতাম। পুকুরের পাড়ে একটা কাঁঠাল গাছ, সুপুরী গাছ ও একটা তেতুঁল গাছ একই সংগে ঘেঁষাঘেষি করে ছিল। তেতুঁল গাছের ডালগুলো পুকুরের পাড়ে গিয়ে পড়েছিল। তেতুঁল গাছের ডালে উঠে তার থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে লাফানটা আমার নিত্যকার কর্ম ছিল। পাড়ের থেকে দৌড়ে এসে উল্টে পড়াটাও আমার একটা বাহাদুরীর কাজ ছিল। ঘাটে গিয়ে বা ডান দিকের রাস্তা দিয়ে পুকুরে নেমে স্নান করতে আমার খুব খারাপ লাগত।

আমি যখন সাঁতারের বিদ্যায় সুনিপুণ হয়ে উঠলাম তখন আমার বন্ধু বান্ধবের সংগে পরামর্শ করে একদিন দিখৌ নদীতে গেলাম সাঁতার কাটার জন্য। দিখৌ নদীর প্রবল স্রোতে সাপেরও ল্যাজ ছিঁড়ে যায়। এক একদিন এই স্রোতেও সাঁতার কেটে যেতাম এপার-ওপার। দিখৌ নদীর দুই পারে দুটো খুঁটি পুঁতে লোহার তার লাগিযে তাতে নৌকা বেঁধে ঘোড়া গাড়ী ইত্যাদি পার করান হত। বর্ষাকালে আমরা করতাম কি, সেই পারের নৌকা থেকে ঝাঁপিযে সাঁতার কেটে ওপারে চলে যেতাম। এটা সোজা কাজ নয়, বরং বিপজ্জনকই বলা যায়; কিন্তু আমার মনে ভয় সংশয় কিছুই ছিল না। আমাদের এই সমস্ত কথা কিন্তু পিতৃদেব জানতেন না, জানলে তিনি শাস্তিই দিতেন আমাদের।

আমাদের পুকুরের পারে বুদুরাম মুক্তিয়ার নামের একজন ভক্তকে বাবা বাড়ী করে দিয়ে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি কমলাবারী সত্রের ভক্ত ছিলেন। পিতৃদেব সদা সর্বদাই কমলাবারী সত্রের ভক্তদের আমাদের বাড়ীতে খাওয়াতেন। বুদুরাম মুক্তিয়ারকে আমরা সকলেই 'বুদু আতৈ' বলে ডাকতাম আর শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম।

তাঁকে দিয়ে আমরা কাঠের ছোট নৌকা একটা তৈরী করে নিয়েছিলাম, আর পুকুরে ইচ্ছেমত নৌকা চালিয়ে নৌকা ডুবিয়ে, আবার তাকে টেনে তুলে আমরা কত যে আনন্দ পেতাম তা বলা যায়না। আমাদের এই নৌকা বিহারের এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা নৌকা.

চালাতাম জ্যোৎস্না রাতে। একদিন রাত্রে এইরকমভাবে নৌকা চালাবার সময় হাতে নাতে ধরা পড়লাম। ফলে ভীষণ প্রহার খেলাম, আর আমাদের নৌকাটাও কেড়ে নেওয়া হল। দু-চারদিন পরে বুদু আতৈকে দিয়ে সেই নৌকাখানাকে একটা তক্তাপোষ করান হল। ইন্দ্রের দোষে আশ্রমবিহারী অহল্যাসুন্দরী যেমন পাষাণী হয়েছিলেন আর আমাদের দোষে জলবিহারী নৌকাসুন্দরী তেমন তক্তাপোষে পরিণত হল।

একই দিনে আমার এবং আমার এক ভাইপোর উপনয়ন হয়েছিল। আমার কর্ণবেধ তো অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছিল অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে। কানের ফুটোতে শীসের কাঁটা, খড়কে কাঠি থেকে আরম্ভ করে সোনার পাথর বসানো লংকেরু অর্থাৎ দুলও পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তথাপিও উপনয়নের দিন ব্রাহ্মণের দশসংস্কারের ভিতর একটা সংস্কার হিসেবে সেইদিন আবার কর্ণবেধ হল। উপনয়নের চারপাঁচ দিন আগে থেকে আমাদের টোলের ভিতর যেসকল অব্রাহ্মণ বাস করতেন তাঁদের বাড়ী থেকে আমাদের ভুরি ভুরি খাবার নিমন্ত্রণ এল। আর আমিও মনের আনন্দে সেই সমস্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। এরকম হুড়োহুড়ি করে এমন নিমন্ত্রণ করার অবশ্য মানেও ছিল। শাস্ত্রে বলে,—"জন্মনা জায়তে শূদ্র"। অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও যতক্ষণ অবধি উপনয়ন না হবে, ততক্ষণ অবধি আমি শূদ্রই থাকব। যদিও এই ধরনের শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণের ঘরের বেড়ালের মতোই। কারণ ব্রাহ্মণের বাড়ীর বেড়াল যদি শূদ্রের বাড়ীর পোড়া মাছ আর পান্তা ভাত চুপি চুপি খেয়ে এসে আবার ব্রাহ্মণের পাতে গরম গরম মাছভাজা খায় তাহলেও ব্রাহ্মণের বাড়া ভাত অশুচি হয়না। কারণ বেড়ালের ওরকম আচরণ দেখে হতবুদ্ধি না হয়ে "মার্জারী গমনে শুদ্ধি" বলে মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই অন্নকে শুদ্ধ করে পঞ্চদেবতাকে পঞ্চগ্রাস অর্পণ করে ভোজন করতে দোষ নেই। যা হোক, আমাকে পৈতে দিলেই আমি ব্রাহ্মণ হয়ে যাব আর শূদ্রের বাড়ীতে আমি খেতে পাবনা। আমার শূদ্র বন্ধুদের সংগে বিহারে না হলেও আহারে যে ছাড়াছাড়ি হতে হবে, সেজন্য আগে থেকেই তারা আমায় একবেলা খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করেছিল।

ত্রিলোচন শর্মা নাজির বলে একজন বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন শিবসাগরে। ব্রাহ্মণের বিধি বিধান দেওয়া সমস্ত কাজে আর শান্তিকর্ম, গ্রহযজ্ঞ, তিলহোম,

বটুক-পাক, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আর উপনয়ন আদি কাজে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ত্রিলোচন নাজিরদেব সত্যিকারের পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন তিনি। আমার উপবীত দানে তিনিই ছিলেন প্রধান পুরোহিত। তাঁর সংগে আর যাঁরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে লম্বোদর নামের বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাও আমার বেশ মনে আছে। হোম শেষ হয়ে গেলে লম্বোদর পণ্ডিত করতেন কি, হোমে ঘি ঢালার হাতার ডাণ্ডিটার নীচে ছাই লাগিয়ে সেই ছাইয়ের ফোঁটা আমাদের কপালে লাগাতেন এবং তার সংগে যখন মন্ত্র বলতেন তখন আমার এত হাসি পেত যে, হাসির চোটে পেট ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত। বাবার ধমকানিতে আমার সে হাসি থামাতে হত। হাসির কারণটা ছিল এই—লম্বোদর পণ্ডিত ছিলেন বৃদ্ধ। তাই তাঁর হাত ভীষণ কাঁপত। 'কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্ত পরুষঃ পরুষঃ পরি এয়া নো দূর্বে প্রতণু সহস্রেন শতেন চ' (এর মানে—প্রত্যেক কাণ্ড বা ডাঁটার থেকে দূর্বাংকুর যেমন-উদ্ভূত হয় এবং পুরুষ পুরুষানুক্রমে বর্ধিত হয়, তুমি হে দূর্বা। সেইরকম-ভাবে বংশপরম্পরাক্রমে শত সহস্র বর্ধিত কর)—বেদের এই শ্লোক উচ্চারণ করে লম্বো বাপু আমার কপালে যখন ছাইয়ের ফোঁটা দিতেন, আমরা তখন সেই ফোঁটা নেবার জন্য হাঁটু গেড়ে বসতাম। তাঁর হাত ভীষণভাবে কাঁপত বলে সেই ফোঁটা কারুর ভুরুতে, কারুর নাকে, কারোর বা গালে পড়ে যেত। তিনি এইরকমভাবে ফোঁটা নিজের ইচ্ছেতেই দিতেন আর সেজন্যই আমার এই খুক্‌খুকে হাসি বেদমন্ত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরের গাম্ভীর্যকে ছাপিয়ে উঠত।

পৈতে হয়ে যাওয়ার পর ন্যাড়া মাথায় একটা টিকি ঝুলিয়ে হাতে পলাশের ডালের লাঠি, কমণ্ডলু ও ভিক্ষার ঝোলা হাতে নিয়ে এই ব্রহ্মচারী বালক যখন মাতৃদেবীর কাছে ভিক্ষা চাইত—"ভবতি মাতর ভিক্ষাং দেহি।" তখন অন্যান্য মহিলাগণ আমাকে ঘিরে ধরে গাইতেন—"এ নাযাবা বৈরাগী হয়ে।" এই করুণ রসাত্মক গানে আমার মাতৃদেবীর চোখ ছলছল করে উঠত আর তিনি রিহার আঁচল দিয়ে চোখ মুছতেন। মাকে এরকমভাবে কাঁদতে দেখে কেন জানিনে আমার চোখ দিয়েও দুধারা বয়ে যেত। তিন দিন পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করে দণ্ড পরিত্যাগ করলাম। সন্ধ্যার সময় একখানা পুঁথির মন্ত্র তিন দিনে আমাদের মুখস্ত করতে হয়েছিল। প্রথম কয়েকদিন সন্ধ্যাহ্নিক করতে আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পরে আমি তা নিজে থেকেই করতে পারতাম।

সন্ধ্যার সেই মন্ত্রগুলো তখন আমার মনে হত নাগাদের ভাষার মতো। কারণ তার মানে আমি তখন কিছুই বুঝতাম না, এবং কেউ সেগুলো বুঝিয়েও দিত না আমায়। অথচ মন্ত্রগুলো মুখস্ত করে আমার সন্ধ্যে করতে হত, না করলে ব্রাহ্মণকে পতিত হতে হয়। সেজন্য প্রাণপণে আমি সেই কাজ সমাপন করার চেষ্টা করতাম। অনেক কাল পরে আমি হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম সন্ধ্যার বেদমন্ত্রগুলোর মানে কি সুন্দর। অথচ আগে যদি এর মানেগুলো কেউ আমায় বুঝিয়ে দিত তাহলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানকে আমার এত বিভীষিকা মনে হত না। প্রথম প্রথম আমি কেবলই পঞ্জিকা মেলে ধরতাম, কখন একাদশী, অমাবস্যা পাওয়া যায়, কেননা তার থেকে আমি সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের থেকে রেহাই পেতাম। সেই দিনগুলোতে পঞ্জিকায় ছিল 'সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি'। এই বাণীটা আমার কাছে যে কত স্বস্তি বচন হয়ে পড়েছিল তা বোঝান যায় না।

প্রথমে আমায় বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হল। সেই সময়ে অসমীয়ার মাতৃভাষা ছিল বাংলা; অসমীয়া ভাষাটা যে একটা পৃথক ভাষা নয়, মাত্র বাংলা ভাষারই একরকমের অশুদ্ধ উচ্চারণ স্বরূপ, এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে গবর্নমেন্ট আসামে অসমীয়া ছেলেদের জন্য 'আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়' নাম দিয়ে ছাত্রবৃত্তি পাস করার জন্য বাংলা স্কুল স্থাপনা করে দিয়েছিলেন। আমাদের শিবসাগরে ইংরেজী স্কুলের সমান সারিতেই এইরকম মিথ্যে দাবির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অসমীয়া ছেলেদের কোমল মনের উপর গমপেষা যাঁতার মতোই বাংলা ভাষার যাঁতা ঘর্ঘর্ করে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সেই স্কুলেই আমি প্রবেশ করলাম প্রথমে। স্কুলের হেডপণ্ডিত এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বাঙালী। তৃতীয় পণ্ডিতের থেকে শুরু করে আর সবাই ছিলেন অসমীয়া। হেড পণ্ডিতের নাম ছিল তারকবাবু (তাঁর উপাধিটা আমি ভুলে গেছি), দ্বিতীয় পণ্ডিতের নাম প্রাণকৃষ্ণ ধর। তৃতীয় পণ্ডিত যিনি আমায় বংলা শেখাতেন তাঁর নাম ছিল লম্বোদর। তিনি তাঁর পদবীতে দত্ত কি দাস লিখতেন তা আমার মনে নেই। যা হোক দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে। তখনকার কালে অনেক অসমীয়া শূদ্র বাঙালীদের দেখে নিজের নামের পদবীতে দত্ত উপাধি লাগিয়ে নিতেন। তাঁদের মনে এই কথাটা একবারও খেলে নি যে, দাস উপাধিটা শাস্ত্রমতে চালিয়ে দেওয়া গেলেও, দত্ত উপাধিটা অসমীয়ার পক্ষে একেবারেই অচল। যা হোক, কোন কোন অসমীয়া

তো দত্ত লিখেই সারাটা জীবন চুল-দাড়ি পাকিয়ে কাটিয়ে দিল। একদিন একজন অসমীয়া দত্তকে আমাদের বাড়ীতে খুব অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আমাদের বাড়ীর কাছেই পর্বতীয়া গোসাঁইর সম্পর্কীয় একজন বাঙালী ভদ্রলোক বসেছিলেন; এমন সময় সেই অসমীয়া দত্ত এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সেই বাঙালী দত্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার পর তিনি কোথাকার কোন বংশের 'দত্ত' ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁকে জর্জরিত করে তুললেন। দত্ত মুখ কাচুমাচু করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই অবস্থার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

লম্বোদর পণ্ডিতের গায়ের রঙ কালো, মুখে বসন্তের দাগ আর বয়সেও তিনি যুবক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা অসমীয়া উচ্চারণের ঢঙে পড়াতেন। তাঁর প্রচণ্ড রাগও ছিল। আমিও কোনরকমে চোখ কান বুজে একটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলাম। বাংলা স্কুলে পড়ার সময়কার দুটো ঘটনার কথা আমার মনে আছে। একদিন আমার পেট কামড়াচ্ছে বলে আমি হেড পণ্ডিত তারক-বাবুর কাছে ছুটি চাইতে গিয়েছিলাম। তখন তারকবাবু আমাকে কোমল চাউল[১] খাওয়ার বিপক্ষে অনেক রসিকতা করে বেশ একটা বক্তৃতা দিলেন। আমার ছুটির দরখাস্তে 'পেট কামড়ানোর' উল্লেখ দেখে এই সুযোগটা পেলেন। হেড পণ্ডিত বাবুর বক্তৃতা শুনে আমি লজ্জায় মরে যাবার উপক্রম। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা, কোমল চাউল খাওয়ার মতো এই রকম খারাপ কাজ আমরা করছি। অবশ্যি আমার এই ধিক্কার শুধু পেট কামড়ানোর জন্য নয়, কারণ ভদ্রলোক নিজেই পেট কামড়ানোর জন্য নাগার্জুনের বড়ি অম্লানবদনে খেয়ে হজম করতেন, ধিক্কারের কারণটা হচ্ছে 'কোমল চাউল' খাওয়ার ন্যায় দুষ্কার্যের আত্ম-গ্লানি। আমাদের স্কুলের হেড পণ্ডিত সর্ববিদ্যা বিশারদ তারকবাবু কোমল চাল খাওয়াটাকে অসভ্যতার নিদর্শন বলে যাচ্ছেতাই করেন এবং ওর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে এই কথা শুনে আমায় তা মেনে নিতেই হল। দ্বিতীয় কথাটা হল—একদিন এক দুষ্টু ছেলে আমার জ্যামিতির বইয়ের পাতা একটা (যেটায় ৫ম প্রতিজ্ঞা ছিল) পিন দিয়ে ফুটো করে দিল। সে যে কেন এমন করল বোঝা যায় না। আমি অনুমান করলাম যে সে হয়ত লম্বোদর পণ্ডিতের হাতে পড়া না পেরে লাঞ্ছিত হয়ে তার প্রতিশোধ তুলল ঐ বইয়ের

১ এক প্রকার চাল, চিঁড়ের মত ভিজলে ফুলে ওঠে

পাতাটা ফুটো করে। কিন্তু ঐ ছেঁড়া পাতা দেখে আমার চোখ থেকে অঝোরে জল বয়ে গেল, কেউই আমায় সান্ত্বনা দিল না বা শুকনো কাপড় দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল না।

এই ঘটনার বছর খানেক পর আমাকে একটা ইংরেজী স্কুলের নীচু ক্লাসে ভর্তি করে দেওয়া হল। শ্রীযুত লোকনাথ শর্মা নামে এক মাস্টারের অধীনে আমাদের পড়তে হল। তাঁর ডাক নাম ছিল টেপু। টেপু মাস্টার ভয়ানক নিয়মপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের পড়াশুনার চেয়েও নিয়ম শৃঙ্খলার উপর তিনি নজর দিতেন বেশী। স্কুলের বা বাড়ীর নিয়ম-শৃঙ্খলা যাতে ছেলেরা ঠিকভাবে পালন করে তার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। অবশ্যি সেইসব নিয়মগুলো অনেকখানি সেকেলে প্রথামতো ছিল। কেউ যদি সেই নিয়ম এতটুকু লঙ্ঘন করত তাহলে তার পিঠে পড়ত বেত্রাঘাত। নিজের বাড়ীতে কোন ছাত্র যদি নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে কোন কাজ করে, যেমন দাদার সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর করা, কিম্বা বড়দের কোন কাজ না করে গাফিলতি করা ইত্যাদি কোন অভিযোগ ওঁর কাছে এলে তিনি তখন হয় বেত মেরে নাহলে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে আমাদের শাস্তি দিতেন। এই লেখকের কপালেও যে এরকম ধরনের শাস্তি জোটেনি দু একদিন, তা বলা যায় না। টেপু মাস্টারকে নিয়ে আমরা বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। তিনি ক্লাসে বসে যখন আমাদের মারবার জন্য মুখখানা বেঁকিয়ে দিতেন বা ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে অঙ্গভঙ্গী করতেন তখন আর আমরা হাসি থামাতে পারতাম না। তার ফলে উনি আমাদের পিঠে বা হাতের তালুতে বেতের বাড়ি দিতেন দু-এক ঘা। কিন্তু লোকনাথ শর্মা মোটের উপর আমুদে লোক ছিলেন। আর আমরা যে তাঁকে ভালবাসতাম না, তা নয়।

শ্রীযুত ধর্মেশ্বর নামে আরেকজন মাস্টার ছিলেন। তিনি অত কড়া ছিলেন না যদিও, তার পড়ার মাত্রাটা এত বেশী ছিল যে আমরা তা কষ্ট করে সহ্য করতাম। তাঁর মাথায় টাক ছিল এবং সেজন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা তাঁকে টাকমাথা বলে ডাকতাম।

মতিলাল ঘোষ নামে একজন বাঙালী ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ত। তাঁকে ধ্রুবতারার মত কতো বছর ধরে যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর মুখে এত বেশী দাড়ি ছিল যে চুলের চেয়েও ওর দাড়ি ছিল

বেশী। তাকে মাঝে মাঝে হেড মাস্টারমশায় আমাদের ক্লাসে পড়াবার জন্য পাঠাতেন। যখনই তিনি ক্লাসে আসতেন, তখনই কাউকে না কাউকে হয় বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন নয়তো ক্লাসের বাইরে বের করে দিতেন। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে একজন মাস্টার আমায় উঁচু ক্লাসে পড়াতেন। তিনি মৃদু স্বভাবের ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁরা বহুদিনের আসাম প্রবাসী বাঙ্গালী। কথা-বার্তায়, আচারে-আচরণে তাঁরা অসমীয়ার মতোই। তাঁর বাবা ঠাকুরদাস ঘোষকে আমি দেখেছি। তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক ও শান্ত স্বভাবের। গোপালবাবু করতেন কি, রোজ ক্লাসে একটা ছাপানো মানে বই নিয়ে আসতেন এবং সেই মানে বই থেকে প্রথম থেকে সব কটি ছেলেকে পরের পর মানে জিজ্ঞাসা করে যেতেন। আমরাও করতাম কি প্রথম থেকে যে যেখানে বসতাম তার পালায় কোন্ মানেটা আসবে সেটা শুনে নিয়ে সেই মানেটি খুব ভাল করে মুখস্ত করে নিতাম। গোপাল-বাবুও আমাদের নির্ভুল উত্তর পেয়ে ভাবতেন যে আমরা তাঁর 'লেসন' খুব ভাল করেই শিখে থাকি। এমনিভাবেই অনেকদিন চলছিল। কিন্তু এই চলার ছন্দেও একদিন ছেদ পড়ল। একদিন গোপালবাবু আমাদের যেখান সেখান থেকে মানে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মানে জিজ্ঞাসা না করাতে আমরা হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে হকচকিয়ে গেলাম। আমাদের বিদ্যার দৌড় প্রকাশ পেয়ে গেল। আমার কাছ থেকে যা তা উত্তর শুনে তিনি আমায় তিরস্কার করে বলেন, 'আজকে মদৎখানার থেকে এইদিকে হাওয়া বয়নি বুঝি?' আমি যদিও তখন সেই তিরস্কারের মানে বুঝতে পারিনি, তবুও আমি ভাবলাম যে মাস্টার মশায় আমাকে আজ খুব কথা শুনিয়ে দিলেন। যা হোক সেই দিন থেকে আমি সকল চালাকি পরিত্যাগ করে পড়ার মানে তৈরি করে নিতে লাগলাম। এর পরে দু চারদিন ধরে গোপাল বাবু যখন আমাদের মানে জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর পেতে লাগলেন তখন তিনি তাঁর সেই চিরাচরিত প্রথায় ফিরে যাওয়াতে আবার আমাদের মধ্যে অনেকে সেই আগের উপায়ে মানে মুখস্ত করার কৌশল অবলম্বন করতে থাকে।

শ্রীযুক্ত তোয়ধর শর্মা পণ্ডিত নামে একজন পণ্ডিত কিছুদিন ধরে আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। সংস্কৃততে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি

সাজপোষাক করতেন পুরানো প্রথামতো। একদিন তিনি মুগার ধুতি পরে আসাতে আমাদের মধ্যে থেকেই একটি মুখরা ছেলে বলে ফেলে—আজকে স্যার মুগার ধুতি পরে এসেছেন। এই কথা শুনে পণ্ডিতের বড় রাগ উঠে গেল, তিনি তক্ষুনি বলেন—তোর বাবার পয়সায় আমি ধুতি পরে এসেছি না কি? এই কথা শুনে আমরা তো দমে গেলামই না উল্টে সবাই মিলে খিকখিক করে হাসতে লাগলাম। দুঃখের বিষয় তার মধ্যে আমিও ছিলাম। পণ্ডিত আমার পিতৃদেবকে বড় সম্মান করতেন; তার প্রধান কারণ ছিল—পণ্ডিত পিতৃদেবের বন্ধু সুবিখ্যাত মিত্রধর অধ্যাপকের ছাত্র ছিলেন। পণ্ডিত অন্যদের ছেড়ে দিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, তুমি সিংহশাবক হয়ে শৃগালের মতো আচরণ করছ কেন। সেই তিরস্কার শুনে আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলাম। সেই দিন থেকে আমি আর দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশব না বলে মনে মনে সংকল্প করলাম।

খুবই আশ্চর্যের কথা যে, এতগুলো শিক্ষকের অধীনে আমার বিদ্যা শিক্ষা ঘটলেও, একজনও আমার মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি—প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসায়। এটা হয়তো শিক্ষকদের ত্রুটির চেয়ে তখনকার দিনের শিক্ষা প্রণালীর দোষ বলেই ধরা যায়। অবশ্যি, মাসখানেকের জন্য এরও ব্যতিক্রম ঘটেছিল। শ্রীযুক্ত কেশবনাথ ফুকন (যিনি পরে তেজপুরে সুখ্যাতিসহ হেডমাস্টার হিসেবে ছিলেন) মাসখানেক আমাদের স্কুলে পড়িয়েছিলেন। তিনি এত সুন্দর প্রাঞ্জলভাবে আমাদের পড়াতেন যে বলা যায় না। তাঁর মিষ্টি মধুর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ক্রমশ আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ি। দুঃখের বিষয়, তিনি স্কুলে বেশীদিন ছিলেন না।

আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি দীর্ঘকাল আসাম প্রবাসী বাঙালী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি একটাও অসমীয়া কথা বলতে পারতেন না। আমি বেশীদিন তাঁর কাছে পড়িনি। কারণ আমি সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি বদলি হয়ে যান। তাঁর সম্পর্কে আমার তিনটে কথা মনে আছে।—তাঁর গোঁফ ছিল সর্বসাধারণের গোঁফের চেয়ে লম্বা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তিনি নাকি সুরে কথা বলতেন আর প্রত্যেক কথার শেষে 'অকস", 'অকস" (অফ কোর্স) শব্দটা এত ব্যবহার করতেন যে শিবসাগর জেলার গোয়ালারা যেরকম দুধে

তিনভাগ জল মেশায়, তিনিও তেমন কথার প্রায় তিনভাগে অ'কর্ম' কথাটা বলতেন। তৃতীয় কথা হ'ল, তিনি যে অন্যের চেয়ে ভাল ইংরাজী জানেন তা দেখাবার জন্য দেশের লোকের সবার ইংরাজীর ভুল ধরতেন। অন্যের সংগে তাঁর যে কোন যোগাযোগ ছিল না—একথাটাও তিনি জাহির করে বেড়াতেন।

আমাদের হেড মাস্টারের নাম ছিল শ্রীশ্রীনাথ গুহ। আমাদের দেশে দুবার করে শ্রী লিখতেন সত্রের গোঁসাইয়েরা। সেজন্য শ্রীনাথবাবুর বাংলা হাতের লেখার সই দেখে আমি ছোটবেলায় ভাবতাম যে তিনিও বাংলাদেশের কোন সত্রের গোঁসাই প্রভু বা অধিকারী পুরুষ। অনেকদিন পরে আমার এই ভুল ধারণা ভেঙেছিল এবং জানতে পেরেছিলাম শ্রীনাথের শ্রীটা তার নামের অন্তর্গত। শ্রীনাথবাবু বেশ মোটাসোটা ছিলেন আর তার গায়ের রং ছিল কালো। তাঁর গলার গমগমে আওয়াজ সমস্ত স্কুলঘরটাকে কাঁপিয়ে তুলত। এগারটা থেকে চারটে অবধি তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্লাস না নিয়ে স্কুলের একপাশে একটা ডেস্কে বসে অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন আর মাঝে মাঝে বলতেন 'সাইলেন্স'। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর গুরুগম্ভীর গর্জন সারা স্কুলে তোলপাড় জাগিয়ে তুলত। আমার মনে হয়, আমাদের একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র মতিলাল ঘোষ মাঝে মাঝে মাস্টারীর সুযোগ পেয়ে বোধ হয় হেডমাস্টারেরই নকল করে তর্জন গর্জন করতেন। যাই হোক, শ্রীনাথবাবুর 'সাইলেন্স' গর্জনের মানে হচ্ছে—ছাত্ররা তোরা ভাবছিস যে তোদের হেড-মাস্টার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছেন, আর তোদের দিকে নজর দিচ্ছেন না। তা নয়, তাঁর দৃষ্টি সজাগ। ক্লাসের কোন ছেলের বিন্দুমাত্র ব্যবহারে ব্যতিক্রম ঘটতে দেখলে তিনি 'ইউ' 'ইউ' বলে তাকে কাছে ডেকে নিয়ে এহাত ওহাত পাততে বলতেন আর বেত মেরে তিনি বুঝিয়ে দিতেন তাঁর সবার উপরেই সতর্ক দৃষ্টি। এই বেতের বাড়ি একদিন আমার ভাগ্যেও জুটেছিল। আমাদের ক্লাসে মহীকান্ত বলে একজন দুষ্টু ছেলে ছিল। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যই সেদিন সে আমার কাছে বসেছিল। আমার অমত ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে আমার সংগে পাঞ্জা লড়তে লাগল। এই পাঞ্জাযুদ্ধ হঠাৎ হেডমাস্টারের চোখে পড়তে তিনি প্রচণ্ড চীৎকারে 'ইউ' বলে আমাদের এই যুদ্ধ থামিয়ে দেন। ফিরে দেখি হেড মাস্টার মশায় শুধু আমার

দিকে তাকিয়ে 'ইউ' বলছেন। হে রাম। উনি, প্রধান যে দোষী তার দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন কেন? আমি মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে গিয়ে তার কাছে গিয়ে হাত পেতে দিলাম আর তিনিও বেশ করে দু ঘা লাগিয়ে দিলেন বেত দিয়ে। এরকম অবিচার দেখে আমার মনে ধিক্কার জাগল। আমি ক্লাসে এসে হিতোপদেশের এই শ্লোকটা আমার শ্লেটে লিখলাম—'ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জনেন সমং ক্বচিৎ।' দুর্জনের সংগে থাকলে গাছের ডালে কাকের সংগে হাঁস বসলে যে মজা হয় সেরকমটি ঘটে।

শ্রীনাথবাবুর এক ছেলে ছিল, তার নাম অতুল। সে হেডমাস্টারের ছেলে এজন্য সারা স্কুলের সম্ভ্রম ও কৌতূহলের দৃষ্টি পড়ত তার উপর। অতুলের সংগে যে বন্ধুত্ব করার সুযোগ পেত, তার ভাগ্যকে সবাই ঈর্ষ্যার চোখে দেখত।

বেলা দুটোর সময় হেডমাস্টারের বাড়ী থেকে হেডমাস্টার আর তাঁর ছেলের জন্য জলপান আসত। হেডমাস্টার স্কুল বাড়ী থেকে বাইরে রাস্তার সামনে সেই জলযোগ সমাপন করতেন। সেই বয়সে আমি কিছুতেই এই কথাটা ভেবে পেতাম না যে কেন তিনি স্কুলের অফিসের এককোণে পর্দা একটা টানিয়ে সেই জলপান খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন না। এই প্রশ্ন আমার মনে অনেক দিন জেগেছিল পরে একদিন তার নিবৃত্তিও হ'ল। শ্রীনাথবাবুর কাছে আমার আর পড়া হলনা। কারণ আমি প্রথম শ্রেণীতে ওঠার আগেই শিবসাগরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপর আমি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম আসামের সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রমোহন গোস্বামী হেডমাস্টারের নিকট। সর্ববিষয়ে ওঁর মতো এমন প্রগাঢ় পণ্ডিত আসামে হেডমাস্টার হিসেবে কখনও কাজ করেন নি। চন্দ্রে কলংকর মতো চন্দ্রমোহনের চরিত্রেও একটি কলংক ছিল সেটা অতিরিক্ত মদ্যপান। চাঁদের মতো চন্দ্রমোহনেরও মাসে দুপক্ষ ছিল—একবার মদ খেতে শুরু করলে এক নাগাড়ে পনের দিন ধরে তিনি মদ খাবেন তারপর দিন পনের একেবারে শুকনো খটখটে। তিনি যখন মদ খেতেন না সেই সময়টুকুকে আমি শুক্ল পক্ষ বলতাম আর বাকী সময়টুকুকে বলতাম কৃষ্ণপক্ষ। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কৃষ্ণপক্ষেও তিনি এক একদিন হঠাৎ হঠাৎ উদয় হতেন আর ছাত্ররা তাঁর স্ফূর্তির চোটে বেশ মজা উপভোগ করত। একদিন মনে আছে তিনি তাঁর কৃষ্ণপক্ষের সময় হঠাৎ স্কুলে এসে উপস্থিত হলেন এবং সংগে এলেন বাংলা স্কুলের হেডপণ্ডিত বাবু প্রাণকৃষ্ণ কর। প্রাণকৃষ্ণবাবু নিশ্চয়ই চন্দ্রমোহন

বাবুকে সামলে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে গোস্বামী মশায়ের প্যাণ্টের ভিতর থেকে যে ধুতির কোচা ঝুলছিল তা প্রাণকৃষ্ণবাবুর নজর এড়িয়ে গেছে। তা নইলে তিনি হয়তো সেটা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। গোস্বামী প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে বেড়িয়েছেন এবং প্রাণকৃষ্ণবাবুও তাঁর সংগে ছায়ার মতো ঘুরেছেন। কিন্তু ধুতির কোচাটা জাতীয় পতাকার রূপ ধরে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট স্কুলের 'ইউনিয়ন জ্যাক' পতাকার 'স্পিরিট'কেও অগ্রাহ্য করে চলেছিল, করবাবু এটা দেখলে নিশ্চয়ই ঠিক করে দিতেন। কারণ এই দৃশ্য দেখে স্কুলের সকল ছাত্ররা ভীষণভাবে হাসাহাসি করছিল। যা হোক এর পরে স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার এবং আমার সহপাঠী গোস্বামী মশায়ের পুত্র তাঁকে বাড়ী নিয়ে চলে যান।

চন্দ্রমোহন বিদ্যার গৌরব অর্জন করেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো। তিনি আমাদের অনেক ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। কলেজ শেষ করে সংসারে প্রবেশ করে যখনই আসামে গিয়েছি বা যখনই কলকাতায় গোস্বামী মহাশয়ের সংগে আমার দেখা হয়েছে তখনই তাঁর প্রতি ভক্তিতে আমার মাথা নত হয়েছে। তিনিও পুরানো ছাত্র হিসেবে আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। 'জোনাকী' এবং 'বাঁহী' নামে মাসিক পত্রিকাগুলোতে আমার যে প্রবন্ধ বেরুত সেগুলো পড়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন আর এবিষয়ে তাঁর মতামতও প্রকাশ করতেন। আমার বিবাহের কিছুদিন পর তাঁর সংগে আমার দেখা হয়েছিল এবং তিনি পিতৃস্নেহে আমায় বলেছিলেন—ঠাকুরবাড়ীতে বিয়ে করে তুমি ভালই করেছ। আমি খুবই সুখী হয়েছি। তাঁদের পরিবার বাংলাদেশে খুবই সম্ভ্রান্ত। কিন্তু সেজন্য তুমি তাঁদের কাছে এক চুলও হীনমন্যতা প্রকাশ করনা, কারণ এইটে মনে রাখবে যে তাঁরা যেমন তাঁদের দেশে বংশগৌরবে বড়, তোমার দেশে তুমিও সেরকম। আমি ছলছল চোখে মাথা নীচু করে তাঁর কথার মর্যাদা অনুভব করে তাঁকে প্রশংসা না করে পারলাম না।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

শিবসাগরে এসে সেখানকার একস্ট্রা অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন মহাশয়ের সঙ্গে আমি দেখা করি। শিবসাগরের বড পুকুরের পাড়ে যে বাংলো ছিল তাতে উনি থাকতেন। ফুকনের বাড়ীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা ও কুটুম্বিতা অনেকদিনের। আমার পিতৃদেবের নাতি ৺পূর্ণানন্দ ছোট সাহেবের ভাই ফুকনের দিদির স্বামী। আমার বড় দাদা ৺ব্রজনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গে ফুকন মহাশয় 'সখি' পাতিয়েছিলেন এবং দুজনে দুজনকে ইংরাজীতে 'নান' বলে ডাকতেন, আমি তা শুনেছি। ফুকন মহাশয়ের চলাফেরা আচার আচরণ সব সাহেবের মতো ছিল। যদিও সব বিষয়ে তিনি যে ইয়োরোপীয় ঢঙে চলতেন তা নয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ইয়োরোপীয়দের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত। কিন্তু হিন্দুর দৃষ্টিতে প্রধান যে দোষ পানদোষ তাই তাঁর ছিল না। একদিনের জন্যও তাঁকে আমরা হুঁকো টানতে কিংবা সিগারেট খেতে, এমন কি একটা পান খেতেও দেখিনি। তাঁর ফর্সা সুন্দর রঙ, সুগঠিত গায়ের গড়ন সুদীর্ঘ সুঠাম আকৃতি এবং ধীর গম্ভীর প্রকৃতি আমার মনে চিরকালের জন্য একটা ছাপ রেখে যায়। তিনি যেমন সুন্দর পুরুষ, কথাবার্তা ও বুদ্ধিতেও তেমন প্রখর। সত্যি কথা বলতে কি, ফুকন মহাশয়ের মতো লোক হাজারে একজন দেখা যায়। অসমীয়াদের মধ্যে ফুকন মহাশয়ই প্রথমে নিজের স্ত্রীকে পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য কলকাতায় পাঠান। কিছুদিন পর ফুকন শিবসাগরের থেকে গোলাঘাটে বদলি হন। সেখানে বোধহয় উনি সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করার পর রাজনৈতিক আন্দোলন এবং স্বাধীন ব্যবসায়ে যোগ দেন। ভগবানের দয়ায় উনি এখনও বেঁচে আছেন এবং শিবসাগরের মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছেন। তার নির্মল চরিত্র ও মিতাচারই এই দীর্ঘ জীবনের কারণ বলে আমার মনে হয়। তাঁর উদ্যম শক্তি এত বেশী যে গত নির্বাচনেও তিনি আসামের আইন সভার সভ্য হতে চেয়েছিলেন। সারা আসাম, বিশেষ করে শিবসাগরের জনহিতকর কাজে তিনি ছিলেন সর্বদাই অগ্রণী।

আমার পিতৃদেবের দুই স্ত্রী ছিলেন। আমার মাতৃদেবী ছিলেন দ্বিতীয়া পত্নী। পিতৃদেব তাঁর রচিত "বেজবরুয়া বংশাবলীতে" মাতৃদেবীর বিষয়ে লিখেছেন—

দ্বিতীয় বিবাহ মোর দিবো পরিচয় ॥
অনন্ত কন্দলি ঘরে যার জন্ম ভৈল।
তনু বরপূজারী তাহার নাম রৈল ॥
পরম বিশিষ্ট বিপ্র গুণে অতিশয়।
তার সুতা ধানেশ্বরী বিবাহিলো মই ॥

আমার দুই মার মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। বড়মা ছোটমাকে নিজের বোনের মতো মনে করতেন আর ছোটজনও বড়জনকে নিজের দিদির মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। দুজনের মধ্যে কখনও সতীনের প্রতি জন্মানো স্বাভাবিক হিংসা-দ্বেষ ছিল না। আমি শিবসাগরে আসার পর আমার নিজের মাযের চেয়েও বড় মাই অধিক যত্ন আদর দিয়ে মানুষ করে তুলেছিলেন আমাকে। ছোটবেলায আমি তাঁর সংগে খেতাম শুতাম ও উৎসাহের সংগে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা পুণ্য কাজে যোগ দিতাম। সারা মাঘ মাসটাই ভোরবেলা আমি তাঁর সংগে যেতাম দিখৌ নদীতে স্নান করতে। কার্তিক মাসে তুলসীতলা মুছে তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বালাতাম ও 'আকাশ বাতি' দিতাম।

আমাদের বাড়ীতে রাত্রে অনেক দেরী করে খাওয়াটাই প্রথা হযে গিয়েছিল। ছোটরা এক ঘুম দেওযার পর তারপর তাদের জাগিয়ে দেওয়া হত ভাত খাবার জন্য। একদিন মা করলেন কি আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে ভাতের পাতে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনও আমার চোখ বুজে ছিল। মা আমাকে 'খাও' 'খাও' বলে যাচ্ছেন আর আমিও বেশ ঘুমে ঝিমুচ্ছি। মা তখন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি আমার ঘাড় ধরে ভাতের থালার কাছে নিয়ে এলেন। কিন্তু আমি ভাতের থালায় না পড়ে কাছেই একটা জল শুদ্ধু মুখ ধোবার জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তখন পৌষমাসের শীতের রাত। আমার দুর্দশা দেখে বড়মা মাকে যাচ্ছেতাই করে বকে আমাকে গরম জল দিয়ে হাত পা মুছিয়ে, শুকনো কাপড় পরিয়ে তাঁর সংগে নিয়ে বসে ভাত খাওয়ালেন। মাকে তিনি শাসিয়ে বললেন, আর যেন তিনি কখনও আমাকে ভাত খেতে তুলে না।

নিয়ে আসেন। বড়মা নিজে নিয়ে আসবেন নয়তো তাঁর দুজন পুত্র বধূর উপর ভার দিলেন আমাকে তুলে নিয়ে আসার জন্য।

বড়দা ৺বজ্রনাথ আর মেজদা জগন্নাথ এই দুজনের স্ত্রীই মাত্র তখন আমাদের বাড়ীতে পুত্রবধূ। দুজনেই দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন এবং আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমিও তাঁদের খুব ভালবাসতাম। বড় বৌদির বাবা জোকতলীর মৌজাদার ছিলেন। শ্রাদ্ধ, অনুষ্ঠানআদি কাজে কখনও পিতৃগৃহে গেলে আমাদের ডেকে নিয়ে এত আদর-যত্ন করে তিনি খাওয়াতেন যে এই কথা চিরকাল আমার মনে এক মধুর স্মৃতি বহন করে চলেছে। আমার বড় বৌদি ছোটবৌদির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বড়দার দ্বিতীয়া স্ত্রী। বড়দার প্রথমা স্ত্রী আগেই মারা যান। পরে তিনি আবার বিবাহ করেন। সেজন্য বড বৌদি ছোট বৌদিকে নিজের জায়ের চেযেও বোন হিসেবে দেখতেন বেশী। মোটের উপর দুই জায়ের মধ্যে এত মিল ছিল যে দেখা যায় না। অবশ্যি লেখাপড়া কেউ বিশেষ জানতেন না। ছোট বৌদি কাশীরাম দাসের বাংলা ছাপা মহাভারতের কোন একটা ছোট বিশেষ ধরনের পর্ব পড়তে পারতেন, কিন্তু লিখতেও পারতেন না বা অন্য কোন বইও পড়তে পারতেন না। কোন বিশেষ একটা পর্ব কথাটা বলার মানে আছে। অন্যের কাছে শুনেই হোক বা শিখেই হোক সেই পর্বটা তাঁর প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য সেই পর্বের প্রত্যেক লাইনেরই প্রথম অক্ষরটা দেখলেই তিনি বাকি অক্ষরগুলো না দেখেই প্রায় পড়ে ফেলতে পারতেন। আর সেই পর্ব বাদে অন্য কিছু পড়তে দিলেই তিনি পড়তে পাড়তেন না। বড় বৌদি অবশ্যি চিঠি লিখতে পারতেন। আমার মনে আছে বড়দা যখন ডিব্রুগড় বা গৌহাটিতে যেতেন তখন বড়বৌদি তাঁকে খুব গোপনে চিঠি লিখতেন লুকিয়ে। কারণ তখনকার দিনে মেয়েদের বা বৌয়েদের (নিজের স্বামীকে পর্যন্ত) চিঠি লেখাটা একটা দোষের কাজ বা অনাবশ্যকীয় কাজ বলে বিবেচনা করা হত। সেজন্য তিনি চিঠি লিখে আমাকে দিয়ে শুদ্ধ করিয়ে নিতেন এবং তারপর তা আমাকেই ডাকে ফেলতে হত গোপনে। তখন আমার কতই বা বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়! তবুও বড়বৌদি আমাকে বিদ্বান ভেবে আমাকে দিয়ে চিঠি কেটে কুটে ঠিক করিয়ে নিতেন বলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতাম। কিন্তু আমাকে লেখাপড়া জানা

মনে করার চেয়েও বড় বৌদি আমকে দিয়ে এই কাজ করানোর মানে ছিল একটা। আমার চেয়ে বড় কাউকে দিয়ে তাঁর সেই প্রেম পত্র সমর্পণ করাটা অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। কিন্তু আমার মতো বুদ্ধির ঢেঁকিকে চিঠি ডাকে দিতে বলাতেই তো লাগল যত গণ্ডগোল! চিঠিখানা জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে আমি ডাকঘরে পেঁছিলাম। কিন্তু কোথায় যে চিঠিখানা ফেলতে হবে তা বুঝতে না পেরে ডাকঘরের সামনে পড়ে থাকা ভাঙা বাক্স একটার মধ্যে চিঠিখানা ফেলে দিলাম। সামনেই লোক একজন দাঁড়িয়েছিল, সে বলল— 'চিঠিখানা ডাকে ফেলতে নিযে এসে ঐখানে ভরে দিলে কেন? ডাকে দিতে গেলে এইখানে ফেলতে হয়।' আমি তখন ভুল বুঝতে পারি, ভয়ে আমার মুখ গেল শুকিয়ে। সেই ভাঙা বাক্সটার মধ্যে আমার হাত যায়না দেখে পোস্ট মাস্টারের কাছে আমি আমার বিপদের কথা বলি। তখন তিনি দয়া পরবশ হযে ভাঙা বাক্সটা আরেকটু ভেঙে দিয়ে চিঠিখানা বের করে আনলেন এবং আমার হাতে দিযে কোথায় ফেলতে হয তা দেখিয়েও দিলেন। আমি তখন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলাম। আমি শিবসাগরে থাকতেই আমার এই বৌদির মৃত্যু ঘটে। তিনি একটি ছেলে রেখে মারা যান, সেও এগার কি বারো বছর বয়সে মারা যায়।

সিংদুয়ার নামে একটা করহীন 'গ্রান্ট' নিয়েছিলেন পিতৃদেব। আসাম রাজার রাজধানীর কেল্লাতে সিংদুয়ার ছিল বলে তাকে সিংদুয়ার বলা হত। সেখানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে বাঁশ গাছ বা কাঠ পাওয়া যেত, কিন্তু তার মাটি চায়ের চাষের উপযোগী ছিলনা। বড়দা সেখানে চাষ করে তাকে চাবাগানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে কৃতকার্যও হয়েছিলেন কিছুটা। রোজ দুপুরবেলা তিনি হেঁটে যেতেন বাগানে আর সন্ধ্যেবেলা হেঁটে ফিরতেন বাগান থেকে। বাড়ী থেকে বাগান ছিল প্রায় তিন মাইল দূরে। ফিরবার সময় গংগাগোবিন্দ ফুকনের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া তার রোজকার একটি কর্তব্য ছিল। সেজন্য বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হত তাঁর। তিনি না আসা অবধি তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং আমার দুই মা তাঁর জন্য না খেযে অপেক্ষা করতেন— এই দৃশ্যটা আমার মনে বড়ই কষ্ট দিত। বাবা এবং মায়েরা এর জন্য তাঁদের কষ্টের কথা বলে বলেও তাঁর এই বদভ্যেস ছাড়াতে পারলেন না।

আমার পিতৃদেব ঘোড়ায় চড়তে বড়ই ভালবাসতেন। ঘোড়ার আস্তাবলে

ভুটিয়া ঘোড়া একটা সর্বদাই বাঁধা থাকত। বাবা একজন পাকা ঘোড়সোয়ার ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে বাবা সিংদুয়ারের বাগানে কাজ কর্ম দেখতে যেতেন। একদিন তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙার মতো অবস্থা। সেদিন থেকে সবাই তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘোড়ায় চড়া থেকে নিবৃত্ত করলেন। বাবার একটা পুরানো ধরনের ঘোড়ার গাড়ী ছিল; কিন্তু সেটা সবসময়ই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত। সেই গাড়ীর একটা ইতিহাস বলছি—বাবা যখন তেজপুরে মুন্সেফ ছিলেন তখন রামদয়াল নামে অসমীয়া একজন ডাক্তার বাবার কাছ থেকে ঘোড়ার গাড়ী চেয়ে নিয়ে হাওয়া খেতে যান এবং গাড়ী শুদ্ধু ব্রহ্মপুত্রের জলে পড়ে যান তিনি। ঘোড়াটা মরে গেল, ডাক্তার জলে পড়ার আগে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে কোনরকমে প্রাণ বাঁচান কিন্তু পায়ের ছাল টাল উঠে যায়। কিন্তু গাড়ীটা ব্রহ্মপুত্রের বালি থেকে খুঁড়ে তবে উদ্ধার করা হয়। তখন থেকেই সেই গাড়ীটা আর 'মেরামত' হয়নি।

পিতৃদেবের চারজন মেয়ে। ছোট মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবার আগেই বিধবা হয়ে আমাদের বাড়ীতেই ছিল। মেজ মেয়ে একটি ছেলের মা হবার পরই বিধবা হয়। জামাইয়ের ব্যাপারে বাবার ভাগ্য ভাল ছিল বলা যায় না। যাঁরা দুজন বেঁচেছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও যে বাবা সুখ পেয়েছিলেন—একথা বলা যায় না। শ্বশুরবাড়ী যাবার পর থেকেই মেয়ের বাবার বাড়ীতে ভাত বা চিঁড়ে আদি খাওয়া বন্ধ; কারণ জামাইয়ের ভয় যে তাঁরা বিয়ে করে যে সহধর্মিণীকে শুচিশুদ্ধ করে নিয়েছে সেই শুদ্ধ করে নেওয়া স্ত্রীর দেহ আবার অশুচি হয়ে যাবে—এই ভয় তাঁদের সর্বক্ষণ থাকত। এই ধরনের প্রথা যে শুধু আমাদের বাড়ীতেই চলতি ছিল এমন নয়—তখনকার দিনে উজনি আসামে এই ধরনের বিশ্রী প্রথা প্রায় লোকের বাড়ীতেই প্রচলিত ছিল। এই ধরনের বর্বরতা কোথা থেকে এসেছিল বলা যায় না। আশা করি আজকালকার শিক্ষিত অসমীয়ারা এই বর্বরতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবে।

আমার সেজদাদা গোলাঘাটের গুড়যোগনীয়া মৌজার মৌজাদার ছিলেন। এইখানে বলা যায় যে, সেকালে ওকালতি করা ব্যবসায়টা বড় সম্মানজনক ছিল না। কারণ তখন উকীল হতে গেলে 'প্লীডারশিপ' বা বি. এল. পাশ করতে হত না। হাকিম যদি কাউকে উকীল হবার হুকুম দেন, তিনি কাছারীর

বইতে নাম লিখেই উকীল হতে পারতেন। বাবা এরকমভাবে নাম লিখিয়ে দিযে কত লোককে উকীল করে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজের ছেলের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করে, কোন একটি ছেলেকেও উকীল করলেন না। সেজন্য তাঁর ছেলেদের মধ্যে, কেউ কেরানী, কেউ স্কুল মাস্টার বা কেউ বা মৌজাদার।

গোলাঘাটের দিকে নতুন গোঁসাইর বাড়ীতে সেজদার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়। সেই বিয়ে ছিল মাঘমাসে। আমরা বাড়ীর প্রত্যেকে সেই বিয়েতে যাবার তোড়জোড় করছি এমন সময় ভীষণ বর্ষা হল এক পশলা। সেই বর্ষা অর্থাৎ হেন অকালবর্ষা অমঙ্গলে বর্ষা। কাজেই বিয়ের দিন পিছিয়ে গেল। অকাল বৃষ্টির এই দুর্দিনের দোষ কাটিয়ে উঠলে আমরা নৌকা করে বিয়েতে উপস্থিত হলাম। শিবসাগর থেকে যাওয়ার আগে আমার বড়মার ইচ্ছে হল তার মেয়ের বড় ছেলেকে (১০।১১ বছর) আমরা সঙ্গে নিযে যাই। তাঁর ইচ্ছার কথা পিতৃদেব চিঠিতে জামাইকে জানালে, তিনি বাবার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার পত্র চাইলেন যে যাতে তাঁকে দিদিমা বা অন্যান্য কেউ সিদ্ধ অন্ন বা পাকান্ন না খাওয়ান। জামাইয়ের এই অদ্ভুত চিঠির কথা শুনে বড়মা রাগে ফেটে পড়লেন আর বাবাও চিঠির উত্তর না দিযে চুপচাপ রইলেন। দৈবদুর্বিপাকে আবার একপশলা অকাল বৃষ্টি হওয়াতে বিযে বন্ধ হযে যায। আবার বিয়ের দিন পিছিযে দেওয়া হল। তারপর সেখানে কিছুকাল থেকে সেই বিয়ে হযে গেলে আমরা ফিরি। আগেই যেসব বাধা-বিপত্তির কথা বলেছি সেসব হয়তো ভবিষ্যতের অমঙ্গলের সূচনা করেছিল। বিবাহের কযেকদিন পরই আমার সেই দাদা কাসির অসুখে ভুগতে লাগলেন। পিতৃদেব অনেক চেষ্টা আর পরিশ্রম করেও অনেক নতুন নতুন ঔষধপত্র খাইযেও কিছুতেই তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে পারলেন না। তাঁর স্ত্রীও স্বামীর মুখ না দেখেই বিধবা হল। বিযেয দিন কনের দাদা না কি হয বলতে পারিনে—ন গোঁসাই প্রভুর ব্যবহারটা বড়ই চোখে লেগেছিল। বিয়ের আসরে তিনি একটা কাঠের মূর্তির মতো বসেছিলেন এবং পাছে আমাদের মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা-বার্তা বললে তাঁর মান-হানি হয় সেই ভযেই উনি তটস্থ ছিলেন। এঁরা তো সম্ভ্রান্ত পরিবারের গোঁসাই বলা যায, কিন্তু গোঁসাই নামধারী রাম শ্যাম যদু মধু সকলেই মেয়ের বিয়ে সাধারণ ভদ্র পরিবারে দিতে চাইবেন—কিন্তু বিয়ের সময অহংকারের চোটে আর তার মাটিতে পা পড়ে না বলা যায়। একবার মনে আছে—শিবসাগরেরই

এক ভদ্রলোকের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে পাত্রপক্ষের সংগে বরযাত্রী হয়ে গেলাম আমি। আমরা কনের বাড়ীর দরজার গোড়ায় ঢুকতে যেতেই তাঁদের কাছ থেকে নির্দেশ এল যে আমাদের জুতো মোজা খুলে তবে ঘরে ঢুকতে হবে। আমরাও জুতো মোজা খুলব না আর ওঁরাও ছাড়বেন না। শেষকালে পাত্র পক্ষ ও কন্যাপক্ষের হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। অনেক কষ্টে অনেক কথার পর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে এই গজ কচ্ছপের যুদ্ধের শেষ হয়। অহংকারই অসমীয়াদের পতনের কারণ। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা না করে এবং সময়ের স্রোতের বিপরীতে গিয়ে এই গোঁসাইদের অবস্থা মাটিতে পোঁতা ঢলঢলে খুঁটিটার মতোই।

আমার যে দিদি বিধবা হয়েছিলেন তাঁর নাম পিয়ালী। আমি শিবসাগরে আসার দুতিন বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আমাদের চোখে ছিলেন একটি বিষাদের প্রতিমূর্তি। এই সুমধুরভাষিনী দিদিটির হৃদয়ে শোকের আগুন যে কি ভাবে জ্বলছিল—তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

হিন্দু আইনের কঠোর নির্মমতা কজন দুঃখীর দুঃখ প্রতিকার করতে পেরেছে ? বংগদেশের বিদ্যাসাগরের মতো দয়ার সাগর আর কজন আছে ? যেদিন তাঁর মৃত্যু হল সেদিন রাত তিনটে নাগাদ তিনি একে একে সবাইকে নাম আর সম্বন্ধ ধরে ডেকে তাঁর ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমি ছোট ছিলাম তখন, ঘুমুচ্ছিলাম। আমাকেও ঘুম থেকে ওঠানো হল এবং ওঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দিদি আমার কাছেও ক্ষমা চাইতে ভুললেন না। আমি নির্বাক নিস্পন্দভাবে তাঁর কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। তখন আমার ছোট ভাইটি শিশু। তিনি ওর নাম ধরেও বললেন, যে ওর সংগে খেলতে পারলেন না বলে আপশোষ থেকে গেল। এই কথার মিনিট দশেক পর তিনি ভগবানের নাম নিতে নিতে ঈশ্বরের কাছে বিদায় নিলেন অর্থাৎ ইহ ধাম ত্যাগ করলেন। বাড়ীতে কান্নার রোলে ভেঙে পড়ল সবাই।

আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে পিতৃদেব অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ছিলেন এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁর হৃদয় স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ ছিল। পরিবারের কোন একজনও যদি কোন কারণে রাত্রে ভাত না খেয়ে থাকত, উনি যতক্ষণ না তাঁকে ডেকে এনে খাওয়াতেন ততক্ষণ পর্যন্ত মোটেই শান্তি পেতেন না। নিজের বংশের কেউ গরীবই হোক বা ধনীই হোক তিনি

সবাইকে তাঁর স্নেহ মমতার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো দৃঢ় চিত্ত এবং ধৈর্যশীল লোকও আজ অবধি আমি খুবই কম দেখেছি বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কোন সৎকাজ করার সংকল্প করলে তিনি তা করবেনই। কিন্তু কোন কাজে যদি কারো দ্বারা বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, সেকথা বুঝিয়ে দিলে তিনি কখনই তা করতেন না। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, কিন্তু তিনি কখনও অস্থির হননি বা ধৈর্য হারান নি। যত বড় বিপদই আসুক না কেন তা মাথা পেতে তিনি মেনে নিয়েছেন—থেকেছেন অটল অবিচল। ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাসই এর মূল কারণ। তার চোখে আমি দেখেছি আনন্দের অশ্রু, প্রেমের অশ্রু। শোকের জন্য চোখের জল ফেলতে আমি কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর পুত্র গোপাল মারা যাবার আগেই তাঁকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসা হল তুলসীতলায়। সারা বাড়ী কেঁদে আকুল, কিন্তু বাবার চোখে জল নেই একফোঁটাও; তিনি মৃত্যু শয্যাশায়ী পুত্রের মঙ্গলের জন্য যা যা আয়োজন করতে হয় তা সবই করলেন আস্তে আস্তে। সেই মৃত্যু-মঙ্গলের যাতে ব্যাঘাত না হয়, তার জন্য সবাই কাঁদতে থাকলে তিনি ধমক দেন এবং পুত্রের শিয়রে বসে "ওঁ রাম", "ওঁ রাম" এই মহামন্ত্র জপ করতে লাগলেন। চারদিক নিস্তব্ধ তখন। সকল শাস্ত্রের সমস্ত মন্ত্রের মূল বীজ এই 'রাম' নাম আধঘণ্টারও উপর ছেলেকে শোনাতে শোনাতে মৃত্যু কবলে পড়ে থাকা এই ছেলে একবার স্পষ্টভাবে 'রাম' উচ্চারণ করে। পিতৃদেবের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। ওকে যারা ঘিরে ছিল সবাই উচ্চারণ করল 'রাম' 'রাম'। ক্ষণেকের মধ্যে সে জড়দেহের থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল চিরানন্দ ধামে। দর্শকদের মধ্যে শিবসাগরের একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড করে প্রার্থনা করেন—'হে ঈশ্বর! বেজবেরুয়া মহাশয় বেঁচে থাকতেই তার সামনে আমি যেন চলে যেতে পারি।'

ছেলে গোপাল ও মেয়ে পিয়ালীর মৃত্যুতে আমাদের বড়মা শোকে ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি আর বেশীদিন বাঁচেন নি। মেয়ের ছমাসের শ্রাদ্ধে তিনি নিজের হাতে সব ব্যবস্থাদি করার পর হঠাৎ সেদিনই তাঁর মৃত্যু হয়। সেদিনও পিতৃদেবের বীর ও প্রশান্ত মূর্তি দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

আমার বড় ভাই যখন কলকাতায় ছিলেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে তখন আমার

মেজ ভাইয়ের বিয়ে হয় আসামে। অবশ্যি আমার নিজের এই বিয়েটা ভাল লাগেনি, তার কারণ, বড ভাই থাকতে, ছোট ভাইয়ের আগে বিয়ে হওয়াতে নিশ্চয় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কারণ এর পরে থেকে তাঁকে কোন কোন কাজে বড় বেপরোয়া হতে দেখেছিলাম। এই বিয়ে হয় যোরহাটে। সেই বিয়েতে আমাদের বরযাত্রী হয়ে যেতে রাস্তায় যে কি ভীষণ কষ্ট হয়েছিল, সেকথা আমার এখনও মনে আছে। শংকর নামের একজন মেথর অনেক টাকা পযসা জমিয়ে চারখানা ঘোড়াগাড়ী কিনেছিল। ওরই দুখানা কি তিনখানা গাডী নিয়ে আমরা শিবসাগর থেকে যোরহাটে যাচ্ছিলাম। তখনও যোরহাট পেঁছিতে আরও পাঁচ ছ'মাইল বাকী। এমন সময় হাঁটু সমান কাদাতে আমাদের গাডী আটকে গেল। যোরহাট অবধি সেই পুরো রাস্তাটা আমাদের কি ভীষণ দুর্দশা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের রথ যেমন কাদা মাটিতে আটকে গিযেছিল, সেরকমভাবে আমাদের গাডীর চাকাগুলোও আটকে গেল। ঘোড়া গুলো আর গাডী টানতে না পেরে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তখন আমাদেরই গাড়ী টানতে হল। আমরা ঘোডা দুটোকে চাবুক দিয়ে অনেক মারতে ওরা যদিও উঠে দাঁড়াল কিন্তু কিছুতেই আর গাডী টানতে রাজী হল না। তখন আমরা গাড়ীর মধ্যে মহিলাদের বসিযে সেই কাদায় আস্তে আস্তে করে গাডী ঠেলতে লাগলাম। গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়াদেরও আমরা ঠেলে নিয়ে গেলাম। এই রকমভাবে আমরা আস্তে আস্তে যোরহাট পেঁছিলাম কোনরকমে।

এই বিয়ের বছর খানেক বাদে আরেকটি দাদার বিয়ে হয়। এই বিয়ে হয়েছিল শিবসাগরের অর্জুনগুড়িতে। পিতৃদেবের ঘোরতর আপত্তি ছিল এই বিবাহকার্যে। কিন্তু পাত্র এবং তার একজন ভাইকে টোলের একজন লোক হাত করে নেওয়ার ফলে পিতৃদেবের সমস্ত আপত্তি ব্যর্থ হয়ে যায়। পিতৃদেবও আনন্দমনে তখন সেই বিয়েতে মত দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করেন।

এর পরের ভাইযের বিয়ে হয়েছিল খুব রোমাণ্টিক ধরনে। শিবসাগরে বাড়ীর নিকটে দিখৌ নদীর পারে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে একজনের বিযে ঠিক হয়েছিল। বরের বাড়ী অনেক দূরে; অন্তত বিয়ের দিন সকালে শিবসাগরে পেঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু সকাল দশটা বেজে গেলেও বরের বাড়ীর যখন কেউ এল না, তখন পিতৃদেব অনেক দূর পর্যন্ত লোক পাঠিযেও বরযাত্রীর কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না। কন্যার

পিতা তো আমার পিতৃদেবের কাছে বিপদগ্রস্ত হয়ে এলেন ও হাঁপিয়ে বললেন মেয়ের বিয়ের সব ঠিক, কিন্তু তখন অবধি বরের বাড়ীর কেউ এসে পৌঁছল না, বিয়ে না হলে তিনি ভীষণ বিপদে পড়বেন। এখন তিনি যদি তাঁর ছেলেকে ওঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন তাহলে তিনি উদ্ধার পেতে পারেন। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা হৃদয়ঙ্গম করে পিতৃদেবের মন কোমল হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে এনে সব বুঝিয়ে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন সে রাজী আছে কিনা। মেয়েটি সুন্দরী। আমাদের বাড়ীতে সে সর্বদাই যাতায়াত করত। সেজন্য আমার দাদা নিমেষের মধ্যেই রাজী হয়ে যান এবং বাড়ীর সকলেই খুশী মনে এই বিয়েতে সম্মতি দেন। ফলে সেদিনই দাদার বিয়ে সম্পন্ন হল এবং আমাদের ঘরে এল একটি সুন্দরী বৌদি। আমার উপরের যে ভাই ছিলেন তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় 'আসাম-বুরঞ্জী' লেখক সুবিখ্যাত তামুলী ফুকনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলানাথ ফুকনের কন্যার সঙ্গে। আগেই আমি কমলানাথ ফুকনের কথা বলেছি।

এই কন্যাব বিবাহের সময় ফুকন মহাশয় জীবিত ছিলেন না। ফুকনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ছেলেমেয়েদের শিবসাগরে নিয়ে এসে রেখেছিলেন তাঁরই আশ্রয়ে। আমি খুবই আপত্তি জানিয়েছিলাম এই বিয়েতে, কারণ দাদা তখনও স্কুলে পড়তেন। কিন্তু আমার আপত্তি টিঁকল না। আর আমার মতো সামান্য ছেলের একটা তুচ্ছ আপত্তির মূল্যই বা কত? সেই আপত্তি বুদবুদ হয়ে মিলিয়ে গেল। আমি ওকে যতটা পারি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়ে না করার জন্য রাজী করিয়েছিলাম কিন্তু তা ভেঙে চুরমার হল বড়দের চাপে। এইজন্য বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই বিয়ের ভোজ খেয়ে আনন্দ করল; কিন্তু দাদার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেল তখন থেকেই।

তখন আর আমার পড়াশুনা কে দেখছে? এর পরে পারলে আমারও বিয়ে দিয়ে দিতেন। দাদার বিয়েতে আমি আপত্তি করেছি দেখে, আমাকে যে অত সহজে টলান যাবেনা সেটা ওরা বুঝতে পেরেছিলেন।

যোরহাটের কাছে সাওখাত মৌজাতে আমাদের যে চাকরের একটা ভাঁড়াল ছিল সে কথা বলেছি আমি আগেই। মনপুর নামে আমাদের একটা চাকর ছিল, তারও ছিল সাওখাতে বাড়ী। আমাদের বাড়ীতে চাকরি করতে করতেই তার জীবনটা কেটে গেল কিন্তু তবুও তার আর বিয়ে হলনা। বিয়ে হবে কিরকম.

করে, সে খেয়ে পরে মাইনে পায় মাত্র তিন টাকা। সে মাসে মাসে মাইনে না নিয়ে তার বিয়েতে লাগবে বলে টাকাগুলো বাবার কাছে জমা দিয়ে রাখে। মাস ছয়েকের টাকা জমলেই তার দাদা এসে জমির সরকারী খাজনা দিতে হবে বলে টাকা নিয়ে যায়। এদিকে মনপুরের বাগদত্তা কনের সংগে টাকার অভাবে আর বিয়ে হয়ে ওঠেনা। এরকম ভাবে ওর সংগে অনেক গুলো মেয়েরই বিয়ে ঠিক হয়েছিল আর টাকার অভাবে সব বিয়েগুলোই ভেঙে গেল। অদৃষ্টের এরকম পরিহাস দেখে শেষ অবধি মনপুর বিয়ে করবেনা বলেই ঠিক করে নিল। ওকে বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'আমার বিয়ের দরকার নেই।' কথাগুলো সে নাকিসুরে বলত। তার এই কথাগুলো শোনবার জন্য আমরা মাঝে মাঝেই তাকে জিজ্ঞাসা করতাম বিয়ের কথা। কিন্তু বেচারার নৈরাশ্যের কথাও অনুভব করতাম আমরা। যাহোক প্রজাপতির নির্বন্ধে মনপুরেরও বিয়ে হয়ে গেল এবং বিয়ের পরে সে তার জায়গায় তার দাদাকে বদলি দিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যায় সংসার ধর্ম পালন করতে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছেতে বেশীদিন সেই সুখ স্থায়ী হলনা। একবছর কি দুবছর বাদেই মনপুরের মৃত্যু ঘটে।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আসামে ভদ্রলোকদের বাড়ীর চাকর চাকরানীদের মুক্তি দেওয়ার ফলে অনেকেই তার সুবিধে নিয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। আর যারা বাড়ীর গৃহস্থের মায়া কাটাতে পারেনি তাদের মধ্যে একজন ছিল মথন ও তার বৌ ঘিনলাগী। ওদের ছটি মেয়ে নিয়ে একটি পরিপূর্ণ গৃহস্থ সংসার ছিল। মথনকে আমরা ছোটবেলা থেকে 'মথন মালিক' আর 'ঘিনলাগী'কে ঘিনলাগী দিদি বলে ডাকতাম। তাদের বড় মেয়ের নাম ছিল আহিনী। এই আহিনীই আমার মায়ের সংগে বিদেশে বিদেশে বেড়াত; আমাকে কোলে নিযে খাইয়ে দাইয়ে বড় করেছিল সে। আমরা শিবসাগরে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই আহিনীকে তার মা বিয়ে দিয়ে দেয়।

পরে ওর বোনেদেরও একজন একজন করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। মথনের মৃত্যু হয় আমাদের বাড়ীতেই। আর ওর বৌ ঘিনলাগীও চিরকাল আমাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে দেয় বাকী জীবনটা। ঘিনলাগী বাই শিবসাগরের বেশ নামকরা ধাত্রী হয়ে পড়েছিল। ঘিনলাগী সব ভদ্রলোকের বাড়ীতে তখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আমাদের পরিবারেও ঘিনলাগী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে

জড়িয়ে পড়েছিল এবং তাকে আমরা চাকরানী মনে না করে বাড়ীর লোক বলেই মনে করতাম। পিতৃদেব ও মাতৃদেবী ঘিনলাগীকে সংগে নিয়ে জগন্নাথধাম, মথুরা, বৃন্দাবন আদি জায়গায় তীর্থ করে এসেছিলেন।

পিতৃদেব ছেলেদের বেজবরুয়া বংশের প্রধান বিদ্যা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন বিশেষ করে আমাকে। বাঁদর যেমন মুক্তোর মালার কদর বোঝে না আমিও তেমনি তার কদর না বুঝে তাকে অবহেলা করতাম। আমার মনে হত আসল বিদ্যে হচ্ছে ইংরাজী শাস্ত্র আর চিকিৎসা বিদ্যা শিখতে হলে পাশ্চাত্য এলোপ্যাথিক ডাক্তারী বিদ্যা শিখতে হবে। দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি কোন বিদ্যাই নয়। দেশীয় আয়ুর্বেদীয় আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে চলেনা, এ যেমন অসার্থক তেমনি অনাবশ্যক। এই কথা মূর্খের মতো মনের মধ্যে পুষে রেখে আমি তার কাছেই ঘেঁষতাম না। সেজন্য আমার মনে যে অনুতাপ হয় তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমি যে কি রত্নকে হেলায় হারিয়েছি। বাবা ছিলেন রাজবাড়ীর চিকিৎসক। আসামের শেষ রাজা পুরন্দর সিংহ পিতৃদেবকে রাজসভায় রীতিমতো বৈদ্যশাস্ত্রে পরীক্ষা করে রাজবাড়ীর চিকিৎসকগণের মধ্যে স্থান দিয়ে নিয়মানুযায়ী কামাখ্যার মন্দিরে শপথ করিয়ে নিজের চিকিৎসক করেছিলেন। এই রকম মানুষের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শেখার সুযোগ পেয়েও আমি তা অবহেলা করলাম—ইংরাজী সভ্যতার ঝলমলে মোহের বশবর্তী হয়ে। পিতৃদেব তাঁর রচিত বংশাবলী গ্রন্থে লিখেছেন—

মহারাজ পুরন্দরসিংহ নৃপমণি।
ইশ্বর ইচ্ছায়ে পাইলে ইটো রাজ্যখনি ॥
পঞ্চতীর্থ মধ্যে তাক সাক্ষাত করন্তে।
তাহান প্রসন্ন দৃষ্টি মোত পরিলন্তে ॥
মোর ইষ্টদেব গুরু প্রসাদত তৈতি।
বেজর বরুয়া মোক সিটো স্থানে পাতি ॥
সংগে আনি বর সমাদরত রাখিয়া।
মান্য যশ বিভূতিক দিলে সমর্পিয়া ॥
বিশেষত মোর জেষ্ঠে মই ব্যতিরেকে।
কাহারো ঔষধ রাজা নাখায় সম্যকে ॥

তাহান কৃপাত তান দৰ্বারত রই।
ফৌজদারী চিরস্তার অধিপতি হই ॥
থাকন্তে রাজ্যর চ্যুত ভৈলেক রাজার।
কোম্পানী হস্তগত জানিবা সুসার ॥

মনে আছে পিতৃদেব এক একদিন আমাকে জোর করে ধরে এনে বৈদ্য-শাস্ত্রের 'ভাবপ্রকাশ' বই আমার সামনে মেলে ধরে তার শ্লোকগুলো পড়ে আমাকে ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। কিন্তু আমার মন যে কোথায় উড়ে বেড়াত, তা তিনি জানতেন না হয়তো। ভাবপ্রকাশের—

পঞ্চাভিভূতস্ত্বথ পঞ্চকৃত্বা
পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা···
পঞ্চত্বমায়াতি বিনাশকালে ॥

এই শ্লোকের দার্শনিক ব্যাখ্যা করে পিতৃদেব আমাকে পড়াতেন আর সেই শ্লোক ও তার ব্যাখ্যা আমার মনে পঞ্চত্ব লাভ করে তখনই বিনাশপ্রাপ্ত হত। আমার অন্যান্য বড ভাইও যে বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষার প্রতি আমার চেয়ে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিল তা বলতে পারিনে। তবুও তারা আমার মতো হতভাগা ছিল না। কিছু তারা পড়েছিল এবং কিছুটা শিখেও ছিল। তাঁদের মধ্যে ব্রজনাথ এবং দু একজন বেশ ভাল চিকিৎসক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শাস্ত্র পড়ে শাস্ত্র বিদ্যাবিশারদ ওরা হতে পেরেছিল কিনা জানিনে। ছেলেদের গতিবিধি দেখে একদিন পিতৃদেব হতাশ হয়ে বলেন—আচ্ছা তাহলে তোমরা শুধু ইংরাজী পড়েই যা হতে চাও হও, আমি তোমাদের আর বলব না কিছু। কিন্তু আমি ছেলেদের মধ্যে একজনকে আমার মনের মতো পুরানো বৈদ্যশাস্ত্র পড়িয়ে তাকে চিকিৎসক করব বলে ঠিক করেছি তাকে ইংরাজী পডতে দেব না। লক্ষ্মণকে আমি আমার মনের মতো করে শিক্ষা দেব।

লক্ষ্মণ ছিল আমার ছোট ভাই। পিতৃদেব তাকে ইংরাজী স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে এনে বৈদ্যশাস্ত্র পড়াতে লাগলেন। এই কাণ্ড কারখানা দেখে আমরা ইংরাজীওয়ালা পণ্ডিতরা মনে করলাম লক্ষ্মণের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবিকই লক্ষ্মণ দুচার বছরের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, পুরানো কাল থেকে চলে আসা আয়ুর্বেদ বিদ্যার এই ধারা

আমাদের বংশে বজায় থাকে। পিতৃদেব লক্ষ্মণকে নিয়ে বারুণী গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন কলকাতায়। তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আমি এম এ পড়তাম। পিতৃদেবের জন্য মেডিকেল কলেজের কাছে একটা আলাদা বাড়ী ভাড়া করে তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত করি সেখানে। কলিকাতা পেঁছানোর পরদিনই লক্ষ্মণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিনেই মারা গেল। সেদিন ছিল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী। পিতৃদেবের মাথায় হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু এ হেন বিপদেও তাঁর প্রশান্ত মূর্তি ও ধৈর্য দেখে সবাই আশ্চর্য হয়েছিল। তিনি শুধু একটা কথা বলেছিলেন—ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, আমাদের বংশে কোন চিকিৎসক থাকে। শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ফুকন মহাশয় তখন কলকাতাতেই ছিলেন। আমার মনে আছে, লক্ষ্মণের মৃত্যুর সময় তিনি কাছেই বসেছিলেন। এই মৃত্যুতে তিনি এত আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনি শোক সামলাতে না পেরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। আমরা চারজনে লক্ষ্মণের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে নিমতলা ঘাটে পোড়াতে নিয়ে গেলাম। পিতৃদেব কীর্তনঘোষা থেকে 'জয় হরি জয় রাম' বলতে থাকেন। আমরা ঘোষা (পদ) গেয়ে গেয়ে শ্মশানে পেঁছে যথাবিধি শবের সৎকার করি।

পিতৃদেবের একটা ঔষধালয় ছিল। সেখানে তিনি আয়ুর্বেদ ঔষধাদি প্রস্তুত করতেন। ওষুধ তৈরী করার খল, নোড়া, বড়ি পাকানো ইত্যাদি নানা কাজের জন্য তিনি বেতন দিয়ে লোক রাখতেন। রাজকুমার নামে একজন বাঙালী লোক ছিলেন। তিনি পাঁচ ছ বছর বাবার সঙ্গে থেকে কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। উনি পরে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে দেশে গিয়ে রাজকুমার শীল কবিরাজ উপাধি নিয়ে কবিরাজী করে অনেকদিন ভালোভাবেই কাটিয়েছিলেন।

বাবা যদিও তাঁর ওষুধ ব্যবসায় হিসেবে চালাতে চেয়েছিলেন, তবুও তাঁর ওষুধের চারভাগের তিন ভাগ বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোক এবং দুঃখীজনের মধ্যেই বিনামূল্যে বিতরিত হওয়ার ফলে তার ব্যবসা থেকে কিছুই লাভ হত না। অবশ্যি একেবারে লাভ হত না যে তাও নয়।

বাবা শিবসাগরে এসেই তাঁর বাড়ীর রাস্তার কাছে একখণ্ড জমিতে জনসাধারণের জন্য একটা নামঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাতে জনসভা পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। এই সমস্ত কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল অফুরন্ত।

দলাদলি ভারতের সব শক্তিকে নষ্ট করে দলিত করে দেয়। এর জন্য কোন শক্তিশালী কাজ সুসম্পন্ন হয় না। সেজন্য আজকেও ভারতবর্ষ শ শ বছর ধরে পরের গোলাম। ভারতবাসীরা পরে যে এই কথা উপলব্ধি করেন নি তা নয়। এই দলাদলিজনিত মনোবৃত্তির রেশ এই নামঘরে এসেও পৌঁছেছিল। কিছুদিন পরে এখানেও দলাদলির সূত্রপাত হতে শুরু করল। তবুও বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন নামঘরের মর্যাদা রক্ষা করে তার কার্য সুচারুরূপে চালিয়েছিলেন।

বরপেটায় তিথিরাম বায়েনের বাংলা যাত্রাগানের 'পালা' দেখে শিবসাগরের অসমীয়া লোকেদের মধ্যেও যাত্রাগান করার ধুম পড়ে গেল। ফুকন মুক্তানাথ খাজাঞ্চী জামাইবাবুর নেতৃত্বে এবং আরও দুচারজন বাঙালীর সাহায্যে রাধার মানভঞ্জনের পালার মহড়া চলতে থাকল। কতকগুলো অসমীয়া ছেলেকেও গানের জন্য নেওয়া হল এবং দু চারজন অসমীয়া আধবয়েসী ভদ্রলোক দু একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠল। অসমীয়া ছেলেরা যখন 'দেখে যা গো চন্দ্রাবলী কোঞ্জ (কুঞ্জ) দুয়ারে (দ্বারে) বনমালী' বলে কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে গানের সভায় গাইতে থাকে তখন দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়। বছর চারেকের মধ্যে এই গানের ঢেউ গিয়ে পেঁৗছল শিবসাগর যোরহাট আর গোলাঘাটে। তারপর গোলাঘাট থেকে দূরের চা বাগানের বড়মহল, ছোটমহল, হাজিরামহল, পাতমহল পেঁৗছে কাছাকাছি জায়গার নদীনালার নিকটবর্তী গ্রামের যুবকদের মধ্যে এই গান সৃষ্টি করার একটা সোরগোল পড়ে যায়। এবং পরে তা লোপ পেয়েও যায় কালক্রমে। যাত্রাগানের অনুরাগীদের গানের দু এক লাইন আমার মনে আছে এখনও, যেমন—

ওরে গা-ভী সব।
করে হাম্বা-আ-রব,
দেখ গা-ভী-ই-স-অ-ব।

(২) ঐ দেখ বকোলের (বকুলের) মূলে।
মন্দ্রোদয় (চন্দ্রোদয়) কি ভো-ও-তলে (ভূতলে)।

(৩) রাধারোমণ (রাধারমণ) হে বোল বোল (বল বল) বিবরণ।
কার কোঞ্জে (কুঞ্জে) চুখ (মুখ) ভোজে (ভুঞ্জে)
নিচি (নিশি) কৈলে জাগরণ॥

ভাদ্র মাসে শ্রীশংকরদেব, মাধবদেব ও বদুলাআতার তিথি। এই তিন তিথিকে 'ভাদর তিনি কীর্তন' বলে। আমাদের বাড়ীতে তিন দিন ব্যাপী মহাসমারোহে এই কীর্তন হত। তিথির দশবারো দিন আগে থেকেই আমাদের উৎসাহের সে কি চোট। তিথির প্রথম দিনের থেকেই শরাইতে করে নামপ্রসংগে কলা দেওয়ার জন্য আমরা চারদিকের কলাবাগান খুঁজে বেড়াতাম। আর থোকা থোকা কাঁচা কলা কেটে এনে পাকতে দেওয়ার জন্য রেখে দিতাম। ছোলামুগের শরাই থেকে শুরু করে আট দশখানা থালা কি রকম ভাবে মাস কলাই, চাল, কলা, ধান ইত্যাদি দিয়ে সাজালে উপচে পড়বে সেটাই আমাদের খুব ভাবনার বিষয় হযে পড়ত। আমাদের বাড়ীতেই তিন চার জোড়া খোল করতাল, তবুও আমরা গণকপটির থেকে আরও পাঁচ ছয় জোড়া চেয়ে এনে বাজিযে নামপ্রসংগের ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলতাম সারা সহর। তিথির দিন দিনরাত নামপ্রসংগআদি চলতে থাকে একটানা। পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন যাত্রা-ঘোষা এবং তার পরে 'চরিত্র-তোলা' সম্পন্ন হলে তিথি উৎসবের সমাপ্তি ঘটত। চরিত্র-তোলা মানে শ্রীশংকরদেবের তিথিতে শ্রীশংকরদেব, শ্রীমাধবদেব, আর বদুলা আতার তিথিতে মাধবদেব আর বদুলা আতার আবির্ভাবের থেকে তিরোভাব পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা মালিনী যেমন ফুলের মালা গেঁথে একের পর এক ফুল দিয়ে মালা সাজায় সেরকমভাবে এইসব মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্তের বিন্যাস করা হয। আমাদের বাড়ীতে তিথির সময এই 'চরিত্র-তোলা' কাজ পিতৃদেবই করতেন আর আমরা খুব ভক্তি সহকারে শুনতাম মন দিয়ে। এই দুজন গুরুর শিষ্য ছিল বারোজন। (যেমন মথুরদাস বা বুঢ়া আতা, বরবিষ্ণু আতা, ভাতৌকুছি আতা ইত্যাদি) এই শিষ্যদের তিথিও নিয়ম অনুযায়ী পালন করা হত আমাদের বাড়ীতে আর তাঁদের চরিত্র বৃত্তান্ত বলে তিথি শেষ করা হত। পুথি দেখে বা পড়ে চরিত্র বর্ণনা করার নিয়ম নেই। পুরাকালে যেমন বেদ বা শ্রুতি লেখাটা একটা অবিহিত কাজ বলে বিবেচিত হত, দুইজন মহাপুরুষের ও আতাদের চরিত্রও তেমনি না লিখিত হয়ে সাধুসন্তদের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসত। শ্রীশংকরদেব শ্রীমাধবদেব এবং অন্যান্য গুরুদের জীবন চরিত্রের নাটক আজকাল যেরকম অনুষ্ঠিত হয়, সেরকমটি হত না। বরপেটা, কমলা বারীআদি মহাপুরুষের সত্রগুলোতে এখনও এই রীতি প্রচলিত, এবং,

তিথির শেষ দিন চরিত্র বর্ণনায় দুজন মহাপুরুষ এবং গুরুদের জীবনের ঘটনা গুলো বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়ে থাকে।

আমাদের বাড়ীতে বছর বছর দোল খেলা হত। এই দোলে বা রঙ খেলায় আমাদের এত উৎসাহ ছিল যে দোলের পাঁচ ছয় ফুট উঁচু বেদীটা আমরা নিজেরাই মাটি বয়ে নিয়ে এসে তৈরী করতাম। চাকর বাকরের বা কুলি কামিনের মাটি বয়ে নিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকতাম না আর। সাধারণের জন্য যে নামঘর ছিল তাতেও ফল্গুৎসব করা হত। সিংহাসনে বসিয়ে কৃষ্ণ মূর্তিকে যেদিন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত, সেদিনই রঙ নিয়ে খেলা করা হত। কেউ বা কুংকুম আবীর দিয়ে, কেউ বা রাস্তা থেকে কাদা জলও গায়ে ছুঁড়ত। গণকপটির দোলের শোভাযাত্রা ছিল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই দলের মধ্যে চেঁচামিচি এমন কি মারামারিও হত শেষ পর্যন্ত।

আমাদের বাড়ীতে রামপুজাও হত, কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়। কোন বছর হত, কোন বছর হত না আবার। যে বছর হত সেবছর আমাদের আগ্রহে ও উৎসাহে হত। প্রথমে বাবা যাতে না দেখেন সেদিকে দৃষ্টি রেখে, ঘর বেঁধে মাটি এনে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তৈরী করে রেখে দিতাম এমন জায়গায় যাতে বাবার নজরে পড়ে। কারণ প্রতিমা প্রস্তুত দেখলেই বাবা পূজো করতে বাধ্য হবেন। এই প্রসংগে অবান্তরভাবেই একটা কথা বলে ফেলি যে, আমার এই প্রতিমা নির্মাণ করার কাজ পরে বৃদ্ধ বয়সেও অনেক কাজে লেগেছিল। সেদিন ছিল মহাযুদ্ধের শান্তিপর্বের সূচনা। আমরা ছিলাম তখন সম্বলপুরে। সেখানে উৎসব আনন্দের আয়োজন নানা রকমের। সম্বল-পুরের ডেপুটি কমিশনার ইংগোলস সাহেব কলকাতার রয়েল থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে আমার অংশ গ্রহণের কথা কয়েকজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যাতে সম্বলপুরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হলে আমি সেই অভিনয় করি। আমি নিরুপায় হয়ে তখন আমার তিন কন্যা ও গৃহিণীকে নিয়ে এবং অন্যান্য চারপাঁচজন ভদ্রলোকের সংগে সেই নাটক অভিনয় করি। সেখানে কালী প্রতিমার প্রযোজন ছিল। সম্বলপুরে সেই প্রতিমা দুর্লভ ছিল বলে আমি নিজের হাতেই মাটি দিয়ে কালী মূর্তি গড়ে সেই কাজ সুন্দরভাবে সমাধা করেছিলাম।

নিজে থেকে চেষ্টা করেই আমি ছোটবেলায় একটু আধটু চিত্রবিদ্যাতেও জ্ঞান লাভ করেছিলাম। আসামের নামঘর বা কীর্তনঘরগুলো শুধু মাটি দিয়ে লেপার নিয়ম নেই। সেখানে নানা ধরনের চিত্র আঁকা থাকে। তার ব্যাখ্যা হল এই যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হরিকীর্তন শুনবার জন্য সহস্র কান প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়েছিল। তাঁর সহস্র কান কীর্তনঘরের সহস্র ফুটো। আমার মনে হয়, নামঘরের বাইরেও যাতে লোকের কানে এই কীর্তনের ধ্বনি এসে পৌঁছায়, তার জন্যই মহাপুরুষগণ এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্রীশংকরদেব রচিত বরগীতে আছে—

বলহু রাম-নামেসে মুকুতি নিদান।
বুলিতে এক, শুনিতে শত নিতরে,
নাম-ধরম বিপরীত।

আমাদের বাড়ীর কীর্তনঘরের বেড়াতে আমি মাটি লেপে তাতে রঙ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলার গোটা চারেক ছবি এঁকেছিলাম। কীর্তনঘরের মাটি লেপতে এবং তাতে কৃষ্ণলীলা আঁকতে দেখেও পিতৃদেব আমার দোষ না ধরে বরং সেগুলো অনেকদিন ধরে রক্ষা করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর কীর্তনঘরের জীর্ণসংস্কারের সময় এই মূর্তিগুলো বিলুপ্ত হয়।

আজকালকার কথা বলতে পারিনে, সেকালে শিবসাগরে নামকীর্তনের বড় সমারোহ ছিল। সুললিত হৃদয়স্পর্শী হরিনামের জন্য গণকপটি সুবিখ্যাত ছিল। শ্রীযুক্ত হরকান্ত নাজির এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্মার নেতৃত্বে গণকপটির নামকীর্তনের দল এসে যেমন কোন জনসভায় হরিনাম গাইতে শুরু করেন তখন তার সুললিত হরিনাম ধ্বনি সবাইকে বিমুগ্ধ করে। তাঁরা বেশির ভাগই আউনীআটি এবং দক্ষিণপাটের শিষ্য। কিন্তু দুই মহাপুরুষের কীর্তনঘোষা এবং নামঘোষাই তাঁদের হরি কীর্তনের অক্ষয় ভাণ্ডার। আজকের দিনে জনকয়েক যাঁরা মহাপুরুষের রচিত নামঘোষা ও কীর্তনঘোষা বর্জন করে নিজেরাই কিছু করছেন তাদের মতো ছিলেন না এঁরা। কীর্তনঘোষার থেকে ঘোষা আর পদ যখন ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীহরকান্ত নাজির এবং গোপীনাথ শর্মা গাইতেন তখন এঁরা আমার অনেক শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে পারতেন না।

শিবসাগর জেলা থেকে পনের মাইল দূরে জরাবারী সত্র। জরাবারী

মহাপুরুষপন্থী সত্র। সেই সত্রের অধিকারী ছিলেন উদাসীন আর তরুণ কর্মসচিব বৈষয়িক। তিনি আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। আমাদের স্নেহভাজন কবি শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ দুয়রার পিতৃদেব শ্রীশ্যামসুন্দর দুয়রার বাড়ী ছিল তাঁর কুটুম্ব বাড়ী এবং আমাদের নিকটেই। তবুও জরাবারীর এই যুবক গোঁসাইটি দুয়রা মহাশয়ের বাড়ীতে না থেকে আমাদের বাড়ীতে থাকতেই ভালবাসতেন। তিনি যেদিন জাঁজী থেকে মহাজনের ঘোড়া একটাতে উঠে সন্ধ্যেবেলা খটাখট করে আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হতেন তখন আমাদের সে কি আনন্দ। রাত্রিবেলা তাঁর কাছে বসে অনেক গল্প শুনতাম আমরা। আমার 'সাধুকথার কুকি' বইতে 'ঘরপতা ককা' ও 'মুলা খোয়া বুঢ়া' যে গল্পদুটি আছে সেগুলো তাঁর কাছ থেকেই শোনা। তাঁর বড় ছেলে শ্রীনিত্যানন্দ ডেকা গোঁসাই (যিনি আজকাল জরাবারী সত্রের অধিকারী) আমাদের পুকুরপারের বাড়ীতে থেকে, বাবার কাছে সংস্কৃত লেখাপড়া শিখতেন। নিত্যানন্দ ডেকা গোঁসাই ছিলেন আমার বিশেষ প্রিয় বন্ধু। অনেকদিন তাঁর সংগে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই, তবুও আমার স্মৃতির নিভৃত কোণে তিনি বিরাজ করছেন সর্বদাই।

পিতৃদেবের সবসময়ই একটা ইচ্ছে ছিল—যে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর শিবসাগরে থেকে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করে কাটিয়ে দেবেন জীবনের বাকী কালটুকু। শিবসাগরে এসে তাঁর সেই ইচ্ছা কাজে পরিণত হল। প্রথম দিকটায় তিনি বিকেল চারটে থেকে অন্য সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে, বৈঠকখানা ঘরে বসতেন, অসমীয়া রামায়ণ, মহাভারতআদি পুরাণ পুথি অন্য লোকে পড়ে তাঁকে শোনাত। আমি ও আমার দাদা শ্রীনাথ শ্রোতা ছিলাম। এর পরে পিতৃদেব নিজে সংস্কৃত দ্বাদশস্কন্দ ভাগবত পাঠ আর ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে আমরাও স্কুলের থেকে এসে একান্ত মনে সেই ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনতাম আনন্দের সংগে। বৈঠকখানা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে ঝাড়ু দিয়ে মুছে একটা কাঠের টুলের উপর শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র রাখা হত আর পিতৃদেব তার সামনে বসে পড়ে ব্যাখ্যা করতেন। আমি পারতপক্ষে কখনও সেই শাস্ত্র বাক্য না শুনে থাকতাম না। শ্রোতাদের মধ্যে একজন খুব মজার বুড়ো বামুন ছিলেন। তার নাম বটু বাপু। বটু বাপুর বাড়ী অর্জুন-গুরিতে। অর্জুনগুরি আমাদের বাড়ী থেকে তিন চার মাইল দূরে। কি রোদ,

কি বৃষ্টি, কি ঝড়বাতাস কি অন্য কোন দুর্যোগই বটু বাপুকে ভাগবত শুনতে আসায় বাধা দিতে পারত না। তিনি রোজ পায়ে হেঁটে এসে ঠিক সময়ে উপস্থিত হতেন আর রাত্রে অন্ধকারই হোক বা জ্যোৎস্নার আলোই থাকুক, হাতে লাঠি নিয়ে ঠুক ঠুক করে ঠিকই বাড়ী পেঁৗছে যেতেন। শ্রীনাথ দাদার কাছ থেকে দুচারটে ইংরেজী কথা মুখস্থ করে শিখেছিলেন, যেমন—well, my dear Sir, how do you do ? quite well. তাঁর মুখ থেকে এই কথা গুলো এরকম শোনাত—ওয়াল, মাইডিয়ের সার, হাডুইও ডু ? কোটোয়াল। পথে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি উত্তর দিতেন—"দীননাথ বেজবরুয়াকা হাউস, হিন্দু বাইবেলে হিয়ের আই গো।' এই কটা কথা বাদে আর কোন ইংরেজী তিনি জানতেন না। তিনি এসেই আমাদের বাড়ীতে এক বাটি চা খেতেন। তাঁকে দেখলেই আমরা দৌড়ে গিয়ে পাথরের বাটিতে একবাটি চা এনে ঠাকুরঘরের কাছেই তাঁকে খেতে দিতাম। আমাদের বাড়ীতে সারা বছর ধরে এরকমভাবে চা খাওয়া চলত। তাঁকে চা খাইয়ে আমরাও আনন্দ পেতাম আর তিনিও চা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে ভাগবত শুনে আনন্দ লাভ করতেন।

বারোজন মহাপুরুষের বড় সত্র কাথপার এবং চুপহা ও ছোট বারোজন মহাপুরুষের জলতরি সত্র শিবসাগর সহর থেকে কিছু দূরে। এই সত্রগুলোর গুরুগণ সর্বদাই আমাদের বাড়ীতে এসে পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনিও তাঁদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করতেন। প্রত্যেক বছর জলতরি সত্রের তিথিতে আমরা পিতৃদেবের সঙ্গে যেতাম যাত্রা দেখতে। সত্রের অধিকারী আমাদের হাতী পাঠিয়ে দিতেন নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করে তাঁদের অভিনয় দেখাতেন। যাত্রাতে জলতরির গুরুমশায় তিনটে খোল একই সময় খুব সুন্দর করে বাজাতেন—সেকথা আমার মনে আছে। জলতরি সত্রের একজন ম্যানেজার ছিলেন, তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন প্রায়ই। সেই নিষ্ঠাবান ভক্ত ম্যানেজারমশায়কে আমরা বড়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে একজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বাঙালী ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আসামের জেলাতে জেলাতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। তাঁর যেমন মোটা ভুঁড়ি ছিল তেমন ছিল লম্বা দাড়ি। সত্যি তাঁর দাড়ি এত লম্বা ছিল যে এক হাজারের মধ্যে নয়শো নিরানব্বইটা লোকের মুখে অত লম্বা দাড়ি খুঁজে পাওয়া যেতনা কখনও। ধুবড়ী কী গোয়ালপাড়া, ঠিক আমার মনে নেই একজন হিন্দু যখন তাঁর হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা শোনেন, তখন বিদ্যারত্নের সুদীর্ঘ শশ্রুকে লক্ষ্য করে তাঁর মতো সুর করেই বলেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে— 'লম্বা লম্বা দাড়ি লইয়া যাঁহারা বক্তৃতা করিতে আসেন, তাঁহাদের বুকে পদাঘাত, মাথায় পদাঘাত।' শিবসাগরের ইংরাজী স্কুলঘরে বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মধর্মের বিষয়ে বাংলা ভাষায় এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতার পরে শিবসাগরের যুবসম্প্রদায় এবং স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এক উদ্বেগের সৃষ্টি হল। অবস্থা অনুকূল নয় দেখে হিন্দু অভিভাবকগণ পিতৃদেবের নেতৃত্বে রামকুমার বাবুর বিপক্ষে দাঁড়ালেন। আমাদের হেডমাস্টার ৺চন্দ্রমোহন গোস্বামী 'ফিলসফার' লোক। তিনি কোন ধর্মকেই আমল দিতেন না। তাঁর ধর্ম ছিল জ্ঞানোপার্জন। তিনি দুই দলের মধ্যে রেষারিষি লাগিয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে মজা দেখতে চেয়েছিলেন। পিতৃদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি শ্রীযুত তুলসীরাম বরুয়া পণ্ডিতকে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য ঠিক করলেন। তুলসীরাম বরুয়া শিবসাগরের নর্মাল স্কুলের হেডপণ্ডিত এবং হিন্দুধর্মশাস্ত্রবিদ। সংস্কৃতেও তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। অসমীয়া 'হেমকোষ' এবং অসমীয়া ব্যাকরণ রচয়িতা সুবিখ্যাত ৺হেমচন্দ্র বরুয়ার তিনি ভাই। হিন্দুর প্রাচীন ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানাদিতে তিনি অত্যন্ত অনুরাগী। ব্রাহ্মণের জাত্যভিমানের ষোল আনা দাবী ছিল তাঁর। বাঙালী রামকুমার পণ্ডিতের বক্তৃতার দিন সাতেক পর সেই ইংরাজী স্কুলঘরে তুলসীরাম পণ্ডিতকে হিন্দুধর্মের সপক্ষে বলতে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য যে, রামকুমার বাবু সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন এবং তুলসী পণ্ডিতের রচনা পাঠ শেষ হতেই নিমেষের মধ্যে উত্তর দেবার জন্য উঠে

দাঁড়ালেন। তাঁর বক্তৃতার চীৎকারে কানে তালা ধরে গেল শ্রোতাদের। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন পণ্ডিত বরুয়ার যুক্তি কতদূর খণ্ডন করেছিলেন আমার মনে নেই—কিন্তু বেশ মনে আছে আমার—তাঁর সেই তীব্র চীৎকার ও হাতপা ছোঁড়াছুড়ি। কিরকম করে এই বাঙালী বক্তাটি হাত পা নেড়ে চীৎকার করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কথা বলেন সেই দিকে আমার খুব লক্ষ্য ছিল, কারণ আমার খুব ইচ্ছা হত আমিও যাতে ঐরকম ভাবে বক্তৃতা দিতে পারি। বাস্তবিকই এরপরে আমার ইচ্ছা পূরণ কবার জন্য অনেকদিন পর্যন্ত আমি রাস্তায় ঘাটে, বনে-জংগলে, এমনকি বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ঐ রকম গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে একটা শব্দের প্রতিশব্দ খুঁজে, একটা বাক্যকে ফেনিযে ফেনিয়ে বক্তৃতা করার অভ্যাস করতাম। অবশ্যি বড়রা যাতে আমার এই বক্তৃতা না শুনতে পান সেদিকে দৃষ্টি সজাগ রেখে, দুচারজন আমারই মতো ক্ষমাপ্রার্থী চ্যাংড়া বন্ধুদের নিযে সভা করতাম। তাছাড়া গাছপালা লতাপাতা ছিল আমার এই সভার নীরব শ্রোতা।

কিছুদিন পরেই শিবসাগরে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে অসমীয়া হিন্দুদের বিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠল। এবং তাঁরা সংঘবদ্ধ হলেন। আমাদের স্কুলের থার্ড মাস্টার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হলেও তিনি একজন ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্ঠপোষক হযে উঠলেন। রবিবারে তাঁর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হতে শুরু করল। এই ব্রাহ্মসমাজের সভায় কোনো হিন্দু অসমীয়া গেলে তিনি হিন্দু সমাজের দ্বারা শাস্তি পেতেন। পিতৃদেব এই বিষয়ে খুবই সজাগ ছিলেন আর কেউ এই সভায় গেলে তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়তেন না। এইজন্য যাঁদের তিনি শাস্তি দিতেন তাঁদের স্বভাবতই পিতৃদেবের বিরুদ্ধে একটি আক্রোশ জমতে সুরু করে ও তারা কি উপায়ে পিতৃদেবকে জব্দ করতে পারে এই ব্যাপার নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। আগেই বলেছি আমার শ্রীনাথদাদা বড় সরল প্রকৃতির ছেলে আর গোপাল বাবুর বাড়ী ছিল বড় রাস্তার উপরে। একদিন গোপালবাবুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের সভা চলতে থাকাকালীন শ্রীনাথ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হয়তো কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে দাঁড়িয়ে সেই বক্তৃতা শুনছিল। এই কথাটা পিতৃদেবের কানে সেই শাস্তিভোগকারীরা রটিয়ে দিতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন নিজেকে। তক্ষুনি শ্রীনাথকে ডেকে এনে তাকে বেত দিয়ে চাবকান। দাদা যতই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য

নিজের নির্দোষিতার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু সেগুলো আর বলা হয়ে ওঠে না, বেচারা বিনা দোষেই প্রহার খায়।

বছর কয়েক পরে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি গোপালবাবুর নিষ্ঠা উবে গেল। তিনি ব্রাহ্মের বেশ পালটে আবার হিন্দু সমাজে প্রবেশ করলেন। ওদিকে কলকাতায় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নরও অবস্থা তথৈবচ! তিনি রামানন্দ স্বামী বা অন্য কোন একটা আনন্দ লাগিয়ে স্বামী নাম নিয়ে হিন্দু 'গুরু মহারাজ' হয়ে বহু-দেশে শিষ্য শিষ্যা পরিবেষ্টিত হয়ে বেশ সুখেই দিন কাটাতে থাকেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন 'উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ' নামে এক সুন্দর বই বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন।

আসামের সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত মানিকচন্দ্র বরুয়া ও সুবিখ্যাত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের পুত্র অন্নদারাম ঢেকিয়াল ফুকন 'বরুয়া ফুকন ব্রাদার্স' নাম দিয়ে এক সওদাগরী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়া (পরে বিখ্যাত সদাগর বি বরুয়া) সেই ব্যবসায়ের কাজের বিজনেস বিভাগের ম্যানেজার ছিলেন। বরুয়া ফুকন ব্রাদার্সের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই চলছিল। তাঁদের একটি ছোট জাহাজও ছিল। ইউরোপীয় ধরনে ব্যবসা বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক বলতে গেলে বরুয়া ফুকন ব্রাদার্সই ছিল। দুঃখের বিষয় অন্নদারাম ঢেকিয়াল ফুকনের অকালেই মৃত্যু ঘটে। মানিকচন্দ্র বরুয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফটিকচন্দ্র বরুয়া গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁরও মৃত্যু হয় অকালে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তা বলা যায়না। সত্যি কথা বলতে কি ফটিক বরুয়ার মৃত্যুর পর থেকেই মানিক বরুয়ার ব্যবসায়ের অবনতি ঘটতে থাকে।

বরুয়া ফুকন ব্রাদার্সের পৃষ্ঠপোষকতায় সুপণ্ডিত হেমচন্দ্র বরুয়া গৌহাটী থেকে 'আসাম নিউজ' নাম দিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হেমচন্দ্র বরুয়ার তদারকিতে 'আসাম নিউজ' খুব তাড়াতাড়ি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। আসামের সকলে খুব আগ্রহের সঙ্গেই এই পত্রিকা নিত ও পড়ত। এর আগের থেকেই আউনীআটি সত্র থেকে বেরুত 'আসাম-বিলাসিনী' নামে একটি কাগজ। আউনীআটি সত্রের অধিকার অশেষ গুণ সম্পন্ন প্রগাঢ় পণ্ডিত দণ্ডেদেও পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত আসাম বিলাসিনী একটি সুকীর্তি স্থাপন করে গেছে। কিন্তু আসাম-বিলাসিনীর বাক্য বিন্যাস, বিষয়ের গুরুত্ব

ইত্যাদি তখনকার দিনের শিক্ষিত যুবকদের মন জয় করেছিল বলা যায় না। সেই পত্রিকায় ব্যক্তিগত আক্রমণ হওয়ার দরুণ প্রবীণেরাও যে খুব পছন্দ করতেন তা নয়। সেজন্যই 'আসাম নিউজে' এই সকল কোন রকমের দোষ না থাকায় তখনকার দিনের সকলের কাছেই সমাদর লাভ করেছিল এই পত্রিকাটি।

'আসাম নিউজ'খানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াটাই আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল। কাগজখানা কখন আসবে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম আমি এবং কাগজখানা এলেই সবার সামনেই আমি তা খুলে পড়তে শুরু করতাম বললে ঠিক হবে না, আমি যেন সংবাদপত্রটিকে গিলে খেতাম বলা যায়। আসাম নিউজ পড়েই আমি অসমীয়া ভাষায় রচনা লিখতে শুরু করি। আসাম নিউজ কাগজখানা অসমীয়া ভাষায় যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। হেমচন্দ্র বরুয়ার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাগজখানা দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। আজ পর্যন্ত আসাম নিউজের মতো পত্রিকা একখানাও আসামে প্রকাশিত হয় নি।

রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর ছিলেন আসামের গৌরব। তাঁর সরকারী কাজের শেষের দিকে তিনি 'আসাম-বন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। 'আসাম-বন্ধু'ও ছিল অসমীয়া মাসিক পত্রিকাগুলোর পথপ্রদর্শক এবং তাতে প্রকৃতভাবে অসমীয়া ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছিল। বিদগ্ধ ৺লম্বোদর বরার রচনা 'সদানন্দের কালাঘুমটি', শ্রদ্ধাস্পদ সত্যনাথ বরার সুন্দর কবিতা, এবং ইতিহাসবিজ্ঞ রায় বাহাদুর সম্পাদক মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের দ্বারা এই পত্রিকাখানি অলংকৃত এবং এই কারণেই আমার মনকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল এই পত্রিকাটি। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাখানিও বেশীদিন টেঁকেনি। 'আসাম নিউজ' ও 'আসাম-বন্ধু'ই অসমীয়া গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যের ঢঙ আধুনিক ছাঁচে গড়ে তোলে। পিতৃদেব এই দুটো পত্রিকাই খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়তেন। 'আসাম-বন্ধুতে প্রকাশিত কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে খুঁত পেয়ে পিতৃদেবকে আমি গুনাভিরাম বরুয়াকে চিঠি পত্র লিখতেও দেখেছিলাম। মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, অসমীয়া ভাষার গদ্য রচনা যে সরল, সহজ অথচ রসঘন হয়ে সবাইকে তৃপ্ত করতে পারে, তা একমাত্র আসাম নিউজ ও আসাম-বন্ধুই দেখিয়ে দিল।

শিবসাগরে পড়ার সময় আমাকে কেউ পড়াশুনায় ভালো বা মেধাবী বলত না। স্কুলের পাঠ্যের বাইরে অন্য অন্য বিষয়ে আমার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেত কি

না বলতে পারিনে। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এর বিচারক, কিন্তু এতে আমি দশজনের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, সেকথা বলতে পারি। আমি যে পড়াশুনায় তেমন ভাল ছিলাম না, স্কুলবাড়ীর ছাদে, দেওয়ালে আর সর্বত্রই তা গাঁথা হয়ে আছে। স্কুলবাড়ীটা আজও টিঁকে আছে এবং এরাই তার সাক্ষী। স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কারের অধিবেশনের সংগে আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা। মাত্র একবার কিরকম করে বলতে পারিনে, কিভাবে আমি যেন ক্লাসে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বসলাম। পুরস্কার বিতরণের দিন পুরস্কারটি আমার হাতে দেওয়ায় আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলাম। ভাবলাম দেবতার পরিহাসেই এরকম ঘটে! তৃতীয় স্থান অধিকার করার জন্য অনেক উপযুক্ত ছেলে আছে যখন, তখন আমাকে এরকমভাবে ঠেলে হেঁচড়ে পাঠাবার মানেটা কি? মানেটা নিশ্চয়ই মজা দেখা। মাথা তুলে মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে একবার বললাম—স্যার আপনাদের কারুর ভুলভ্রান্তির জন্য এইরকম হয়নি তো, মাস্টারমশায় হেসে উত্তর দেন—না, কারুরই ভুল হয় নি। এইবার থেকে তুমি ভালোভাবে পড়বে বুঝেছ।

স্কুলের বাইরে আমার বুদ্ধিটা যে খুলত এবং ভিতরে যে গুটিয়ে পাকিয়ে যেত এর অবশ্যি যে কোন কারণ নেই তা নয়। কারণ ছিল অনেক। ছোটবেলা থেকে আমি খোলা আকাশ ও বাতাসের নীচে থাকতে ভাল বাসতাম। চার দেওয়ালের বন্ধ ঘরে ভেজানো দরজায় আমি বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতাম। নিরুপায় হয়ে যখন স্কুলে বসে থাকতাম, তখন কে যেন আমায় জিজ্ঞাসা করত ফিস্‌ফিস্ করে—বাতাস তোমাকে ডাকছে, খেলতে এস, এস, বেরিয়ে আসছনা কেন? রোদ ডাকছে চেঁচিয়ে—আসছনা কেন? দেখছ না রাস্তার পাশের গাছগুলো কেমন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমায়? তুমি এখানে বসে আছ কেন চুপচাপ? দেখ তো, তোমার বন্ধু দিঘী কেমন বয়ে যাচ্ছে ধুবড়ীর দিকে? তোমার তো কোন হুঁসপর্বই নেই? বড়পুকুর তোমার জন্য বসে আছে কোল পেতে। বলি, দেরী করছ কেন?—মাস্টারের কর্কশ আওয়াজ তখন আমার কানে এসে পৌঁছল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমায়—Spell Valetudinarian? What is the masculine gender of heifer? Where is Podopo pol? Define Gulf-stream.' তখন আমার দুই নৌকাতে দুই পা, কি করি?

এর বাইরেও আর একটা বড় কারণ আছে, যার বিবরণ নীচে দিলাম। স্কুলের পাঠচর্চার চেয়েও আমাদের বাড়ীর ছেলেদের, বিশেষ করে আমার দাদা শ্রীনাথের কর্মচর্চায় অত্যন্ত বেশী সময় ব্যয় হত। নীচে উদ্ধৃত করা আমাদের দৈনিক কাজের তালিকা দেখলেই এই কথা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

১. সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিত্য কাজ শেষ করে শুচি শুদ্ধ হয়ে ফুলবাগানে যেতাম ফুল তুলতে। এক একদিন আমরা ফুলবাগানের সব ফুল তুলে শেষ করে তারপর আবার উৎসাহের চোটে পাড়া পড়শীর ফুলবাগানে ঢুকে ফুল তুলে শেষ করে দিয়ে চুপড়ী ভরে এনে বাহবা পেতাম। ফুল তোলা হলে, হাত পা ধুয়ে স্কুলের বই নিয়ে বসতাম পড়তে। তখন আমার মাথায় ত্রিভুবন ঘুরত বন্‌বন্‌ করে। বইয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল তেল আর জলের সম্বন্ধের মতোই।

২. নটা বাজলেই বই তুলে রেখে, সরষের তেল গায়ে মেখে পুকুরে যেতাম স্নান করতে। পুকুরে গিয়ে জলে একটু সাঁতার টাতার কেটে ঠাকুর ঘর মুছতে যেতাম। হরি মন্দির পরিষ্কার করা পুণ্য কাজ। ঠাকুরঘরে অব্রাহ্মণ চাকরকে দিয়ে ঘর মোছান হয় না।

৩. মন্দিরে ঝাড়া মোছা শেষ করে, বাবার পুজোর বাসন কোষাকুষি থালা চন্দনের বাটি ইত্যাদি ধুয়ে পুজোর জায়গায় সাজিয়ে রাখি, চন্দন পিষে চন্দনের বাটিতে রেখে দি।

৪. এর পরে ঠাকুরঘরে বসে সকালের নাম প্রসঙ্গ গেয়ে তারপর তাল দিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ করি। ঘোষা নাম শেষ হলে একজন কীর্তনের বই খুলে বসে কীর্তন গাইতে থাকে। শ্রীনাথ দাদা তাল দিয়ে দিয়ে নাম শেষ করলে আমি কীর্তনের পদ গাই, আমার নাম গাওয়া শেষ হলে তিনি কীর্তন আরম্ভ করেন। এক একদিন আমার অন্যান্য দাদারাও এইরকমভাবে গান করেন পালা করে। দুটো কীর্তন পদের শেষে প্রসঙ্গ শেষ করে ফেলা হয়। প্রসঙ্গের শেষে যে কীর্তন ঘোষা করে সে রত্নাবলীর পুথি থেকে সুর করে পাঠ করে, আবার কিছুক্ষণ থেমে দুজন মহাপুরুষের বদুলা আতা বা গুরুর চরিত্র থেকে কোন ঘটনা সংক্ষেপে বলে থাকেন। একে চরিত্র তোলা বলা হয়। তারপরে প্রসঙ্গ শেষ করে পুজোর বেদীতে প্রণাম করি। প্রণামান্তে কেউ একজন অনেক বড় মন্ত্র বলে আমাদের আশীর্বাদ করেন। কোন কোন

দিন আবার প্রসঙ্গের পর বাবা পুজো শেষ করে নিজেই কীর্তন পদ গাইতে বসতেন।

৫. পুজো শেষ হলে নামপ্রসঙ্গ এবং আশীর্বাদ হয়ে যাওয়ার পর কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বাদ্য বাজানো হত। তারপর আমরা তাড়াতাড়ি করে গরম গরম ভাত এক গ্রাস মুখে দিয়ে কাপড় জামা পরে স্কুলে চলে যেতাম।

৬. বিকেল চারটের সময় স্কুল থেকে ফিরে, স্কুলের ময়লা জামা কাপড় খুলে রেখে পুকুরে ডুব দিয়ে আসতাম শুচি হয়ে আসার জন্য। আমরা স্কুল থেকে ফেরার আগেই বাবা বিকেলের প্রসঙ্গ করতেন। রবিবার দিন অথবা যেদিন স্কুল থাকত না সেদিন আমরাই এই প্রসঙ্গ শেষ করতাম।

৭. বিকেলের জলপান শেষ করে আমরা টোলের ভিতরেই একটু ঘোরাঘুরি করতাম। পাঁচটার আগেই বাবা পুরাণ পাঠ বা ভাগবত পাঠ নিয়ে বসতেন, সেখানে আমাদের ডাক পড়ত। আমরা বৈঠকখানা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে নিয়ে বসতাম। পুথি এনে সরাইয়ের উপর রেখে দিয়ে শুনতে বসতাম আমরা। এই 'আমরা' হচ্ছি আমি আর শ্রীনাথ দাদা এবং বাইরের দুএকজন শ্রোতা এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. সন্ধ্যা হতে না হতেই পুরাণ বা ভাগবত পাঠ বন্ধ হয় আর আমরা হাত পা ধুয়ে এসে ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ঢোল বাজাতে থাকি। তাতে বাবাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। শঙ্খ ঘণ্টা বাজানো শেষ হলে স্তোত্র পাঠ করে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করি। তারপর বাবা একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোন আর আমরা

৯. 'গুণমালা ভটিমা' গাইতে বসি। গুণমালা ভটিমা গাওয়ার পরে আমরা ছেলেরা 'লরানাম' অর্থাৎ শিশুগীত গাই। ঘণ্টাখানেক বাদে সেই নাম শেষ করে এসে

১০. বই খুলে পড়তে বসি। বই সামনে রেখে কেউ বা পড়ে একটু আধটু, কেউবা ঢুলতে থাকে কেউবা বইয়ের উপর তেলামাথা দিয়ে একেবারে শুয়েই পড়ত।

১১. রাত দশটার সময় আমাদের স্নান করার জন্য রান্না ঘর থেকে হুকুম আসে। আমরা অতি কষ্টে ঘুম আর কুঁড়েমিকে কাটিয়ে উঠে শীত হোক বা গরমই হোক জল ঠাণ্ডা থাকুক বা গরমই থাকুক হুড় হুড় করে গায়ে জল

ঢেলে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গা মুছে ঠাকুরঘরে গিয়ে 'রাত্রের প্রসঙ্গ' গাইতে থাকি। সকালের মতোই বাবা বা অন্য কেউ একজন কীর্তনপদ গাইতে থাকেন এবং পাঠ শেষ করে 'চরিত্র তোলা' শেষ করে প্রসঙ্গ শেষ করেন।

১২. এর পরে রাত্রের ভাত খাবার জন্য মেঝেতে গিয়ে বসি। এত লোক খাবার জন্য বসে যে মেঝেটা প্রায় ভরেই যেত।

১৩. ভাত খেয়ে উঠে আমরা ছোট বড় সবাই মিলে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসি শেষ নাম গাইবার জন্য। সেই নাম শেষ করতে রাত এগারটা বারটা হত। এইখানে বলে রাখা ভালো যে যদিও বসার ঘরে একটা বড় ঘড়ি টিক্ টিক্ করে চলত, কিন্তু তাকে শুধু দম দিয়েই রেখে দিতাম। আমাদের খাওয়া বা শোয়ার সময় তার কথানুযায়ী চলত না। সে বললেই বা শুনত কে?

১৪. এর পরে বা একটু হেঁটে এসে বাবা ঘোষা গাইতে গাইতে বড় বাড়ীর খোলা ঘর একটাতে এসে শুয়ে পড়তেন। শীতকাল হলে বাবার তক্তা-পোষের কাছেই আফিঙ জড়ো করার একটা জায়গাতে আগুন আঁচ রেখে তার আশে পাশে সবাই মিলে বসে আগুন পোয়াতাম। সেই সময় বাবার পায়ে একজন চাকর এসে বেশ করে তেল মালিশ করে দিত আর অনেকক্ষণ ধরে পা টিপত। আর আমি বা শ্রীনাথ দাদা কেউ না কেউ মহাভারত বা রামায়ণ নিয়ে বাবাকে পড়ে শোনাতাম। আমি বই পড়লে বাবা শুনতে ভালবাসতেন বলে, সেই ভারটা আমার উপরই পড়েছিল। আমার পাঠ শুনতে শুনতে ওঁর ঘুম এসে যেত এবং সেই ঘুম যখন গভীর হয়ে আসত তখন আমরা উঠে চলে আসতাম শোবার জন্য। এক একদিন এরকমভাবে উঠে আসতে চাইলে বাবা, 'তারপর' বলে যখন কথা বলতেন তখন আবার আর এক অধ্যায় পড়তে হত। আশ্চর্যের কথা যে নামপ্রসঙ্গের এত পুজো আচ্চা করেও আমাদের আশা মিটত না। এছাড়াও আমরা ছেলেরা পুকুর পাড়ের ফুল বাগানে একটা ছোট্ট ঠাকুরঘর তৈরী করে নিয়েছিলাম। এবং সেখানে বড় ঠাকুরঘরে যেরকম পুজো আচ্চা নামপ্রসঙ্গ হত, এখানেও সেই একই রকমে হত সব কিছু। রবিবার বা-অন্য কোন পর্ব উপলক্ষে ছুটির দিনে আমি সময় পেলেই অসমীয়া পুথি নকল করতাম। শক্ত তুলোট পাতা কেটে পুথির পাতা করতাম, তারপর তাকে রঙে চুবিয়ে বাঁশের ডগা দিয়ে সমান করে সারি সারি লাইন কেটে নিতাম। গোমূত্র হরিতকী আর ছাই দিয়ে কালি তৈরী করে নিয়ে তাতে লিখতাম।

শ্রীশ্রীশংকরদেব রচিত একাদশ স্কন্দ এবং দ্বাদশ স্কন্দ ভাগবত পুরাণ দুখানা আমি সম্পূর্ণটাই লিখে ফেলেছিলাম এবং নিজের হাতে দুটো কাঠের বাক্স তৈরী করে তাতে ভরে রেখেছিলাম। সেই পুঁথি দুখানা সম্ভবত এখনও আমাদের শিবসাগরের বাড়ীতে আছে। এরকম অবস্থার মধ্যে কাটিয়েও যে আমি কোনরকমে এন্ট্রান্স ক্লাস অবধি পেঁীছেছিলাম সেটাই আশ্চর্যের কথা।

তখন কে যেন বলে বেড়াত যে ছাত্রেরা এন্ট্রান্স ক্লাসে বছর দুয়েক থাকার পর তবেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার যোগ্য হয়। এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে সেই কালে প্রায় ছাত্ররা এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠেই পড়াশুনার হাল ছেড়ে দিয়ে খেলা ধুলায় মেতে উঠত। সত্যি কথা বলতে কি, এইজন্যই শুধু একবছরে ছাত্ররা উত্তীর্ণ হত না। আমি তো একেই পড়ি না, তারপর যখন দেখলাম একবছরে পরীক্ষা দেওয়া যায় না, তখন আর আমায় পায় কে? পড়াশুনো ডকে তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলাম। ফলে সম্পূর্ণ একটা বছর আমার নষ্ট হয়ে গেল।

দ্বিতীয় বছর পড়াশুনা আরম্ভ করলাম আমি। পণ্ডিত হবার বাসনায় সংস্কৃত নিলাম সেকেণ্ড লেংগুয়েজ হিসেবে। আমাকে যিনি সংস্কৃত পড়াতেন তিনি যে পণ্ডিত ছিলেন এমন নয়। আমার বিদ্যার দৌড় দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন আর আমিও মনে করলাম যে আমি খুব সংস্কৃত শিখলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বলব অন্যান্য বিষয়ে যদিও বা ডিঙিয়ে গড়িয়ে পাশ করলাম, সংস্কৃততে একেবারে ফেল। অথচ আমি নিজে ভেবে ছিলাম যে সংস্কৃততে আমি একজন মহামহোপাধ্যায় হয়ে পড়েছি।

এইবার আমার দুচারজন সংগী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় পড়তে গেল আর আমি থাকলাম পড়ে। মনে এমন ধিক্কার জন্মাল যে কি বলব? তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম যে সামনের বছর আমি ভালো করে মন দিয়ে পড়ে পাশ করবই। নানারকম বাধা বিঘ্ন আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, সেজন্য আমি জনসাধারণের জন্য যে নামঘর আছে, সেখানে পড়বার জন্য মন স্থির করলাম। এই নামঘরের কথা আমি আগেই বলেছি। বারোয়ারী পুজোর সময় নামঘরটা ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করা হয়। বাকী সময় এমনি খালি হয়ে পড়ে থাকে। তাতে এক শূন্যতা ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। গরু ঘোড়াও কখন এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে এখানে। আমি নিজেই সেই নামঘরের একটা কোণের আবর্জনা গোবর ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিয়ে কলাগাছের পাটি

পেতে বসে পড়তে আরম্ভ করলাম। সকাল বেলাই কাকের 'কা' 'কা' ডাকে আমি উঠে অন্যান্য সকল কাজ ফেলে রেখে নামঘরে পড়তে যেতাম। ঘরে আমার কেউ টিকিটি দেখতে পায়না এবং স্কুলে যাবার সময় তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে, নমো নমো করে পুজো সেরে কোনরকমে ভাত একগাল মুখে গুঁজে স্কুলে যেতাম।

শংকর মেথরের গাড়ীর কথা আগেই বলেছি আমি। সে রাতারাতি যেমন বড় লোক হয়েছিল তেমন আবার ফকিরও হয়ে গেল রাতারাতি। দৈবদুর্বিপাকে তার গাড়ী ঘোড়া সব খোয়া গেল আর ওর স্ত্রীও ছেড়ে চলে গেল ওকে। মনের দুঃখে শংকর আধপাগল হয়ে ফকির হল। ওর সম্বল হল একটা ছেঁড়া কম্বল ও একটা বড় ছিলিম। সে এক একদিন এসে নামঘরের কাছে রাস্তার ধারে ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকত। আমাকে ঐরকম নামঘরে বসে থাকতে দেখে ও মনে করত আমি নামঘরের কোন 'দেবতা'। একদিন সে সোজা নামঘরে চলে এসে আমার সামনে সাষ্টাংগে প্রণিপাত হয়ে আমাকে স্তুতি করতে থাকে। আমি অবাক। ওর ঐরকম ব্যবহার দেখে ওকে জিজ্ঞাসা করলে ও যা বলে তা শুনে আমার পেটের নাড়ী ভুড়ি ছিঁড়ে যাওযার উপক্রম। কিন্তু সে তার বিশ্বাসে অটল। তার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করেও আমি অকৃতকার্য হলাম। আস্তে আস্তে সে সবার সামনে প্রকাশ করে দিল এই নামঘরে দেবতা দেখার কথাটা। ফলে আমার পড়াশুনোর গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। মাতৃদেবী আমায় একদিন শংকরের সেই কথা হেসে হেসে বলেন, ভাল হয়েছে, তুমি নামঘরে মন দিয়ে পড় গিয়ে, যাও, কাউকে তোমায় বিরক্ত করতে দেবনা। সেবছরই (১৮৮৬) শংকর মেথরের দেবতা দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে গেল। আমার সংগে আমার সহপাঠী ডিম্বেশ্বর বরুয়ার পুত্র চন্দ্রশেখর বরুয়া, হেডমাস্টার চন্দ্রমোহন গোস্বামীর পুত্র শুভ্রেন্দুমোহন গোস্বামীও দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে। সেইকালে আজকালকার মতো প্রথম বিভাগে বেশী, দ্বিতীয় বিভাগে মাঝামাঝি এবং তৃতীয় বিভাগে তার চেয়ে কম ছেলে পাস করতে দেখা যেত না। তখন এর উল্টোটাই হতে দেখা যেত এবং সেটাই প্রচলিত রীতি ছিল।

এর পরে আমাকে কলকাতায় পড়তে পাঠানো নিয়ে বিষম সমস্যা উপস্থিত হল। বাবার মোটেই ইচ্ছে ছিলনা তিনি কলকাতায় আর একটা ছেলেকে পাঠিয়ে হারান। কারণ তাঁর মতে, আগের দুটো ছেলেকে তিনি কলকাতায়

পাঠিয়ে হারিয়েছেন। বাবার ইচ্ছে ছিল, আমি আসামে ওকালতি পরীক্ষা দিয়ে শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ চলিহার মতো উকীল হই। আমার নিজের কিন্তু খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমি কলকাতায় পড়ি। আমার দুজন দাদা আমার এই কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে খুব সমর্থন জানালেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ এবং শ্রীযুক্ত বিনন্দ আমাকে খাওয়ার জন্য খরচ দিলেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাদা তখন গোলাঘাটে ছিলেন, তিনি শিবসাগরে এসে আমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বাবাকে বিরক্ত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার কলকাতায় যাওয়াই ঠিক হল।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

শেষপর্যন্ত কলকাতায় আমার থাকার ব্যবস্থা হল কালীঘাটে হালদার পদবী-যুক্ত এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সংগে। ছাত্রদের মেসে থেকে আমার যাতে জাত মারা না যায় সে উদ্দেশ্যেই এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হল। আমি কলকাতায় যাওয়ার আগেই পিতৃদেব আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বসিয়ে নিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রতিদিন কেমন করে গংগাস্নান, সন্ধ্যাহ্নিক, নাম প্রসংগ আদি পালন করে চলতে হবে আর কি রকম ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন তিনি। আমাকে দিয়ে নোটবুক একটায় লিখিয়ে নিলেন কোন অসুখে কি কি ওষুধ খেতে হবে। সেই মূল্যবান নোটবুকটা আজও আমার কাছে আছে। কিন্তু সেগুলো ঠিকমতো পালন করা হয়নি এটাই বড় দুঃখের বিষয়। আমি কলকাতা যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। আমাকে সেখানে পেঁাছে দিয়ে আসার জন্য আমার দাদাও সংগে এলেন।

কলকাতা পেঁাছেই সানকিভাংগা নামে একটা জায়গায় অসমীয়া ছাত্রদের মেসে এসে উঠলাম আমরা দুজনে। একদিন মাত্র সেই মেসে থেকে তার পরের দিনই আমরা হালদারের বাড়ীতে গেলাম। হালদার পরিবারেরা আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করতেন এবং আমি যদিও ওদের বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিলাম তবুও পরের বাড়ীতে আমি কখনও আগে থাকিনি বলে সব সময়ই আমার মনে কি যেন পীড়া দিত। আমার বড়ই অস্বস্তি হত।

যখনই ওদের বাড়ীতে আমাকে শাক বা সজনে ডাঁটার চচ্চড়ির সংগে এক হাতা জলের মত মুগের ডাল বা ছোট্ট একটুকরো মাছের বিবর্ণ ঝোল দিয়ে খেতে দিত, তখন আমার বাড়ীর কথা মনে পড়ে জল এসে যেত চোখে। এই ধরনের রান্না আমার ভাল লাগতনা, তাই না খেয়ে খেয়ে আমার রুগ্ন শরীর আরও রুগ্ন হয়ে যেতে লাগল। আমি রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। তাই রোজ ট্রামে চড়ে কালীঘাট থেকে মির্জাপুর স্ট্রীট পর্যন্ত আমায় যেতে হত। তখনকার দিনে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলত, আজকালকার মতো ইলেকট্রিকের নয়। একে সবাই অফিস কাছারী যাওয়ার সময় ভাত খেয়ে শরীরের ওজন

বাড়িয়ে দিত দুগুণ আর তাঁদের নিয়ে প্রাণপণে টেনে নিয়ে যাওয়া ঘোড়ার পক্ষে যেমন কষ্টকর যাত্রীদের পক্ষেও তেমন ক্লান্তিকর। ঘোড়া তখন প্রাণের দায়ে বলত, 'ছোট নৌকায় অনেক ভর, মহাপ্রভু রক্ষা কর।' যাত্রীরা হয়তো বলত, হে প্রভু! আজ অফিসে বড় সাহেবের হাত থেকে রক্ষা কর। ছাত্ররা ভাবত তাদের হয়তো আজকের মতো পার্সেন্টেজই চলে গেল।

কলকাতায় পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে বাড়ী থেকে মত দিতে দেরী করায় আমার কলেজে ভর্তি হতেও দেরী হয়ে গেল। ক্লাসে বসে দেখলাম যে অনেক দূর পড়া এগিয়ে গেছে, তাই অধ্যাপকের দেওয়া লেকচার অনুসরণ করতে অসুবিধে হত রীতিমতো। বইয়ের প্রায় মাঝামাঝি অথবা শেষভাগে এসে পেঁছেছে অন্যান্য সবাই, আর আমি একেবারে প্রথম দিকেই রয়েছি। আমার অবস্থা তখন গোরুর গাড়ীতে করে পাঠ্যপুস্তকের দেশে পেঁছানর মতোই। আর ওদিকে অধ্যাপক মশায় তখন অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে হু হু শ্বাসে চলেছেন রেলগাড়ীতে। আমার মন ভরে গেল হতাশায়। এদিকে দিন দিন আমার শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরকম ভাবে মাসখানেক প্রতিকূল অবস্থার সংগে লড়াই করে আমি একেবারে ক্লান্ত।

ভাবলাম কলকাতায় পড়তে আসাটা আমার বৃথাই গেল। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারলেই হয়। আমার সংগী দাদাকে মনের কথা সব খুলে বলে, বাড়ী ফিরে যেতে চাইলাম। সে আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বাবাকে টেলিগ্রাম করে। এর উত্তরে পিতৃদেব তক্ষুনি ফিরে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন আমাদের। সেদিনই মনের আনন্দে শিয়ালদহে গিয়ে রেল গাড়ীতে উঠলাম। তখনকার দিনে 'আসাম বেংগল' রেল ছিল না। যাত্রাপুর কাওনিয়া দিয়ে ছোট রেল, ছোট জাহাজে উঠে আমরা ধুবড়ী পেঁছালাম। পিতৃদেবের এক নাতি পূর্ণানন্দ বরুয়া তখন ধুবড়ীতে 'ছোটসাহেব'। বাবা আমাদের কথা তাঁকে চিঠিতে লিখে দিয়েছিলেন বলে তিনি আমাদের তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমার শরীরের অসুখ যত না ছিল মনের অসুখ ছিল তার চেয়ে বেশী। আর কলকাতা ছেড়ে আসামের দিকে রওনা হতেই সেই অসুখ উধাও হয়ে গেল কোথায়। সেজন্য উনি যখন আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগলেন আমার তখন শরীর ভালো হয়ে গেছে বলে তাতে আপত্তি জানালাম। তিন চারদিন তাঁর বাড়ীতে থেকে আমরা জাহাজে করে রওনা

হলাম শিবসাগরে। আমার দাদা গোলাঘাটের কাছারী বাড়ীতে কাজ করতেন বলে তিনি নেঘেরীটিঙিতে নেমে গেলেন। আমিও পরের দিন দিচাংমুখ গিয়ে পৌঁছালাম। দিচাংমুখ থেকে শিবসাগর সহর মাত্র আট মাইল দূর। সেটুকু রাস্তা আমি পৌঁছালাম হেঁটেই। কারণ বাবা সঠিক জানতেন না কোনদিন আমি দিচাংমুখ পৌঁছাব, কাজেই দিচাংমুখের ঘাটে ঘোড়াও পাঠাননি তিনি। তখনকার দিনে শিবসাগরের লোকেরা ঘোড়া বা হাতী ছাড়া অন্য কোন যানের কথা ভাবতেই পারত না। ভীষণ রোদ। হেঁটে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার কাছে একটা পুলের উপরে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। চুপ করে বসে আছি, এমন সময় দিচাংমুখ থেকে একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমার কাছে এসে স্নেহভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মশায় কি কলকাতা থেকে এসেছেন?' আমি 'আজ্ঞে হাঁ' বললে, তিনি বলেন, 'বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন! শিবসাগরে যদি আর কেউ আপনার পরিচিত লোক না থাকে তাহলে আপনি অক্ষয়কুমার ঘোষ বলে একজন বাঙালী উকীল আছেন তার বাসায় গিয়ে উঠবেন। অক্ষয়বাবু বড সদাশয় ব্যক্তি। বাঙালীদের জন্য তাঁর অবারিত দ্বার।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিযে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বলা বাহুল্য যে, ভদ্রলোক আমায় বাঙালী বলে ভুল করেছিলেন। সন্ধ্যা হবার সংগে সংগে আমি পৌঁছলাম বাড়ীতে। আমাকে দেখে বাবা আনন্দে আত্মহারা হলেন। হারানো ছেলেকে তাঁরা ফিরে পেলেন আবার। তাড়াতাড়ি বাবা ঠাকুরঘরে গিয়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

আমার কলকাতায় পড়ার প্রথম পর্বের শেষ হল এইরকমভাবে। এর পরে 'টহলরাম শর্মা' হয়ে আমি শিবসাগরে তিন মাস কাটালাম টহল দিয়ে দিয়ে। মায়ের হাতের রান্না খাই, যত্ন করে জলপান সাজিয়ে দেন, তা মনের আনন্দে খেয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াই, আড্ডা মারি আর ঘুমিয়ে দিন কাটাই। ওকালতি পড়া টডা জাহান্নামে গেল। কাছারীতে কুড়ি টাকার চাকরীতে ঢুকে এপ্রেন্টিস হতে আমি একেবারেই নারাজ। সেজন্য খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে আর আড্ডা না মেরেই বা আমি করি কি? যা হোক সব জিনিসেরই একটা শেষ আছে আর আমার এই ভবঘুরে জীবনেরও একটা শেষ হল। কাজ না করে করে নিষ্কর্মা জীবন কাটাতে কাটাতে আমার মনটাও অসুস্থ হয়ে উঠল :আবার। ভাবলাম, একটু অসুবিধে হতেই আমি পড়া ছেড়ে দিয়ে কলকাতা থেকে চলে এলাম।

আমি কি মূর্খ! এরকম হলে তো আমি এই সংসারে চলতে পারবনা। যাই হোক আমি আবার পড়ার সংকল্প করলাম এবং সুযোগ বুঝে কথাটা পিতৃদেবের কানে তুললাম। তিনি এতে একটুও আপত্তি করলেন না দেখে আশ্চর্য হলাম। আমাকে এরকমভাবে আলসেমি করে কাটাতে দেখে তিনি মনে মনে নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছিলেন। ওকালতি করে কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগারে যে আমার পরম বিতৃষ্ণা একথা তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

বাবার অনুমতি নিয়ে আমি আবার চলে এলাম কলকাতায়। এইবার আমি পরের বাড়ীতে না থেকে সোজা এসে উঠলাম একটা ছাত্রদের মেসে। সেই মেসটা ছিল ৫৩ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে। হাইকোর্টের অসমীয়া অনুবাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাকান্ত বরকাকতী সেই মেসে ছিলেন। আমিও তাঁর সংগে যোগ দিলাম। কাছেই ছিল সিটি কলেজ। তাই রিপন কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে সিটি কলেজে এসে ভর্তি হলাম। আমি না পড়ে পাগলামি করে কাটিয়েছিলাম ছটা মাস। সেই ছমাসের যে পড়ার ক্ষতি হয়েছে তা তৈরী করে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। শিবসাগরে বারোয়ারী নামঘরে যেমন রাত দিন পড়তে পড়তে শংকর মেথরের কাছে গোঁসাই হয়ে গেলাম, সেই রকম পড়াটা আবার শুরু করার চেণ্টা করলাম। ক্লাসের ছেলেরা বই সব শেষ করে ফেলেছে, অথচ আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। দুমাসের মধ্যেই আমি পড়াটা তৈরী করে ফেললাম। আমি অংকতে একেবারেই কাঁচা ছিলাম। এফ এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যতটা অংক জানার প্রয়োজন আমার ততটা জ্ঞান একেবারেই ছিল না। তখন কি করি, যাইহোক ভগবান একটা উপায় বার করে দিলেন। আমার অন্তরংগ বন্ধু শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বরুয়া আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন। তিনি তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বি. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তখন যত অসমীয়া ছাত্র ছিল সকলের মধ্যে তিনি অংকতে ভালো ছিলেন বলে যে তাঁর কাছে অংক শিখতে চাইত, তাকেই তিনি শিখিয়ে দিতেন। ছোটবেলা থেকে একসংগে আমি তাঁর সংগে বড় হয়ে উঠেছি, কাজেই তিনি যে আমাকে আগ্রহ করেই অংক দেখাবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে তাঁর স্বাস্থ্য ছোটবেলা থেকেই ভালো ছিল না, এমন কি কলকাতায় এসেও সেই স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হল না। আমি এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে তাঁর স্বাস্থ্য যদি আরও ভালো হত আর তিনি নিয়মমতো পরিশ্রম করতে পারতেন,

তাহলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা ছাত্র হতে পারতেন। তাঁর সুন্দর স্বভাব মিষ্টি ব্যবহার আর পরের জন্য স্বার্থত্যাগ তাঁর অংগের ভূষণ ছিল। আমার প্রতি তাঁর যে বন্ধুত্বের মনোভাব ছিল, সেই স্মৃতি আমি কখনই ভুলতে পারিনে।

আমার পড়ার খরচ আমি বাড়ী থেকে আনব না বলে ঠিক করেছিলাম। গোড়া থেকেই আমি নিয়মিত কলেজে না পড়ার জন্য আসাম গবর্নমেন্ট আমাকে যে কুড়ি টাকা করে বৃত্তি দিত তা বন্ধ করে দিয়েছিল। সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার হয়ে অনেক লেখালিখি করে সেই টাকাটা উদ্ধার করে দিল। আমি একবারই ছ কুড়ি কি সাত কুড়ি টাকা পেলাম এবং আমি নিশ্চিন্ত মনে পড়তে শুরু করলাম। আমি এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করে বাড়ী রওনা হলাম।

রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আসাম থেকে কলকাতায় এসে ওঁর ছেলেমেয়ের সংগে মাণিকতলায় একটা ভাড়া ঘরে ছিলেন। আমি পরের বার কলকাতায় এসে তাঁদের সংগে দেখা করতে আসি। তখন রায়বাহাদুর মহাশয় কাজ থেকে অবসর নেননি বলে কলকাতায় আসতে পারেন নি। বরুয়া মহাশয়ের ছেলে মেয়েরা যেন এক একটি পুতুল। পরিবারটি বড চমৎকার ছিল। তাঁর মধুর স্বভাব স্ত্রী আমাদের আদর যত্ন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলে নিমেষের মধ্যে উনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ফেললেন। আমি সম্পর্কে মিসেস বরুয়ার মামা হই। তাঁর বাড়ীতে গেলেই তিনি বলতেন, 'মামা এইখানে বসুন', 'এইটে খান, ওটা খান' ইত্যাদি কথায় আমার এই প্রবাসী জীবনের নিঃসংগ মনটাকে ভরে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর মেয়ে স্বর্ণলতা তখন বেথুন স্কুলে পড়ত। অসমীয়া মেয়ের পক্ষে সেটা একটা নতুন কথা। স্বর্ণকে আমার নিজের বোনের মতো লাগত এবং ওর ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলাম। শ্রীমান জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া (এখন জে বরুয়া এস্কোয়ার ব্যারিস্টার অ্যাট ল প্রিন্সিপাল, আর্ল ল কলেজ) তখন ছোট ছেলে ছিল। তাকে আমি কোলে নিয়ে পিঠে চড়িয়ে বেশ মজা পেতাম! তাঁর গায়ের রঙ আর গড়ন যেন ইউরোপীয়দের মতো ছিল। তাঁর বড়দাদা করুণা ও মেজদা কমলাও দেখতে সুন্দর ছিলেন। বড়ই দুঃখের কথা যে তাঁরা অকালেই মারা যান। ডাঃ নন্দকুমার রায় বলে বাঙালী ভদ্রলোক একজন বিলেত থেকে পাস করে এসেছিলেন, তাঁর সংগে স্বর্ণলতার বিয়ে হল। তিনিও

পত্নী এবং দুই শিশুকন্যা রেখে অকালে মারা যান। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী 'নীতি-কথা' নামে একখানি নীতিগর্ভ বই রচনা করেছিলেন। প'য়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে একজন অসমীয়া ভদ্রমহিলা এমন সহজ আর প্রাঞ্জল ভাষায় যে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেটা সত্যি আশ্চর্যের কথা। তবে তিনি যে প্রাচীন সাহিত্যিক রায় গুণাভিরাম বরুয়ার উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন, সেটা না বললেও চলে।

আমি তখন কলকাতার ৫৩ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের অসমীয়া ও বাঙগালী ছাত্রের মেসে থাকি। এই মেসের পাশেই ১৪।১ প্রতাপচন্দ্র চ্যাটুজ্জে লেনে একটা অসমীয়া ছাত্রদের মেস ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা, শ্রীযুত দেবীচরণ বরুয়া, কালীকান্ত বরকাকতী, ঘনশ্যাম বরুয়া (অনারেবল রায়বাহাদুর), শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সন্দিকৈ (রায়বাহাদুর), শ্রীযুক্ত গুঞ্জানন বরুয়া, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ আদি সবাই সেই অসমীয়া ছাত্রদের মেসেই ছিল। তখন আসামের সাহিত্য জগতে 'আসাম-বন্ধু' স্তিমিত আর 'মৌ'র উদয় হচ্ছে। বিলেতের কুপার্স হিল কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পাস করে এসেছিল শ্রীবলিনারায়ণ বরা। তিনিই এই 'মৌ' নামের মাসিক পত্রিকাখানি চালান। তাঁর ভাই ৺হরনারায়ণ বরার উপর সম্পাদকীয়ের ভার থাকলেও সেটা ছিল নামে মাত্র। বরা সাহেবের দাদাই সম্পাদনার কাজটি করতেন। সুযোগ্য বলিনারায়ণ বরার গুণে 'মৌ' প্রথম থেকেই বাংলা পত্রিকাগুলোর মতো গতানুগতিক ভাবে না বেরিয়ে স্বতন্ত্র ভাবেই বেরুত। আমরা তখন বাংলা পত্রিকার বিদ্যায় পূর্ণ অসমীয়া ছাত্র। আমরা মুখ খুললেই আমাদের বাংলা বিদ্যার জ্ঞান বেরিয়ে পড়ত। তা ছাড়া নতুন কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতবাদের কামারশালে আমার মন পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছিল। আমার অচেনা পথে মৌকে যেতে দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হল। আর যখন দেখলাম কংগ্রেসবিরোধী ইংলিশম্যানে মৌ-এর প্রশংসা ছাপা হয়েছে তখন আমায় পায় কে। আমি প্রতাপ চাটুজ্জের গলির মেসে সভার পর সভা করে মৌকে মারবার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলাম। কালীকান্ত বরকাকতী আর মথুরামোহন বরুয়ার (পরে Advocate of Assam কাগজের সম্পাদক) নেতৃত্বে কয়েকজন ছেলে বরা মহাশয়ের কুশ পুত্তলিকা পোড়াল। আমরা তো মনের সুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি আর মথুরামোহন মহা বিক্রম প্রদর্শন করে 'মৌ'তে প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি। প্রবন্ধ

ছাপা হল। বরা মহাশয় 'সম্প্রতি কলকাতা নিবাসী শ্রীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া' বলে আরম্ভ করে আমার প্রতিবাদ প্রবন্ধের উত্তর সেই প্রবন্ধের সঙ্গেই ছাপিয়ে বের করলেন। মনে আছে—আমাদের 'মৌ'কে বধ করার চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, সেই প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন, যে গাছে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে সে কাত হয়ে না পড়লে মৌমাছি মরবেনা। কিন্তু দুঃখের কথা সেই গাছও কাত হয়ে পড়ল 'মৌ'ও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা ছেলেমানুষী করে তখন বুঝতে পারিনি যে 'মৌ'র মতো একটা ভালো কাগজ বন্ধ হয়ে দেশের কত অনিষ্টই না হল। সম্ভবত আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে বরা মহাশয় তখন থেকে অসমীয়া ভাষায় লেখা একেবারে বন্ধ করে দিলেন, কারণ তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কোন লেখা বেরোযনি অসমীযা ভাষায।

হরিবিলাস আগরওয়ালার সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা তখন বোধহয় প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এফ. এ পড়তেন। কলকাতার বড়বাজারে ১০ নম্বর আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে তাঁদের ব্যবসায়ের নিজেদের কুঠি ছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা সেখান থেকে তাঁদের ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন আর কলেজে পড়তেন। প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন থেকেই তাঁর হাসিমুখ ও মিষ্টি কথাবার্তা আমার মনকে জয় করে ফেলেছিল। অচিরেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব জমে উঠল। তাঁর যেমন সাহিত্যচর্চার দিকে ঝোঁক ছিল আমারও তেমনি। 'জোনাকী' নাম দিয়ে একখানা মাসিক পত্রিকা বের করার সংকল্প তিনি আমার সঙ্গে করলেন। আমি তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিলাম এবং 'জোনাকী'র জন্য প্রবন্ধ লিখতে চাইলাম। ১৮১০ শকের মাঘ মাসে 'জোনাকী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। সেই সংখ্যা থেকেই বছরখানেক ধরে একটানা আমার 'লিটিকাই' শীর্ষক প্রবন্ধ তাতে প্রকাশিত হতে লাগল। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা জোনাকীর জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। একাধারে তিনি সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ এবং স্বত্বাধিকারীও। তাঁর লিখিত 'আত্মকথা' জোনাকীর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত। রচনাটি অতি সুন্দর ভাবে জোনাকীর উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করেছিল। 'আত্মকথা'তে তিনি লিখেছিলেন, 'আসামে পত্রিকাগুলির অবস্থা কচুপাতায় জলের ফোটার মতো। মানুষের চেষ্টার বিরতি নেই বলেই আমাদের এই সাহস। কাজ করাই

জীবনের উদ্দেশ্য, ফলাফল পরের কথা। কাজের চাকার তলায় কত লোক মরে, কত বাঁচে, এই বাঁচা মরার সংগ্রামেই জীবনের উদ্দেশ্য রচিত। হয়তো অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করবে, 'আমাদের উদ্দেশ্য কি!'—কিন্তু আমাদের কাজটা না বোঝার মতো কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। রাজনীতি আমাদের 'রাজ্যের' বাইরে, এই পরাধীন দেশে 'প্রজানীতি'ই করতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি আমাদের আলোচনার বিষয়—এইগুলো যথাসাধ্য বুঝে নিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব। 'বাদ' 'প্রতিবাদ' আমরা আমাদের পত্রিকায় নিশ্চয়ই ছাপাব। তা বলে ব্যক্তিগত নিন্দাকে আমরা সমর্থন করব না। ভাষার দিকে আসামের বিশেষ নজর থাকবে। আসামের সব শ্রেণীর লোকের কাছে যেন এই পত্রিকাখানি সমাদৃত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখব আমরা। নতুন করে উন্নত হওয়া আমাদের এই আসাম দেশের জন্য আমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করব। আলোক থেকে দূরে অন্ধকারে পড়ে আছে আসাম দেশ। তাতে যদিও বা একটু আলেয়ার মতো আলো জ্বালাতে পারি তাহলে আমাদের শক্তির বৃথা অপব্যয় হয়নি বলে ভাবব। আমরা জানি, আমাদের দেশ শিক্ষায় জ্ঞানে পিছিয়ে আছে, টাকা পয়সাতেও দরিদ্র, জনসংখ্যায় হীন, রুগ্ন স্বাস্থ্য ও কর্মে অলস ও পরাধীন--কিন্তু আমরা নিজশক্তি অনুযায়ী কাজ হাতে দিতে পারিনি। আমরা যুদ্ধ করতে বেরিয়েছি অন্ধকারের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য—দেশের উন্নতির জন্য 'জোনাক' (মানে, আলো)। কতদূর আলোর দিকে এগিয়ে যেতে পারব তা নির্ভর করে নিজের শক্তি ও সুযোগের উপরে। পাটিতে শুয়ে দিন গোণার সময় আর নেই। চারদিকে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে অসমীযারা চুপ করে বসে থাকবে কেন? তড়িৎ গতিতে যেখানে সব কাজ চলছে, সেখানে শ্লথ গতিতে চললে কোন কাজই এগুবেনা। আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। এই সংসারে কেবলমাত্র যোগ্যতার স্থান আছে। অযোগ্যতার কোনো স্থান নেই। তুষের আগুনের মতো অসমীয়ার উৎসাহ ও শক্তি চাপা পড়ে আছে, একদিন সে জ্বলে উঠবেই।'

একবার বাংলাদেশের বর্ধমানে অনুষ্ঠিত প্রভিন্সিয়েল কনফারেন্সে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এ চৌধুরী (পরে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, কলকাতা হাই-কোর্টের জজ) বলেছিলেন, 'পরাধীন জাতির রাজনীতি বলে কোন জিনিস নেই।' তখনকার কালে এই ধরনের কথা শুনে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন-

কারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বোম্বাইর স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা, দিনশা ওয়াচা, এমন কি মহামান্য গোখলে এবং বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তি এই কথার ভীষণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করুন বা রাগই করুন এটা ঠিক যে, এই কথার সত্যতা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা নয় কি, প্রবীণ রাজনৈতিকের মুখে এই ধরনের কথার আগে থেকেই অল্পবয়সী ছাত্র 'জোনাকী'র সম্পাদক চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার মুখ থেকে একই কথা বেরিয়েছিল।

আগেই বলেছি, যে প্রথম বছর 'জোনাকী'র প্রতি সংখ্যাতে 'লিটিকাই' নামে ফিচার কলম বেরুত। আমি তখন নতুন লেখক এবং আমার অবস্থা তখন নতুন বৌয়ের মতোই, কে কি বলবে না বলবে তাই ভেবে আমার অবস্থা তখন তটস্থ। কেউ জোনাকীতে প্রকাশিত 'লিটিকাই'র কথা শুরু করলে আমি তক্ষুনি সেখান থেকে সুরু সুরু করে উঠে পড়তাম, অথচ আমার শোনারও খুব ইচ্ছে থাকত। যাই হোক 'লিটিকাই' পড়ে সবার ভালো লেগেছে জেনে আমার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে 'লিটিকাই' রচনা করতাম। 'লিটিকাই' কবিতা নয়; রচয়িতা কবি যশপ্রার্থীও নয়, তথাপি কলকাতায় ইডেন গার্ডেনের গাছের তলায় বসে 'লিটিকাই' রচনা করার কি কারণ ছিল জানিনা। কথাটা তবে খুলেই বলি, শনি রবিবার আমি ইডেন গার্ডেনে গিয়ে নির্জনে বসে 'লিটিকাই' প্রবন্ধের এক একটা অধ্যায় রচনা করতাম। প্রথমে বালির কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে লিখে নিতাম তার পরে ভালো কাগজের উপরে কোনমতে লিখে বন্ধুবৎসল আগরওয়ালার হাতে চুপি চুপি গুঁজে দিয়ে আসতাম। তিনিও তাকে নিয়ে ছাপিয়ে দিতেন জোনাকীতে।

প্রথম সংখ্যা জোনাকীতে আগরওয়ালার 'বনকুয়রী' কবিতাটি বেরয়। যাঁরা আগে ভাবতেন যে, অসমীয়া ভাষায় বর্তমান কালের উপযোগী সুন্দর কবিতা লেখা যায় না, তাঁদের ভুল দূর হল এই কবিতা পড়ে। আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁরা আগে ভাবতেই পারতেন না ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মতো এত সুন্দর মনোরম কবিতা কলেজে পড়া অসমীয়া ছাত্র একজন রচনা করতে পারে। এর পরে দ্বিতীয় সংখ্যা 'জোনাকী'তে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামীর 'কাকো আরু হিয়া নিবিলাও*' অর্থাৎ 'কাউকে

আর হৃদয় দেবনা' নামে প্রেমের কবিতা বেরুল। এই কবিতাটিও অনেকের ভালো লেগেছিল। ঘনশ্যাম বরুয়ার (রায়বাহাদুর) গদ্য-প্রবন্ধ 'আত্মশিক্ষা', 'চিন্তানল'র শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'পাহরণি' কবিতা আর সম্পাদক আগরওয়ালার মুক্তোর মতো 'নীয়র' কবিতা এই বছরের 'জোনাকী'তে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল।

জোনাকীর দ্বিতীয় বছরে তার কার্যালয় ১০ নং আর্মেনিয়ান স্ট্রীট থেকে ২ নং ভবানীচরণ দত্ত লেনের মেসে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাও তাদের আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের বাড়ী থেকে এসে সেই মেসে এসে উঠল। সেখানে আগরওয়ালা, শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী আর আমি এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এক জায়গায় এসে জড়ো হলাম আর তিনজনে জোনাকীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। এই ত্র্যহস্পর্শের ফলে 'জোনাকী' প্রবন্ধ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠল। রত্নেশ্বর মহন্তের 'অসমত মান', লম্বোদর বরার 'অসমীয়া ভাষার আখর-জোঁটনি', রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয়ের 'সৌমার ভ্রমণ', বিষ্ণুপ্রসাদ আগরওয়ালার 'শংকরদেব' বুকে নিয়ে জোনাকী জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হল। এই লেখকের 'কৃপাবর বরবরুয়ার কাকতর টোপোলা' শীর্ষক রচনা দ্বিতীয় বছর জোনাকীতে আরম্ভ হয়। এই ধরনের চেষ্টাতে জোনাকী একবছরের মধ্যে অসমীয়ার শক্তি বৃদ্ধি করে অসমীয়া সাহিত্যগগনে সকালের সূর্যের কিরণ বিতরণ করল। কিছু সংখ্যক ইংরাজী শিক্ষিত অসমীয়ার ধারণা ছিল অসমীয়া ভাষা চর্চা করা অনাবশ্যক। যাঁরা এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন তাঁদের জোনাকী পড়ে ভুল ভাঙল। এই শ্রেণীর লোকেদের লক্ষ্য করে দ্বিতীয় বছরের 'জোনাকী'তে লেখা হয়েছিল—অসমীয়া ভাষা যে অনাবশ্যক, একথাটা অনেকে না বুঝেই মনে মনে পোষণ করেন, হায়। হায়! হায়! অসমীয়ারা নিজের ভাষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রাখলে কাগজ যে প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় সে কথা একবার পাঠকরা চিন্তা করে দেখুন।

মাতৃভাষার উন্নতির জন্য আমরা যে শুধু জোনাকী প্রকাশ করেই বসে ছিলাম তা নয়, অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা নামে সভা স্থাপন করে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম ভাষার উন্নতিসাধনের জন্য। এই বছরের জোনাকীতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভার কার্য বিবরণ

পড়লেই তার আভাস পাওয়া যাবে। এই লেখক সেই বছরে সেই সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর লেখা বাৎসরিক কার্য বিবরণ থেকে তুলে দিলাম। এই বাৎসরিক সভা ১৮১২ শকের ২০ আশ্বিনে ২নং ভবানীচরণ দত্ত লেনের বাড়ীতে বসেছিল এবং তার সভাপতি ছিলেন রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া। "কলকাতায় অবস্থিত অসমীয়া ছাত্রদের 'টি পার্টি'' নামে একটা সম্মিলনী ছিল। প্রতি শনিবার সেই সম্মেলনে অসমীয়া তরুণেরা এক একদিন এক একজনের বাড়ীতে সমবেত হওয়া ঠিক হল। সেখানে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি যাতে সদ্ভাব প্রীতি বজায় রেখে চলে এবং দেশের জনহিতকর কাজে আত্মনিযোগ করে সেই বিষয়ে নানা আলাপ আলোচনা হত। সেই আলোচনা থেকে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা'র উৎপত্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে চোখ বোলালে দেখা যায় জগতে যতগুলো বড় বড় কাজের অনুষ্ঠান হয়েছে, তার সবই ছোট ছোট কাজ থেকে উৎপত্তি। বিলাতী পণ্ডিত জনসন এডিসনের দিনের 'কফি হাউস' ইউরোপ, এশিয়া আর আমেরিকা জুড়ে অনেক বড় বড় কথা সৃষ্টি করেছিল। এখনও অসমীয়া ভাইদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'টি পার্টি'' কালক্রমে একদিন অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনীর ডালপালা ছড়িয়ে অনেক দূর বিস্তৃত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৮৮ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে ৬৭ নং মির্জাপুর স্ট্রীটের সভায় গৃহীত সেই প্রস্তাব কাজে পরিণত হওয়ার ফলস্বরূপে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতিসাধিনী সভা'র জন্ম হয়।

এই সভার উদ্দেশ্য হল অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধন করা। অসমীয়া ভাষার শিশু অবস্থা থেকে কেমন করে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে, কেমন করে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলোর উন্নতশীল ভাষার সমকক্ষ হতে পারবে এবং আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসাম দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, সেটাই হল এই সভার একমাত্র লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্য সফল করতে সভা অসমীয়া পুথিগুলোকেও একত্রিত করার জন্য চেষ্টা করছে। পুরানো পুথিগুলো যাতে নষ্ট নাহয় এবং ক্রমে ছাপা হয়ে বেরয় তারও চেষ্টা করছে এই সভা। আসামের সব শ্রেণীর স্কুলে যাতে অসমীয়া ভাষা শেখান হয় এবং প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে এই ভাষা শিক্ষার সকল সুযোগ পায়, তার জন্য আসামের শিক্ষা বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করা, লেখাপড়ায় অশুদ্ধ ব্যাকরণ অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস ক্রমে লোপ করে তার

পরিবর্তে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করার জন্য এবং দূষিত ভাষার পুথির পরিবর্তে শুদ্ধ ভাষার পুথির প্রচলন করতে, শ্রীধর কন্দলি, শঙ্করদেব আদি প্রাচীন গ্রন্থকার আর কবিদের লেখা পুথিগুলোর টীকা লিখতে এবং দোষ গুণ আলোচনা করতে, সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষায় আমাদের অনুবাদ করতে, আগেকার দিনের ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, খেলাধুলায় যেসমস্ত বৃত্তান্ত আছে তা সংগ্রহ করে একখানা বিস্তৃত ইতিহাস লিখতে, দেশের ছোট বড সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাতে লেখাপড়ার চর্চা হয়, তার জন্য সহজ উপায় বের করতে, খবরের কাগজের প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়াতে আর আমাদের সমস্ত অঞ্চলে একটা মাত্র লিখিত ভাষাতে লিখতে এই সভা চেষ্টা করবে।

অসমীয়া পুঁথি—এই সভা অসমীয়া পুরানো ও নতুন পুথির নাম খুব যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে একটা তালিকা করে রেখেছে। এই পুথিগুলোর নাম সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য এই—

১. অসমীয়া ভাষাকে যারা ভাষা নয় বলে উল্লেখ করে, তাদের দেখান হবে যে ভাষাহীন দেশে কত বই আছে। ভাষার উন্নতির জন্য তার গোড়া থেকে বর্তমান কাল অবধি সবরকম পুথি পরিচয়ের দরকার।

২. পুরানো কাল থেকে আজ অবধি অসমীয়া লোকের মানসিকতার কেমন ধরনে ক্রমবিকাশ হয়েছে, তা জানার প্রধান উপায় হচ্ছে এই পুঁথি। এই গুলোতে অসমীয়া লোকেদের মনোরাজ্য দেহরাজ্যও ধর্মরাজ্যের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের হাত, পা, মাথা আদি শরীরের প্রত্যেকটা অংশ না থাকলে যেমন শরীর সম্পূর্ণ হয়না তেমন অতীতের লেখা পুথিগুলি অসমীয়া সাহিত্য শরীর ও ধর্মশরীরের অংগ প্রত্যংগ।

৩. পুরানো পুথিগুলো আমাদের পুরানো রত্ন। রত্ন যেমন পুরানো হলেও কাজে লাগে বরং তার মূল্য আরও বেশী বাড়ে, সেই রকম আমাদের পুরানো পুথিগুলো আমাদের অমূল্য সম্পত্তি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সব রত্ন যত্ন করে রেখে গেছেন, এখন সেগুলো সঞ্চয় করা আমাদের কর্তব্য। ভারতে তিনশ চারশ বছর আগে কটা জাতির পিতৃ-পিতামহ অসমীয়ার মতো দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত, অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আর পুরাণ তন্ত্রাদি প্রায় পাঁচশখানা নিজের মাতৃভাষায় রচনা করেছিল, শুনলে আশ্চর্য লাগে।"

তৃতীয় বছরের জোনাকীতে রচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি আরও উন্নত মান নিয়ে দেখা

দিল। এই বছর 'জোনাকী' সম্পাদনার ভার পড়েছিল আমার উপর। হেমচন্দ্র গোস্বামী আর জোনাকীর সর্বস্ব চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার থেকে আমি অবশ্য অনেক সাহায্য পেতাম। লম্বোদর বরা, শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা (রায়বাহাদুর) রত্নেশ্বর মহন্ত, শ্রীযুত কনকলাল বরুয়া (রায়বাহাদুর), লক্ষেশ্বর শর্মা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বরদলৈ পাণীন্দ্রনাথ গগৈ ইত্যাদির প্রবন্ধে জোনাকী সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল রত্নেশ্বর মহন্তর 'মোরামরীয়া বিদ্রোহ' নামের মূল্যবান প্রবন্ধ। শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামীর উল্লেখযোগ্য সুন্দর 'জোনাকী' কবিতা প্রথম সংখ্যায় বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল পাঠকের কাছে। এই বছরেই এই লেখকের 'পদুম কুয়রী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ বছরের জোনাকীও এই লেখকের সম্পূর্ণ সম্পাদনায় পরিচালিত। পঞ্চম বছরে আমি যদিও জোনাকীতে অনেক রচনা লিখেছিলাম, কিন্তু সম্পাদক হয়ে আর থাকিনি। 'জোনাকী' ১৮ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের থেকে সেই মেসবাসী অসমীয়া ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল। শ্রীযুক্ত সোনারাম চৌধুরী ছিলেন সেই বছরে জোনাকীর প্রকাশক। যাহোক এই বছরও জোনাকীর প্রবন্ধের মান আগের বছরের মতো একই পর্যায়ে ছিল বলে আমার বিশ্বাস। ষষ্ঠভাগ 'জোনাকীর' প্রকাশক শ্রীযুক্ত মীনধর হাজরিকা। এর পরে জোনাকীর আকারের পরিবর্তন হয়। এবং শ্রদ্ধাস্পদ সুলেখক শ্রী সত্যনাথ বরা বি এল মহাশয়ের সম্পাদনায় জোনাকী প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর তিন বছর প্রকাশিত হবার পর জোনাকী বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে বরা মশায়ের বিচক্ষণ সম্পাদনায় জোনাকীতে আমার 'আজি', 'চেনিচম্পা' 'কেকো ককা' 'জয়ন্তী', 'পুত্রবান পিতা' নামের ছোট গল্পগুলো প্রকাশিত হয়।

২ নং ভবানীচরণ দত্ত লেনের মেসে থাকতেই আমরা 'ভ্রমরঙ্গ' থিয়েটার করি। 'ভ্রমরঙ্গ' শেকসপীয়রের কমেডি অব এরর্সের অসমীয়া অনুবাদ। রত্নেশ্বর বরুয়া, শ্রীযুক্ত রমাকান্ত বরকাকতী, শ্রীযুক্ত গুঞ্জানন বরুয়া, ঘনশ্যাম বরুয়া এই চারজনে মিলে এই পুস্তকটি অনুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত শিবরাম বরদলৈ আর এই লেখক সহায়ক হন। প্রথম থেকে শেষ অবধি এই কাজে রত্নধর বরুয়ার অসীম উৎসাহ ছিল। ভ্রমরঙ্গ নামটা দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত শিবরাম বরদলৈ। তিনি "ভ্রমরং ভ্রান্তিমূলং" বলে তাঁর সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করে আমাদের হাসাতেন।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

তখন আমি জেনারেল এসেমব্লি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। 'পলগ্রেভস গোল্ডেন ট্রেজারি অব লিরিক্স্' নামে ইংরাজী কবিতার সংগ্রহ ছিল আমার পাঠ্য। আর তাছাড়াও বায়রন, শেলী, কীটসের কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো আছেই। কবিতার বর্ষণ ধারায় আমার মন 'প্রেম রসে' সিক্ত। আমার মনের দিগন্ত মাঠে বায়রনের কবিতা যেন পলি দিয়ে নরম করেছিল মাটিকে, শেলীর কবিতা তার উপর লাঙল চষে দেয়, কীটসের কবিতা দেয় মই আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার সেই জমিতে ফসলগুলোকে তর্তর্ করে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এক কথায় বলা যায়—আমার মনের অবস্থা তখন সংগীন ; একদিন স্বপ্নে আমি একটি রঙীন চশমা পেয়ে গেলাম আর সেই অপরূপ চশমার দৌলতে সারা দুনিয়াকেই আমি দেখতে শুরু করি সুন্দর। যেদিকে আমি তাকাই, সেদিকেই দেখি রাশি রাশি সৌন্দর্য মাধুর্য ও আনন্দ। জলে মধু স্থলে মধু মানুষের মধ্যে মধু, ফুলে ফলে সবেতে মধু। আকাশ থেকে যেন মধু বর্ষিত হচ্ছে, বাতাসে বইছে মধু। প্রেম ও ভালবাসা তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দিল আমার মন। দখিনা বাতাস আমার মনটাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার ঠিক নেই। ক্ষণে ক্ষণে তার পরিবর্তন, একবার সে আনন্দে অধীর, পরক্ষণে সে অশান্ত তাড়নায় অস্থির—

সুখ ভরা এ ধরায়
মন বাহিরেতে চায়
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত।

মনটা উড়ে গিয়ে কোন অজানা দেশে ঘুরে বেড়িয়ে প্রেমের সুমধুর সুরে বীণা বাজিয়ে নিজেকে করেছে পাগল আর করেছে জগতকে।

যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে
কে জানে কোথায় ফুল ফুটিছে।

তেমনি আমিও যাব
নাজানি কোথায় দেখা পাব ?
কার সুধাস্বর মাঝে
জগতের গীত বাজে
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে ?
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত ?
তাহারে খুঁজিব দিক দিগন্ত।

আমার বাড়ির তিন তলার ছাদের উপর গিয়ে নিস্তব্ধ রাত্রিতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থেকে ঘুমই ভুলে গেলাম আমি। ফুল একটা কুড়িয়ে পেলে তার রঙ দেখেই আনন্দে আমি বিভোর হয়ে থাকি। আমার হাবভাব দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি—

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
সখি, মোরে জাগায়ো না।

মনে আছে, উল্টো রথের দিনে শিয়ালদহের হাট থেকে দুটো পয়সা দিয়ে তিনটে গোলাপ গাছ কিনেছিলাম। সাড়ে তিন আনা দিয়ে তিনটে মাটির টব আর মাটি কিনে এনে তাতে গোলাপ গাছ লাগিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই গোলাপ গাছের দিকে। গোলাপের কাছে বসে গোলাপকে জিজ্ঞাসা করি—

বল্ গোলাপ, মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে ?...
চাঁদ হাসিছে সুধাহাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী গাহিছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি সখি কবে ?

মাসখানেকের মাথায় যখন একটা গাছে একটা গোলাপের কুঁড়ি ফুটল, আমার তখন কী যে আনন্দ, আমি যেন পুত্রসন্তান লাভ করেছি এইরকম একটা আনন্দ আমার মনকে ভরে দিল। ফুল ফুটল। এ তো আর বাগানের গোলাপ নয়, টবের গাছের টবের ফুল। কিন্তু তা হলে কি হবে, সে তো আমার চোখে পদ্মলোচন। ফুলটার সঙ্গে আমি কথা বলি, তাকে ছুঁয়ে স্পর্শলাভ করি।

এমনভাবে ফুলটাকে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করতে করতে ফুলের পাপড়িগুলো খসে পড়ল একদিন। আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারলাম, আদরের জিনিসগুলোর উপর এরকমভাবে দৌরাত্ম্য করতে গেলে এরকমই ফল হয়। ঠিক করলাম আজ থেকে আদরের জিনিসগুলোকে দূর থেকেই আদর করব। মনে পড়ল, সেজন্যই হয়তো চাঁদ ও তারাগুলোকে যাতে ছুঁতে না পারি, সেজন্য ঈশ্বর ওদের দূরে রেখে দিয়েছেন। এগুলোকে হাতের কাছে পেলে নিশ্চয় লোকে তাকে শেষ করে দিত। যাই হোক মনের দুঃখ চেপে রেখে নতুন ফুলের আশায় আবার গোলাপ গাছে জল দিতে শুরু করলাম। একদিন আমাদের দেশের একজন ভদ্রলোক ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন, তিনি সেই গোলাপ গাছগুলো দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন—এগুলো এত যত্ন করে কি লাভ হচ্ছে? এর চেয়ে বরং যদি দুচারটে লংকার গাছ পুঁতে দিতে তাহলে ভাতের সংগে খাবার জন্য দুটো লংকাও খেতে পারতে। কথাগুলো শুনে মনে হল কী নীরস মন্তব্য। এর কিছুদিন বাদে আমার এত যত্ন সত্ত্বেও গোলাপ গাছগুলো হলদে হয়ে মরে যায়। ভাবলাম, গোলাপ গাছটি ব্যবসায়ীর সেই নিষ্ঠুর মন্তব্য শুনে অভিমানে প্রাণত্যাগ করল।

আমার এই অস্থির মনটা এরকমভাবে যখন উথাল পাথাল করছিল, তখন আমি একদিন পড়লাম প্রেমে—না বললেও হবে যে একজন সুন্দরীর। হায় কী চোখ, কী মুখ, কী চুল। আহা কী রূপ। ভাবলাম, এই জিনিসটাকেই আমি খুঁজে বেড়িয়েছিলাম এতদিন ধরে।—তখন কবির গান আমার মুখ দিয়ে বেরোল—

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাইগো।

আমার হৃদয়ে ভাবের জোয়ার এল। রূপসীর সামনে নিবেদন করলাম—

তোমার সকলি ভাল লাগে
ওই রূপরাশি
ওই খেলা, ওই গান, ওই শুধু হাসি

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে !

কিন্তু রূপসী নীরব। অথচ রূপসীর মুখের ভাব-ভঙ্গীতে আমার সব কিছু নিবেদনের সাড়া পাই। যা হোক নির্বাক কন্যার উদ্দেশে তখন ইংরাজী, বাংলা, অসমীয়া এইতিন ভাষায় প্রেমের কবিতা রচনা করে আমার ক্লাসের নোটবইটা ভরে ফেললাম। তেতলার ছাদে একলা একলা বসেই ইংরাজী গান করি—

Her hands are white as snow
O white as snow !
O Brignal banks are wild and fair
Greta woods are green !

একদিন যখন গাইছিলাম **Her hands are white as snow,** তখন পিছন থেকে এসে একজন জিজ্ঞাসা করল, কি বরুয়া মশায়, কার হাত বরফের মতো সাদা ? আমি চমকে উঠে লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। কিন্তু তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য কথা পাড়লাম।

এর পরে মনে করলাম আমার অমূল্য কবিতাগুলো মাসিক পত্রিকার পাতায় ছাপালে কেমন হয় ? আমার রচিত ইংরাজী কবিতাগুলো কোথায় ছাপাব ঠিক করতে পারলাম না। অসমীয়া কবিতাগুলো ঠিক করলাম, 'জোনাকী'তে পাঠাব। আমার বন্ধুরা আমার এই কবিতা রোগের খবর পেয়ে আমাকে ঠাট্টা তামাসা করবে এই কথা ভেবে তা থেকে নিরস্ত হলাম। একটা ব্যাপারেমাত্র আমি আমার মনের দরজা খুলতে পারি। বাঙলা কবিতা আমি ছদ্মনামে পাঠাতে পারি। দুটি পত্রিকায় দুটি প্রেমের কবিতা পাঠালাম। ছদ্মনাম নিলাম 'শ্রীরঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায'। একমাস পার হল দুমাস পার হল, তবুও আমার কবিতার দেখা নেই সেই পত্রিকা দুটিতে। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। সামনের মাসে বেরুবে এই আশায় দিন কাটাতে থাকি কিন্তু এবারেও বেরুল না।

শেষকালে থাকতে না পেরে সম্পাদক দুজনকে চিঠি দিলাম, আমার কবিতা পেয়েছেন কিনা এবং তা ছাপা হবে কিনা। যদি নাহয় তাহলে আমাকে ফেরত

পাঠিয়ে দিন, কেননা আমি তার নকল রাখিনি। আবার 'পুঃ' বলে লিখে দিলাম যে আমি তাদের কাগজের গ্রাহক এবং হিতাকাঙ্ক্ষী।

একজন সম্পাদক ছিলেন নিশ্চয় বেরসিক। তিনি উত্তর পাঠালেন, 'আপনার কবিতাটি ছাপাইবার অযোগ্য। ফেরত পাঠাইলাম।' অন্যজন যে রসিক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি লিখে পাঠালেন—'আপনার কবিতাটি আমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যত্নপূর্বক রেখে দিয়েছিলাম। সেখান থেকে তুলে নিয়ে আপনার কাছে পাঠাতে কষ্ট হল। পারিলাম না ক্ষমা করিবেন। আপনি নিশ্চয় স্কুল কি কলেজের ছাত্র। কবিতা লিখিবার বৃথা প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগ দিলে বাধিত হইব।' এই উত্তর পেয়ে আমি ভীষণ রেগে গেলাম। রসিক সম্পাদককে যা তা গালাগালি দিয়ে চিঠি দিলাম। চিঠির মর্ম হল এই যে তিনি কাগজের সম্পাদকীয়তা করার উপযুক্ত নন। কারণ তিনি বোঝেন না প্রকৃত কবিতা কাকে বলে। তাঁর পত্রিকাখানিতে যত রাজ্যের অপদার্থ প্রবন্ধের সমাবেশ। কারণ প্রকৃত কবিতার মানে বোঝেন না তিনি। তাঁর পত্রিকার পাতা দিয়ে আমি জুতোর ধুলো মুছি ইত্যাদি। সম্পাদক মহাশয় আমার চিঠির কোন উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি বেশ জব্দ হয়েছেন। চিঠি পেয়ে সম্পাদকের কি হল বলতে পারিনে, কিন্তু এই ঘটনার পর আমি এত দমে গেলাম যে বলা যায় না। অন্যদিকে আমি সেই নির্বাক কন্যাটির মুখ থেকে কথা বের করতে না পেরেও হতাশ হয়ে গেলাম।

এইখানে ঘটনাটা পরিষ্কার করে বলি, আমি একদিন চাঁদনি বাজারে 'ডসন'-এ একজোড়া জুতো কিনতে গিয়েছিলাম। জুতোওয়ালা হয়তো আমাকে ঠকিয়ে বেশ আনন্দিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে আরও ঠকাবার আশায় ওর দেওয়ালে টাঙানো বিলেতের ছাপা একটা ক্যালেণ্ডার দিল। ক্যালেণ্ডারে একটি সুশ্রী মেয়ের ছবি ছিল। সেই ছবির প্রেমে পড়ে তিন চার মাস ধরে আমার পাগলের মতো অবস্থা!

কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীটা অন্যান্য ছাত্রের কিরকম লাগে জানিনে, আমার কিন্তু বড় মুষ্কিল হয়ে গেছল। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমি যেন কিম্ভুত জন্তুর মতো হয়ে গিয়েছিলাম। যাকে ভূচর, খেচর, জলচর, কোনো দলেই ফেলা যায় না। শেলি, বেইন, হিউম, বেন্থাম, কলডর, উড প্রভৃতির

মানসিক এবং নৈতিক দর্শনের কয়েকপাতা নেড়ে চেড়ে আমি যেন মস্ত বড় এক দার্শনিক হয়ে গেলাম। এডাম স্মিথ ও ফসেটের পলিটিক্যাল ইকনমির সূত্র দু একটা মুখস্থ করে আমি হলাম বিদগ্ধ ইকনমিস্ট। ইংরাজ গ্রন্থকারের রচিত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েক পাতা পড়ে বিরাট হিস্টোরিয়ান; বার্কের বক্তৃতাবলী প্রোফেসারের নোটের সাহায্যে লিখে একাধারে রাজনীতিবিদ্ ও পলিটিক্যাল ফিলোসফার; মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বড় কবি হয়ে গেলাম। শেলি, কীটস, রবি ঠাকুরের মতো গীতিকবিতা ও কবিতা লেখার খবর তো আমি আগেই জানিয়ে এসেছি। আমি কথায় কথায় উল্লিখিত গ্রন্থকারদের দোহাই দি। তাঁদের কথা ও মতগুলো আমি পুনর্ব্যক্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি। আমি সব কথায় এত নিজের মতের উপর বিশ্বাস রাখতাম যে আজকাল তা মনে পড়লেও খারাপ লাগে আমার। নিজের মতের অতি আসক্তি ও পরের মতে অসহিষ্ণু হয়ে নিজেকে একটা মস্ত বড়কিছু মনে করতে লাগলাম আর লোকের সব কথায় সমালোচনা করে 'এইসা নাহি হো সেক্তা', আর নিজের মতকেই 'আলবৎ হো সেক্তা' বলে হাত চাপড়াতাম। মোটের উপর এই শর্মা রাজনীতিতে বার্ক, পিট, ফক্স, দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, দর্শনে বেইন, হিউম, বেন্থাম, শেলি, সমাজ সংস্কারে রাণাডে, কেশব সেন, স্ত্রী শিক্ষায় সিডনি স্মিথ, গীতি কবিতায় বায়রণ, শেলি কীটস, টেগোর, আর মহাকাব্যে মিল্টন, মধুসূদন হয়ে মহাকাশে আবির্ভূত হলেন। আমার মনে মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের মতো মহাকাব্য রচনা করার ভাব উদ্রেক হল। একদিন কাগজের পাতা কিছু কিনে এনে আমি সত্যি সত্যি মাইকেলী ছাঁদে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখতে শুরু করে দিলাম। কাব্যের অনেকটা অংশ লিখে ফেললাম। আকাশছোঁয়া কল্পনার সুপুরী গাছের সুপুরীথোকার পাকা সুপুরীগুলির সেই বোঁটাটি কোথায় যে হারালাম আমি তা বলতে পারছিনে, সেইটে আজ খুঁজে পেলে 'মাইওসিন যুগে'র (Miocene Age) এই মহাকবির মহাকাব্যের সুপুরীর বোঁটাটা কিরকম ছিল তার আন্দাজ দিতে পারতাম। শেকস্পীয়রের হ্যামলেট, কিং জন, হেনরী আর মিডসামার নাইটস ড্রিম আমাদের কলেজে পাঠ্য ছিল। মনে করলাম ঐ ধরনের অপূর্ব কয়েকখানি নাটক অসমীয়া ভাষায় আমি রচনা করে অসমীয়া সাহিত্যের ভাঁড়ারে

চিরস্মরনীয় কীর্তি রেখে যাব। এই কথা ভেবে প্রথমে হ্যামলেটের ছায়ায় হেমচন্দ্র নাম দিয়ে একখানা নাটক লেখার মনস্থ করলাম। অভিনেতা অভিনেত্রীদের নামগুলো মনে মনে ঠিক করে নিয়ে প্রথম অংকের দুটো কি তিনটে দৃশ্য লিখে ফেললাম। সেই নাটকটা সেই অবস্থায় রেখে, মিডসামার নাইটস ড্রীমের মতো অন্য একটা নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করলাম। এই নাটকটির নাম স্থির করলাম 'দিনের স্বপ্ন'। এটাও অসমাপ্ত রেখে অন্য একটাতে হাত দিলাম।

শম্ভুচন্দ্র মুখার্জীর 'রেইজ অ্যাণ্ড রায়েৎ' এবং ব্যারিস্টার প্রোফেসার এন এন ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান নেশান' নামের পত্রিকা দুখানার ইংরাজী লেখার স্টাইল আমার খুব ভাল লাগত। দুখানা পত্রিকারই আমি গ্রাহক হলাম, আর তার ইংরাজী বাক্যগুলো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম মুখস্থ করতে। মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে বি. এ. পাশ করে ঐ ধরনের একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করব আর তার নাম দেব 'দি অ্যাসামীজ'। আমি সুরেন্দ্রবাবুর বড় ভক্ত ছিলাম। মহারাণীর বড় নাতি প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের ভারত আগমন উপলক্ষে যখন একটা সৎকার্য করার পরিকল্পনা হচ্ছিল, তখন এন এন ঘোষের ইণ্ডিয়া নেশান, সুরেন্দ্রবাবুর 'লেপার এসাইলাম' স্থাপন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, বাজী পোড়ান ও বাইজী নাচানর প্রস্তাব সমর্থন করতে লাগলেন। তারপর থেকেই এন এন ঘোষের উপর আমার ভীষণ রাগ হল ও তাঁর পত্রিকার উপর আমার যে শ্রদ্ধা ছিল নিমেষের মধ্যেই তা উবে গেল। আমি 'ইণ্ডিয়ান নেশন' কাগজের গ্রাহকের নাম কাটিয়ে দি। শম্ভু মুখার্জীর পত্রিকার বেলাতেও তাই হল। এই প্রসঙ্গে অবান্তর ভাবেই উত্থাপন করছি যে শম্ভু মুখার্জী দিন রাত আফিং-এ বুঁদ হয়ে থেকে তাঁর রেইজ এণ্ড রায়েতের জন্য প্রবন্ধ লিখতে। বেলা দুপুর অবধি তিনি ঘুমিয়ে থাকেন আর বিকেল থেকে রাত অবধি লিখতে থাকেন। এগুলো শোনা কথা, সত্যি মিথ্যে জানিনে। আমার এক একবার মনে খেলত যে শম্ভু মুখার্জীর মতো সুন্দর ইংরাজী লিখতে হলে দু একটুকরো আফিং খাওয়া দরকার। কিন্তু আফিং খাওয়াটা খুব হেয় কাজ বলেই আমার ধারণা, সেজন্য সেকথা মনে আমল না দিয়ে, যা হয় হবে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন এন এন ঘোষের সঙ্গে শম্ভু মুখার্জীকেও বিদায় দিলাম আর আমার ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশে ব্যাপারে সব কথা ফাঁস করে দিলাম আমি।

আমি দর্শন শাস্ত্রের তর্কে এমন তার্কিক হয়ে পড়েছিলাম যে আমার তর্কের ঘুর্ণিবায়ুতে তেত্রিশ কোটি দেবতার সংগে হিন্দুর ঈশ্বর, মাইকেল গেব্রিয়েল এবং মোল্লা মৌলাধরের সংগে হজরত মহম্মদের আল্লা-হো আকবর আর ভার্জিন মেরীর সংগে যীশুখৃষ্টের 'গ্রেট ফাদার গডে'র সিংহাসন উড়ে গিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে থাকতে জায়গা না পেয়ে কোথায় ছিটকে পড়েছিল গিয়ে কোন অসীমে। এই প্রশ্নের জবাব কেউ আমায় দিতে পারেনি বলে, ঈশ্বর যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, তাকে আমার দরকার নেই বলে কথাটা বলে বেড়িয়েছি। কলকাতা শহরে যতগুলো জনসভা হত, সবগুলোতে আমি গিয়ে হাজির হতাম আর বক্তা যেসব মনঃপূত কথা বলতেন সেগুলো একটা নোটবুকে টুকে নিয়ে আসতাম। আর যেসব কথা মনে লাগতনা, সেগুলো মেসের সংগীদের সংগে আলোচনা করে উড়িয়ে দিতাম।

ইংরাজী এটিকেট দুরস্তহীন কোন বাঙালী কারুর সংগে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করেন—'মহাশয়ের নামটা কি?' 'মহাশয়ের নিবাস কোথায়? কি করেন? কত মাহিনা পান,' ইত্যাদি অশিষ্ট প্রশ্ন। অবশ্যি কথাগুলো কোন অসৎ অভিপ্রায় নিয়ে বলেন না, প্রশ্ন করে আলাপ পরিচয়টা জমিয়ে নিতে চান মাত্র। কারণ এতে যে কোন অন্যায় বা অসংগতি আছে এই কথাটা তাঁদের মনে হয় না। নতুন করে সাহেব হওয়া এই লেখক কোন কোন নিরীহ বাঙালী ভদ্রলোককে এরকম প্রশ্ন করতে শুনলে তাকে কিল মারতে উদ্যত হওয়ার কথা মনে আছে আমার। পারতপক্ষে সেজন্যে তিনি রেলে বা ট্রামে চড়লে কোন বাঙালী ভদ্রলোকের সংগে কথা বলতেন না, আর ওরা যদি কথা বলার জন্য এগিয়ে আসতেন উনি এমন মুখ গোমড়া করে থাকতেন যে তাঁরা আর এগুতেন না। একদিনের এক ঘটনার থেকে তাঁর এই স্বভাব আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে-বেলা হাওয়া খাওয়ার জন্য একদিন তিনি গোলদীঘির পাড়ে একটা বেঞ্চে এসে বসলেন। এমন সময় একজন আধবয়েসী বাঙালী ভদ্রলোক এসে তাঁর বেঞ্চের একপাশে বসেন। বাবুটির গায়ে হাতাকাটা ফতুয়া, ও কালো পাড়ের ধুতি ; বুকের ছোট পকেটে সোনার ঘড়ির চেন ; মাথার চুল আধপাকা আধা কাঁচা ও ভাল করে সিঁথি কাটা, হাতে হাতীর দাঁতের পটি দেওয়া লাঠি একটা। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে বলেন— 'তুমি কোন কলেজে পড়? কোথায় থাক, কতদিন বাড়ি যাওনি' আমি অনিচ্ছা

সত্ত্বেও এক একটা উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, আর তিনিও এক একটা করে প্রশ্ন করেই যাচ্ছেন। আর প্রশ্নের সংগে সংগে তিনি আমার দিকে একটু একটু করে এগুচ্ছেন। আমি তখন বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আপনার আর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না, মাফ করবেন মশায়।' আমি সংগে সংগে সেখান থেকে উঠে পড়ি। তিনি তখন 'রাগ করলে কেন, শুনে যাও শুনে যাও' বলে চেঁচাতে লাগলেন। যতই আমি তাঁকে ডাকতে শুনলাম আমি তত জোরে জোরে পা চালিয়ে মেসে গিয়ে পেঁছিলাম। এই ঘটনার প্রায় মাস খানেক অবধি আমি গোলদীঘির ধারে যায় নি।

একবার আমি কলেজের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম। বন্ধু হেমচন্দ্র গোস্বামীও আমার সহযাত্রী। আমার সাহেবী মেজাজের শেষ নেই। গোঁসাইকে সাবধান করে দিলাম তিনি যেন রেলে উঠে কোন বাঙালীর সংগে কথা না বলেন। উনিও বন্ধুর কথা পালন করলেন অক্ষরে অক্ষরে। দুজনেই উঠলাম শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। সেই সময়ে সারাঘাটে দুখানা রেলগাড়ী প্ল্যাটফর্মের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকত কলকাতার যাত্রীদের জন্য। একখানা যায় আসামের দিকে অপরটা দার্জিলিঙে। রাত আটটা কি নটার সময় সেইখানে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে ট্রেনে উঠে দুজনে দুখানা বেঞ্চ অধিকার করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি। আমার বিছানাটা উপরের বাংকে ; আমার তো অতি সাহেবী ধরন ও মেজাজও সেইরকম। গাড়িতে কারুর সংগে কোন কথা টথা বললাম না, গোস্বামীও বেচারা প্রিয়বন্ধুর আদেশে নীরব। সারারাত রেল চলে সকালে থামল একটা স্টেশনে। চায়ের জন্য চোখ মেলে তাকালাম। গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি স্টেশন ? গোস্বামী কি বলল বুঝতে পারলাম না। বাংকের থেকে নেমে এসে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি —একটা অপরিচিত স্টেশন ; নামটা হলদিঘাটা। গোস্বামীকে শুধলাম—এই স্টেশনটা তো আমরা আগে দেখিনি। তিনি দুষ্টুমির হাসি হেসে বলেন— আমাদের যা হবার হয়ে গেছে, আমরা ভুল করে দার্জিলিঙের কাছে এসে গেছি। আমি ঘুমিয়ে থাকতেই তিনি বাঙালী সহযাত্রী দুজনের সংগে কথা বলে তা জানতে পেরেছেন। আমার সাহেবী মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। আমাদের বিপদ বুঝতে পেরে বাঙালী যাত্রী দুজন বলেন, 'আপনারা এইখানে নেমে যান, গাড়ি প্রায় দশ মিনিট দাঁড়াবে।...সময়ে দার্জিলিঙ

থেকে একখানা গাড়ি আসবে। সেই গাড়িতে ফিরে যাবেন। স্টেশন মাস্টারকে আপনাদের ভুলের কথা বললেই স্টেশন মাস্টার 'সার্টিফাই' করে দেবেন, আর ভাড়া লাগবে না।' এই বলে তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের সংগে নেমে এসে স্টেশন মাস্টারকে বলে আমাদের বিনা ভাড়াতে সারাঘাটে ফিরে যেতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা গাড়ির থেকে নেমে স্টেশনে কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে আমাদের সেই উল্টো যাত্রা শুরু করলাম। জীবনে আমার উগ্র সাহেবী মেজাজ এই প্রথম ধাক্কা খেল। এর দ্বারা আমার শিক্ষা হল কি না বলতে পারছিনা, কিন্তু হওয়াটা উচিত ছিল। গোঁসাই কিন্তু পরে অনেক লোকের সামনে আমার এই কীর্তি'র কথা ফাঁস করে মজা করতেন খুব।

আগেই বলেছি পিতৃদেব তাঁর দুই ছেলে গোবিন্দ ও গোলাপকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন। গোলাপদাদা ছিল রুগ্ন। কলকাতায় থাকাকালীন প্রায়ই ওর শরীর খারাপ হত বলে, তিনি ওকে পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিয়ে আসামেই একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন কি না ভেবে দেখছিলেন, সেই সময় একটা বড় ঘটনায় পিতৃদেবের মনকে শক্ত করে দেয়। এমন সময় একটা খবর কানে এল যে দীননাথ বেজবরুয়ার ছেলে গোলাপ লুকিয়ে লুকিয়ে কলকাতার মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ছে। ছেলের এমন অভাবনীয় ব্যবহারে বাবা স্তম্ভিত হন। ডাক্তারী পড়তে হলে মৃতদেহ কাটতে হয়। মৃতদেহ কাটা ছেঁড়া করলে হিন্দুর বিশেষ করে ব্রাহ্মণের জাত যায়—এই মত আর বিশ্বাস আসামে বদ্ধমূল। একসময় বংগদেশেও এরকম ছিল। সেজন্য প্রথম যেদিন বাঙালী হিন্দু ছাত্র সাহস করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল তাকে উৎসাহ দেবার ও সম্মান দেখবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে কামান ছোঁড়া হয়েছিল। সেই ছাত্রটির নাম ছিল মধুসূদন। বাবা যে তাঁর ছেলেদের ডাক্তারী পড়তে দেবেন না এব্যাপারে সুনিশ্চিত এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে ছেলে তেমন কাজ করলে যে চূড়ান্ত অঘটন ঘটবে, একথা ছেলে গোবিন্দ ও গোলাপ ভালভাবেই জানত, সেজন্য তাঁরা এই কথাটি গোপন রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এরকম খবরের মুখ বন্ধ করে রাখা যায় না। বাবা তক্ষুনি গোলাপদাদাকে বাড়ি ফিরে আসার জন্য আদেশ দিলেন। নিরুপায় গোলাপ অবিলম্বে ফিরে এল শিবসাগরে। পিতৃদেব আর ছেলেদের

কলকাতায় না পাঠানো মনস্থির করেন। আর তাকে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে শুদ্ধ করে নেন। পরে গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে গোলাঘাটে একটা ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দাদাকে হেডমাস্টার নিযুক্ত করেন। ফুকন মহাশয় তখন গোলাঘাটে হাকিম। স্কুলের অবস্থা ভাল না হওয়াতে দাদার স্কুল মাস্টারী জীবনের সমাপ্তি ঘটল। পিতৃদেবের সিংদুয়ার আর রাজবারী নামে দুটো চা বাগান ছিল শিবসাগরে। চা বাগান ভাল করে চালাবার জন্য দাদাকে শিবসাগরের বাগানে নিয়ে আসা হল। ওদিকে কলকাতায় গোবিন্দদাদা কি করে তার ভাইকে কলকাতায় এনে ডাক্তারী পড়াবেন তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন যে তিনি স্বাধীন হয়ে রোজগার করতে পারলে আর কারুর জন্য অপেক্ষা না করে তাঁর সংকল্প কাজে পরিণত করবেন। এই ভেবে তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়া ছেড়ে দিয়ে বি এ পরীক্ষা না দিয়ে হাইকোর্টে ট্রান্সলেটরের কাজে ঢুকলেন। মনে জোর নিয়ে তিনি ভাইকে আবার কলকাতায় এনে পড়াবার চেষ্টা করলেন। গোলাপ চা বাগান ভাল করে চালাতে হলে কুলী সংগ্রহ করে আনতে হবে বলে পিতৃদেবকে বুঝিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে গৌহাটি এসে পেঁছায়। গৌহাটিতে দিন কয়েক থেকে সে কলকাতায় চলে আসে। গোবিন্দদাদার ইচ্ছা পূর্ণ হল। তিনি তৎক্ষণাৎ গোলাপকে আবার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেন।

এর পরে গোবিন্দদাদা ভাইকে বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। এই ব্যাপারে পিতৃদেব নিরুপায় অবস্থায় মনমরা হয়ে কাটাতে লাগলেন। গোলাপ পুরো-পুরি ডাক্তার হয়ে আসার আগেই দৈবদুর্বিপাকে গোবিন্দর চাকরি চলে গিয়ে অবস্থা বদলে গেল। এদিকে বিলেতে খরচের অভাবে ভাই কষ্টে দিন কাটায়। তখন পিতৃদেব এবং বড়দাদা ব্রজনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করে গোলাপকে সাহায্য করে, যদিও যথোচিত খরচের অভাবে তার দুঃখ ছিল না। যাই হোক দুঃখ কষ্ট হলেও গোলাপ গ্লাসগো আর এডিনবরা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এল-আর-সি-পি, এল-এফ-পি-সি উপাধি পায়। দাদা ভারতবর্ষে ফিরে না এসে দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গিয়েনার মারা আর দেমেরেরা নামে জায়গাতে গিয়ে সিভিল সার্জনের কাজ নেয়। অনেক বছর ধরে সেখানে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে সে। এই সময় সে বাড়িতে অনেকদিন বাদে বাদে চিঠি পত্র দিতে দিতে পরে

চিঠি লেখা বন্ধ করে দেয়। আমি এণ্ট্রেন্স পাশ করে কলকাতা এসে অনেক কণ্টে তাঁর খবর জোগাড় করে তাঁকে চিঠি দিলাম। চিঠির উত্তরও পেলাম। আমার খুব আনন্দ হল। পিতৃদেব এবং অন্যান্য সবাই আমার কাছ থেকে গোলাপের কথা শুনে আনন্দিত হলেন।

গোলাপদাদা যে শুধু আমাকে চিঠিই লিখত তা নয়, আমাকে মাসে মাসে আমার পড়া খরচের জন্য পঁচিশ ত্রিশ টাকা করে পাঠাত। আসাম গভর্ণমেণ্ট থেকে আমি কুড়ি টাকা করে স্কলারশিপ পেতাম মাসে মাসে। সেজন্য তখন থেকে আমার আয় মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা করে হতে থাকল। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রথম থেকেই আমার মেষরাশির বর্ষফল ফলতে লাগল—আয়, ব্যয়, স্থিতির অবস্থা সুখকর। এই ফলচক্র প্রায় দেড় বছর ধরে বিরাজ করেছিল।

কলেজের তৃতীয় বার্ষিক জীবনে আমার এমন জয় জয়কার অবস্থা। নীতি শাস্ত্রে বলে—

যৌবনং ধন-সম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম।

যৌবনের কথা যদি জিজ্ঞাসা করে কেউ তাহলে বলব কূল উপছে পড়া অবস্থা। টাকা পয়সা তো আছেই—যা আছে তা একটি ছাত্রের জন্য আর কম কি? প্রভুত্বের কথা বলতে গেলে বলা যায় কেউ আমাকে মানুক না মানুক আমি নিজে নিজেই আমার প্রভু। অবিবেচকতা—অর্থাৎ বিবেচকতার অভাবে স্বভাব একেবারে তলিয়ে গেছে। সেজন্য এই অনর্থগুলোর মধ্যে আমি কোন একটাতে দুঃখী কিনা সেকথা আপনারাই বিচার করুন। কিন্তু সেজন্য আমার কলকাতার মতো শহরে জাহান্নমে যাওয়ারই কথা, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি জাহান্নমে যাইনি। আসল কথা, গোড়ার দিকে পিতৃদেবের কঠোর নীতিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষার বন্ধন আমার যে কঠিন ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছে সেই ভিত্তিতে চিড় খাওয়া সহজ নয়। সেই সময়ের আমার সহপাঠী ও সহবাসী ছাত্র বন্ধুরা এই ব্যাপারে সমর্থন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমরা যে মেসটায় ছিলাম সেই ছাত্রাবাসটাকে অনেকে যে তখন ঠাট্টা করে 'পিউরিটানিক' বলত এ কথাটা আমিও জানি।

দ্বিতীয় ভাগ

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

আমার জীবন স্মৃতি, দ্বাদশ বছরের 'বাঁহী' পত্রিকার (১৮৪৪ শক) আশ্বিন মাসের ষষ্ঠ সংখ্যায় লিখতে আরম্ভ করে প্রতি মাসে মাসে প্রায় লিখে, চতুর্দশ বছরের (১৮৪৬ শক) আষাঢ় মাসের তৃতীয় সংখ্যাতে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর লিখবনা ভেবেই আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার কারণ ছিল অবশ্য অনেকগুলো এবং আজকেও যে সেই কারণগুলো দূরীভূত হয়েছে তা নয়। তখন থেকে আজ অবধি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা আমাকে ভীষণভাবে ধরেছেন, 'লিখতেই হবে, না লিখলে আমরা ছাড়বনা'। আমার অতি প্রিয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন 'আমি আবার লিখব' এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে ছেড়েছেন। সেজন্য আবার লিখতে শুরু করে দি। কথায় বলে 'পুনরেব পাপী, পুনরেব দরিদ্র' আমারও পুনরায় লিখতে হল যখন লিখেই ফেলি। আমার জীবন কাহিনী শুনে কারো যদি কিছু উপকার হয় হোক, আমার তাতে আপত্তি নেই। ভূমিকাতে এই কথাগুলো বলে আরম্ভ করা যাক।

কলেজের শেষকাল—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমি কলকাতার অ্যাসেমব্লি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অন্যান্য ছাত্রদের মতো বছর বছর বাড়ি যাওয়ার অভ্যাস ছিলনা আমার। বাড়ির প্রতি যে আমার মমতা কম ছিল তা নয়, বছর বছর বাড়ি গেলে টাকা বেশি খরচ হবে বলেই সেই ভয়ে যেতাম না আমি। আর একটা কারণ—পরীক্ষার পর অবসর সময়ে কলকাতা থেকে কলেজের চার দেওয়ালের বাইরে অন্যান্য উপযোগী জায়গাগুলো দেখে জ্ঞান অর্জন করার বাসনা। কলেজের চার দেওয়ালের ভিতরে কলেজের বই এবং বইয়ের ব্যাখ্যার দ্বারা যে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়না এই সহজ কথাটা উদয় হয়েছিল আমার মনে।

মাসখানেক শিবসাগরের বাড়িতে থাকার পর একদিন আমার নামে একটি টেলিগ্রাম এল। আমার একজন দাদা পথে পিয়নের হাত থেকে টেলিগ্রামখানা নিয়ে দৌড়ে এসে আমায় বলে 'Lakshmi you are graduated'। অর্থাৎ লক্ষ্মী তুমি গ্রাজুয়েট হয়েছ। আমি টেলিগ্রামখানা তার হাত থেকে নিয়ে

পড়লাম তাতে লেখা আছে। 'Lakshminath and Kailas are graduated'। কৈলাসচন্দ্র শর্মা বরুয়া নগাওঁ-এর ছেলে। আমার মনে কি পরিমাণ আনন্দ হয়েছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। পিতৃদেব দুপুরে খাবার পর বড়ঘরের সামনের বারান্দায় পাটী পেতে শুয়েছিলেন। খবরটা তার কানে পেঁছতেই তিনি একলাফে উঠে গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন আর ঠাকুরকে থাপনার সামনে প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে। থাপনা মানে কীর্তন, দশম ঘোষা, রত্নাবলী পুথি রেখে তাতে ঢাকা দেওয়া আছে সোনা আর রুপোর ফুল লাগানো সাদা কাপড় একটিতে। আমাদের ঠাকুর ঘরের পূর্ব দিকে এক কোনায় থাপনা শ্রেষ্ঠ আসনে বসান ছিল। থাপনার ডানদিকে একই সারিতে আলাদাভাবে শালগ্রামসমূহ রাখা ছিল। এর পুজা করতেন পিতৃদেব নিজেই। থাপনার বাঁদিকে একই সারিতে কালো পাথরের বড় কৃষ্ণ মূর্তি একটা রাখা হয়েছিল; এবং মূর্তিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত একজন পুজো করেন প্রতিদিন। চাল মুগ কলার শরাই দিয়ে সব সময় থাপনার সিংহাসনের সামনে রাখা হত। থাপনার সামনে প্রসঙ্গ গাওয়া হত রোজ তিনবার। বাবা যখন পুজো করতেন সেই সময় নামপ্রসঙ্গ যাঁরা গাইতেন তাঁরা হাতে খোল করতাল নিয়ে নাম গাইতে থাকতেন ও অন্যান্যরাও যোগ দিতেন তাতে। বাবার পুজো শেষ হলে ডানদিকে যাঁরা নাম গাইতে বসেন তাঁদের সঙ্গে বসে, কীর্তন ঘোষা নিয়ে গাইতে শুরু করতেন। পিতৃদেব গাইতে আরম্ভ করলে তারপর অন্যান্যরাও খোল করতাল বাজিয়ে সমবেত সুরে গানে যোগ দিতেন। আমাদের বাড়িতে এইটে ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার আর দিনে কমপক্ষেও তিনবার করে এরকম প্রসঙ্গ চলত। এইটাই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

এইবার আগের কথায় ফিরে যাই। পিতৃদেব গোঁসাইঘরে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করার পর, ঠাকুরঘরের বড় ঘণ্টাটি যেটা নাম প্রসঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর বাজান হয়, সেইটে নিজেই বাজাতে লাগলেন। তারপর তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং আমাকে আদর করে আমার মাথা শুঁকতে থাকেন। দেখলাম তাঁর চোখ জলে ভিজে গেছে। পিতৃদেব অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর নিজের ছেলের মৃত্যুশয্যায় বসে ঈশ্বরের নাম করতেও তাঁর চোখে জল কেউ দেখেনি। সেই জন্য এ ব্যাপারটা বড় বেশি দাগ কেটেছিল আমার মনের গভীরে।

সেই সময়ে বি. এ. 'পাস' করাটা ছিল একটা অসাধারণ ব্যাপার। সুবিখ্যাত

জগন্নাথ বরুয়া তখন আসামে বি. এ জগন্নাথ। যদিও আনন্দরাম বরুয়া তার আগেই বি. এ ডিগ্রী পেয়েছিলেন তথাপি আনন্দরাম সিভিল সার্ভিস 'পাস' করে সিভিলিয়ান হয়েছিলেন বলে সেই খ্যাতি তলিয়ে গিয়েছিল আর তাঁর সিভিলিয়ান খ্যাতিটাই ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সেজন্যই আসামে প্রথম বি. এ পাস বলে জগন্নাথ বরুয়া 'বি. এ জগন্নাথ' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আমার আগে অবশ্যি বি. এ পাস করেছিল অনেকে। এবং তাদের সংখ্যা যদিও খুব কম ছিল না, তবুও সেই সময় পর্যন্ত বি. এ পাস পদার্থটা নেহাৎই অপদার্থ ছিল না। আজকাল দুঃখের কথা আর কি বলব? কে শুনবে? সবাই চোখের সামনে দেখেছেন যে এক একজন যুবক প্রাণপাত করে বি. এ পাস করে তিরিশ টাকার চাকরীও একটা যোগাড় করতে পারে না। তখন আসাম গভর্নমেণ্ট বি. এ পাস ব্যক্তিকে নিজে সেধেই সরকারী চাকরী দিত। আর সে যা তা চাকরী নয়—একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যাণ্টের পদ, অবশ্যি প্রবেশনেরি। আমাকে একবার কি দুবার সেই পদ দেবার জন্য সেধেছিল। কিন্তু আমি নিলাম না সেই চাকরী। অবশ্যি না নিয়ে ভাল করলাম কি আহাম্মকী করলাম, আজ আমি বলব না। লোকে আমার স্বভাবের বিষয়ে কি বিশ্লেষণ করে জানিনে, আমি নিজে কিন্তু আমার নিজের বিষয়ে যা আবিষ্কার করেছি সেটা হচ্ছে আমি বড় গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ। স্বাধীনতাহীনতার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেষ্ঠতর বলে আমি সর্বদা মনে করি। আমার তখন অন্তরে এই ভাব খেলত যে, স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করে একমুঠো ভাত খাব, পরের গোলামী করে নয়। তাহলে আমি ডুবে যাব। স্বাধীন ব্যবসায় বা চেষ্টাতে আমি যদি বড় হতে পারি ভালই, তা নাহলে দরকার নেই। স্বাধীন ব্যবসায় করে পেটে ভাতে খেয়ে জীবন যাপন করাটাই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং আজকেও আছে, সেজন্য আসাম গভর্নমেণ্টের চাকরী আমি নিলাম না। বি. এ পরীক্ষা পাস করার পর কলকাতা হাইকোর্টে উকীল হওয়ার জন্য আমি রিপন কলেজের ল ক্লাসে ভর্তি হলাম। অর্থাৎ 'এক ঢিলে দুই পাখী মারার' ফন্দি। আগেই বলতে ভুলে গেছি যে, আসাম গভর্নমেণ্টের দেওয়া চাকরী নিইনি বলে আমার পিতৃদেব ও বড়দাদা গোবিন্দ বেজবরুয়া বড়ই বিরক্ত হয়েছিলেন আমার উপর। কিন্তু গোঁয়ার আবার কার কথা শোনে?

হাইকোর্টে টুইডেল নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উকীল ছিলেন।

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমি তাঁর আর্টিকেল ক্লার্ক হলাম, যাতে বি. এল পরীক্ষাতে পাস করেই হাইকোর্টের উকীল বনে যেতে পারি। আমার দিন কাটতে লাগল আনন্দে। টুইডেল বুড়ো লোক। বুড়ো আমাকে আদর যত্ন করে আইনের কাজকর্ম শেখাতে আরম্ভ করলেন। তার পর, আমার দুঃখর কথা কি বলব তিনি একদিন মারা গেলেন। আমি মাস ছয়েক তাঁর কাছে কাজ শিখেছিলাম। তারপর হাইকোর্টের নাম করা উকিল দিগম্বর চ্যাটার্জীর কাছে গিয়ে তাঁর আর্টিকেল ক্লার্ক হলাম। তাঁর বাড়ি ছিল কলকাতার ভবানীপুরে। আমার ভাগ্যের কথা কি বলব আর? ভাগ্য নিশ্চয়ই খারাপ আর দিগম্বর বাবুর ভাগ্য নিশ্চয়ই ভাল ছিল। তিনি কিছুদিন পরে হাইকোর্টের জজের চেয়ারে উঠলেন। আর আমার ভাগ্য তো দেখাই যাচ্ছে। যাইহোক ইতিমধ্যে বি. এল পরীক্ষার জন্য খুব পড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম আমি।

তখন আমি রোজই যেতাম হাইকোর্টে। হাইকোর্টের জজের আদালতে মোকদ্দমার বিচার, উকীল এবং ব্যারিস্টারের বক্তৃতা আর 'সওয়াল-জবাব' শুনতাম খুব মনোযোগ দিয়ে; কারণ আমার ইচ্ছে হত, আমিও হয়তো এক দিন তখনকার কালের প্রসিদ্ধ ডব্লিউ সি ব্যানার্জী, মনোমোহন ঘোষ, স্যার গ্রিফিথ্ ইভান্স, এল পিউ, আনন্দমোহন বসু হব—অথবা কখনও কখনও হাই-কোর্টে আসতেন যিনি সেই লালমোহন ঘোষ বা উকীলের ভিতরে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস ব্যানার্জীর মতো বিখ্যাত আইনজ্ঞ—তাঁদের মতো যেন হতে পারি। অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার চার্লস পল, স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ফিলিপস, ব্যারিস্টারদের ভিতরে যাঁরা 'বাঘ' (tiger) নামে খ্যাত জ্যাক্সন, ব্যারিস্টার ইভান্সের ভাই ব্যারিস্টার পিউ ইত্যাদির মোকদ্দমা পরিচালনা এবং তর্কাতর্কি আমি উপভোগ করে শেখার চেষ্টা করতাম। তখনকার দিনে নামকরা ব্যারিস্টার মিস্টার এস. পি. সিংহ (পরে লর্ড সিংহ), মিঃ এ. চৌধুরী (পরে স্যার আশুতোষ চৌধুরী জজ), ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এঁরা আমার খুব মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। পরবর্তী কালের হাইকোর্টের নাম করা ব্যারিস্টার বি. সি. মিত্র (পরে স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র) এবং তাঁর ভাই স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ছিলেন আমার সংগী ও সমবয়সী। তিনি অবশ্য আমার ততটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন নি। তখনকার দিনে হাইকোর্টের

'বার' উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশের মতো ছিল আর তার তুলনায় বেঞ্চগুলো ছিল স্তিমিত আলো। সেকালে হাইকোর্টের নানা ঘটনার ভিতরে একটা মজার ঘটনা আজও আমার মনে আছে। হরি চ্যাটার্জী নামে হাইকোর্টের একজন উকীলের সঙ্গে মোটামুটি চেনা ছিল। একদিন হাইকোর্টের দোতলার বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, তিনি আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে এমন করে দেখতে লাগলেন যেন কোন দিনই দেখেন নি আমায়। আমি সে দিকে লক্ষ্য না করেই হেসে হেসে অনর্গল বলে যাচ্ছি কথা। শেষে তিনি আমায় বলেন—'মশায় মাফ করবেন, আমি তো আপনাকে চিনি না। আপনি হয়তো আমাকে মনে করেছেন আমার ভাই, আমার ভায়ের নাম হরি, আমার নাম হর।' এইবলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলাম আর তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবারও সময় পেলাম না। পরে শুনলাম হরি ও হর সত্যি দুজনে যমজ আর দুজনেই হাইকোর্টের উকীল। ঐ রকম ভুল আমার পূর্বে অনেকে করেছিলেন। রহস্যটার আভাস পেয়ে আমার ক্ষুণ্ণ মন তৃপ্ত হল। ভাবলাম, হরিহরের লীলা এরকমই হয়।

এই ঘটনা লিখতে আমার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে সেটা এখন বলছি। সেকালে আমার থিয়েটার দেখার নেশা বেশ পেয়ে বসেছিল। ক্রমেই এত নেশা বেড়ে গেল যে পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের সঙ্গে আমি সমান তালে তাল দিতাম। আজকালের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু তখন দেখেছি পূর্ববঙ্গীয় লোকেরা অনেকে কলকাতায় থিয়েটার দেখতে এসে দু তিনটের সময় শিয়ালদহ রেল স্টেশন থেকে ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সোজা চলে যেত কলকাতার উত্তরাঞ্চলে 'স্টার', 'বেঙ্গল' বা ন্যাশনাল থিয়েটারে। সেখানে টিকিট কিনে বেলা চারটের থেকে বসে (বিশেষ করে শনিবার) একটার পর একটা থিয়েটার দেখে মনের বাসনা মিটিয়ে পরের দিন ভোর বেলা থিয়েটার শেষ হলে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে থার্ডক্লাস ভাড়া গাড়িতে উঠে গঙ্গাস্নান করে আবার শিয়ালদহে গিয়ে তাদের নিজেদের বাড়ির দিকে রওনা হত। আমিও কোন কোনদিন সারা রাত থিয়েটার দেখে পরদিন আমার মেস বা ছাত্রাবাসে চলে আসতাম। এর জন্যে পরে আমি অনুতপ্ত হতাম। দিন পনের চুপচাপ

বসে থেকে, আমার অনুশোচনার ক্ষত যখন শুকিয়ে যেত তখন হয়তো যেতাম আবার একদিন দেখতে।

স্টার থিয়েটারে একজন ভাল অভিনেতা ছিল ; নামটা যে কি তার, ভুলে গেছি আমি, কিন্তু চেহারাটা মনে আছে। তা পদবীর চ্যাটার্জী। চারদিকে আমাকে তখন চ্যাটার্জী'রাই ঘিরে ধরে ছিল। কারণ আমার মনে হত চ্যাটার্জী'রা কাশ্যপ গোত্রের এবং আমারও গোত্র কাশ্যপ। ইংরাজীতে যাকে বলে 'Like attracts like', আবার অসমীয়াতে বলে, 'চোরের পা দেখতে পায় চোর', সেজন্য স্বগোত্র জ্ঞাতি ভাই আমার মন আকর্ষণ না করে থাকে? ঈশ্বরের রাজ্যে কোন প্রাণী ছোটবড় নয়, সবাই সমান। সবার হৃদয়েই একজন পরমাত্মা নানারূপে বিরাজ করছেন। সেইজন্য আমাদের কীর্তন ঘোষায় আছে—

কুকুর শৃগাল গর্দভরো আত্মারাম।
জানি জানি সবাহাংক করিবা প্রণাম ॥

কুকুরের গোত্র কি? অন্যরা না জানলেও আমি জানি। কুকুরের গোত্র কাশ্যপ। কাশ্যপের পত্নীদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কাণ্ঠা, অবিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা আর তিমি। সরমার থেকে সারমেয় অর্থাৎ শ্বাপদেরা সরমার পুত্র। কুকুরও সারমেয়। যতই দূরে থাকুন কুকুরও একদিন গঙ্গাস্নান করে আসতে পারত যদি তার স্বগোত্র জ্ঞাতি ভাইরা তাকে বিরক্ত না করত। এইটে আমার বানানো কথা নয়, আসামে পুরাণ কাল থেকে চলে এসেছে এই প্রবাদ। সেজন্য আমার স্বগোত্র কাশ্যপ গোত্রীয় চ্যাটার্জী জ্ঞাতির সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার রাস্তায় ভুল বোঝাবুঝি হত। তিনি বেশ সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। আর হাসির অভিনয়ের উপর আমার বেশ পক্ষপাতিত্বও ছিল। সেজন্য আমি চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলতাম তাঁর সঙ্গে। একদিন আমার এক বাঙালী বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম শ্যামবাজারে। সেখানে বসে তার সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় অভিনেতা চ্যাটার্জী এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে আমার চেনা আছে ভেবে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেলাম এবং কথার মাঝে স্টার থিয়েটারে তাঁর চমৎকার অভিনযের কথাও উল্লেখ করলাম। আমার কথা শেষ হলে, তিনি আস্তে করে উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনি ভুল করছেন মশায়, আমি অ্যাক্টিং করি না। আমি তো থতমত খেয়ে গেলাম। আমার

বন্ধুটি বল্লেন, সে থিয়েটারে যে অভিনয় করেন সে এর ভাই। ওরা দুই যমজ ভাই। আপনার মতো অনেকেই ভুল করেন এই ব্যাপারে। আমি জিজ্ঞাসা করি ওদের স্ত্রীরা কি করে চিনে বের করে? তখন বন্ধুটি হেসে উত্তর দিল, প্রথম সেই ব্যাপারে অনেক কমেডি অব এরর্স হয়েছিল, তারপর ওদের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দিয়ে সেই ভুলের সমাধান বের করে ফেলা হয়। আমার 'ভ্রমরঙ্গ' নাটকের কামরূপের নিরঞ্জন ও মায়াপুরের নিরঞ্জনের কথা মনে পড়ে গেল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের ইংরাজী সাহিত্য পড়াতেন সুবিখ্যাত চার্লস টনি। তিনি অতি বিদ্বান ও সুবিখ্যাত লোক ছিলেন। সেকালের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যাঁদেরই সম্পর্ক আছে তাঁরা সবাই একথা জানেন। আজকেও কলকাতায় টনি সাহেবের নাম অনেকে ভুলে যায় নি। তাঁর মতো শেক্সপীযার পড়াতে কেউ পারত না। তিনি ক্লাসে এসে চেয়ারে বসে কারুর দিকে না তাকিযেই পড়িয়ে যেতেন একটানা। ভাল ছাত্ররা তাঁর দেওয়া নোট লিখে নিত। যারা ফাঁকি দিত তারা সেই নোট পরে কপি করবে বলে কেউ ঝিমত, কেউ ফুস ফাস করে গল্প করত কেউ বা আকাশ পাতাল ভেবে সমযটা কাটাত। আমি অবশ্যি এই পরবর্তী দলের ছিলাম না। ক্লাসে আমার সহপাঠীদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের দুজন ছেলে ছিল। একজনের নাম ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন তাঁদের সঙ্গে আমার মুখ চেনা ছাড়া বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বিধাতার বিধানে তাঁরা কিছুদিন পরে আমার শ্যালকের স্থান অধিকার করলেন এবং আমিও তাঁদের পরিবারভুক্ত হলাম।

আমি আইন পড়তাম রিপন কলেজে। আমাদের একজন অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত বিদ্বান পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাঁর টাক মাথাটিকে রোদের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ছাতাটা মেলে ধরে ক্লাসে কিরকম ভাবে ঢুকতেন সে কথা আজও আমার মনে আছে। 'হিন্দু ল'-এ অভিজ্ঞ গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এবং গুরুদাস ব্যানার্জীও (পরে জাস্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাদের পড়াতেন মাঝে মাঝে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

আমি বি. এ পাস করার পর থেকেই আমার কাঁধে একটা জিনিস চাপল আরাবিয়ান নাইটসে দেখা বাগদাদের সাউদ সিন্ধাবাদের কাঁধে ওঠা লোকটার মতন। সেটা হচ্ছে বিয়ে। কাব্য আর উপন্যাসে মৌখিক দানপত্রে বিয়ের যৌতুকস্বরূপ দিতে চাওয়া জিনিসগুলো তখন আমার মনকে রাঙিয়ে না দিত, এমন নয়, তবুও যাকে বিয়ের হাওয়া বলে, সেই হাওয়া যে অনেকদিন ধরে আমার গায়ে লেগেছিল তা নয়। বিপদ বুঝে পাগলপারা দক্ষিণের বাতাস যাতে আমার ঘরের দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকতে না পারে তার চেণ্টা করে-ছিলাম অনেক। আমি সঙ্কল্প করেছিলাম যে পড়াশুনা শেষ করে যখন রোজ-গার করতে পারব আর সহধর্মিনীকে খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারব মাত্র তখনই আমি বিয়ের ভাবনা ভাবব। কিন্তু একটা কথা আছে, দশচক্রে ভগবান হয় ভূত। আমাকে সেই চক্রে ফেলে সবাই ভূত বানাতে উঠে পড়ে লাগল। চারদিকে উঠল তখন আমার বিয়ের কথা। স্ত্রীমহলেও আমার বিয়ের জল্পনা কল্পনা, কলকাতা থেকে বাড়ি গেলাম, সেখানেও আমার বিয়ের কথা। বড়ই দুঃখ লেগেছিল আমার মনে যে আমার মাতৃদেবী আমার বিয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তিনিই সেই স্ত্রীমহলের সভানেত্রীর ভূমিকা নিয়েছেন। সোজাসুজি তাঁরা দুর্গ ভেদ করতে না পেরে, স্ত্রীমহলের মাধ্যমে সেই কৌশল অবলম্বন করলেন, কেননা বিয়ের দুর্গভেদে স্ত্রী জাতি যেন জাপানী সেনাপতি জেনারেল নোগি। যাহোক আমি ওদের বিমুখ করে দিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়। কিন্তু ভূত আমার পিছু ছাড়ল না। কলকাতাতে এসে দেখি সবারই আমি বরণীয় হয়ে পড়েছি এবং তাতে বেশ গর্ব অনুভব করে তৃপ্ত হতাম। কিন্তু ক্রমেই অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল, যদিও আমি মনে বল নিয়ে বিয়ের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেলাম। যিনিই আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব বা আভাস নিয়ে আসেন, তাঁকেই সোজা 'করব না' বলে দি। এরকমভাবে 'না' বলতে শিখেছিলাম আমার মনপুর দাদার কথায়। আমার জীবনস্মৃতি পড়বেন যে পাঠকেরা তাঁরা হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন মনপুর দাদা আবার কে?

এই দাদা আবার এই কাহিনীর মধ্যে এসে কি করে ঢুকল ? উত্তরটা সেজন্য আগে থেকে দিয়ে দি। তার বাড়ি জোরহাটের কাছে সাওখাত মৌজাতে। ছোটোবেলা থেকে সে আমাদের বাড়িতে থেকে ভৃত্যের কাজ করে অর্ধেক চুল পাকিয়ে দিয়েছিল, তবুও দৈবদশায় তার বিয়ে হল না। বয়সে আমাদের চেয়ে চারগুণ বড় ছিল সে, আর আমি তাকে 'মনপুর দাদা' বলতাম। আমার সমবয়েসীরাও তাকে ঐ নামে ডাকত। শেষকালে সে তার ভাগ্যের উপর এমনই বিরক্ত হয়েছিল যে আমি কখনও তাকে বিয়ের কথা বললে সে বলত— আমার বিয়ের দরকার নেই।

গৌহাটির রাধাচরণ বরুয়ার ভাই উমাচরণ বরুয়া তখন কিছুদিন ধরে কলিকাতাবাসী। রাধাচরণ বরুয়া আসাম থেকে এসে কিছুদিন গুপ্তভাবে থেকে আর সি বেঞ্জামিন নাম নিয়ে দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। অনেককালের পরে তাঁকে কলকাতায় দেখা গেল এবং তিনি ভাই উমাচরণ বরুয়াকেও ব্যবসায় সম্পর্কে কলকাতায় এনে রেখেছিলেন। উমাচরণ বরুয়া ছিলেন অত্যন্ত স্নেহবৎসল এবং আমাকে তিনি খুব স্নেহও করতেন। কলকাতার বড় বড় বাঙালী লোকদের সংগে ছিল তাঁদের পরিচয়। মুখার্জী নামে একজন বড়লোকের সংগে তিনি একসংগে পড়তেন এবং তাঁদের বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়। কলকাতার সার্কুলার রোডে একটা ভাড়া বাড়িতে উমাচরণ বরুয়া থাকতেন। তখন তিনি বিবাহিত। আমি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতাম। একদিন বরুয়ার বন্ধু মুখার্জীর সংগে ওর বাড়িতে আমার আলাপ হয়েছিল। তার দিনচারেক বাদে উমা বরুয়া হেসে হেসে আমায় বললেন, 'মুখার্জীর দুটো বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, তাদের জন্য মুখার্জী বর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমাকে দেখে ওর পছন্দ হয়েছে খুব। তিনি তোমার সম্পর্কে সব কিছু জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তাঁর একটি মেয়ের সংগে তোমার বিয়ে দিতে চান। অনেক জিনিসপত্র, টাকা পয়সা দেবেন। তোমার কি মত ?' কথাটা শুনে আমি চমকে উঠি। ভাবলাম, কি বিপদ। বিয়ে নামের দুষ্ট গ্রহটি আমার পিছন ছাড়ছে না দেখছি। আমার কুণ্ঠিটা কাউকে দেখাব না কি ?

বরুয়ার সেই কথাটা আমি হাল্কাভাবে উড়িয়ে দিলাম। যখন তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলেন যে 'মিঞা গররাজী' তখন তিনি 'সহরকা কাজী'র দায়িত্বে ইস্তফা দিলেন। ওদিকে আসাম থেকেও একটার পর একটা আসতে

লাগল বিয়ের প্রস্তাব। কিন্তু আমি অচল অটল রক অফ জিব্রাল্টার। আইন এবং এম. এ পড়াতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম। তবুও শপথ করে বলছি যে, চব্বিশ পঁচিশ বছরের এই যুবকের কাছে একটার পর একটা করে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকায় মনের ভিতটা কিছু নড়চড় করে উঠেছিল।

হরিবিলাস আগরওয়াল পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সুখের বিষয়, আজও তা আছে। আগরওয়াল মহাশয়ের সঙ্গে একসময়ে আমার বড়দাদা গোবিন্দ বেজবরুয়া প্রায় মহীশূর অবধি সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন সম্ভবত ওঁরই খরচে। আমি কলকাতায় আসার পর তাঁর মেজ ছেলের সঙ্গে আমার এমন বন্ধুত্ব হয় যে তাতে কোনদিন ছেদ পড়ে নি। চন্দ্রকুমার আমার সমবয়সী ছিল। আজ আমরা দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু তাতে কোনদিন বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়নি। দুজনের জীবনেই নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু বন্ধুত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তাতে। কখনও যদি বা ঘটেও, তাতে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস। ইংরাজী সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা এবং প্রধানত অসমীয়া ভাষা আর সাহিত্যের উন্নতির কল্পনাসূত্রেই প্রথমে আমাদের বন্ধুত্ব ঘটে। তার ফলে 'জোনাকী'র জন্ম এবং বিকাশ। কিছুকাল পরে তার যে লোপ সাধন হল, তাতেও আমাদের হাত আছে। মিষ্টভাষী, হাসিমুখ চন্দ্রকুমার প্রথম দর্শনেই আমার মন অধিকার করে ফেলেছিল। ইংরাজীতে 'love at first sight' বলার মতোই। সেদিন থেকে আজ অবধি বন্ধুত্বের তার এক সুরে বাঁধা। তিন কুড়ি বছর লাগে খোলা নষ্ট হতে, সেজন্য আমাদের জীবিত অবস্থায় আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার আর কোনো আশংকা নেই।

কলকাতার বড়বাজারে আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়িটা হরিবিলাস আগরওয়ালার ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা ও বাসস্থান ছিল। তখন কলকাতায় একজন অসমীয়া লোকের অত বড় বাড়ি দেখে আমার মনটা জাতীয় গৌরবে উপচে পড়েছিল।

চন্দ্রকুমার হরিবিলাস আগরওয়ালার মেজ ছেলে। সেজন্য বাড়িতে সবাই তাঁকে 'মাজিউ' বলে ডাকে, আমিও ডাকতাম ঐ নামে। আমার মুখে 'মাজিউ' ও তাঁর মুখে 'বেজ' বলাটা আমাদের দুজনকার মধ্যে নামের আদান প্রদান সমান হয়ে গিয়েছিল। সময় পেলেই আমি দশ নম্বর আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে টুক টুক

করে চলে যাই, আর তিনিও সময় পেলে চলে আসেন আমার কাছে। মাজিউর বাড়িতে সাহিত্যচর্চার উপরেও নানাবিধ আহারচর্চাও চলত, কিন্তু আমার বাড়িতে হ'ত শুকনো সাহিত্যচর্চা—এই ছিল প্রভেদ। কিছুদিন বাদে বন্ধুবর পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামীও আমাদের দলে এসে যোগ দিলেন, আর আমরা তিনজন 'ট্রিনিটি' হলাম—অর্থাৎ এক হয়ে গেলাম।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে মাঝে মাঝে আমি দশ নম্বর আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে যেতে দেখতাম। তিনি হরিবিলাস আগরওয়ালার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে ছেলেরাও তাঁকে ভালবাসত। বৈকুণ্ঠবাবু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করতেন। গোড়ায় আমি জানতাম না যে তিনিই ঠাকুরবাড়িতে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে 'মাজিউ'র সামনে 'পেশ' করেন। তারপরে নানা ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো না বলে সংক্ষেপে বলছি যে, ঠাকুরবাড়িতে আমার বিয়ে একপ্রকার ঠিক হয়ে গেল। সেই ব্যাপারে আমার প্রিয়তম বন্ধু 'মাজিউ' এবং হেম গোস্বামী বিচার বিবেচনা করে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। আর একজন দূর থেকে সাহায্য করেছেন, তাঁর নাম যজ্ঞেশ্বর নেওগ।

যে কন্যাটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হল তাঁর একটি 'ফোটোগ্রাফ' আমার হস্তগত হয়। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও গুণের কথাও আমি শুনেছি অনেক। ঈশ্বর জানেন, আমার মন কেন তাঁকে জীবনের সহচরী ও সহধর্মিণী হিসেবে গ্রহণ করল। তাঁর সেই ছবিটাও আমার বালিশের তলায় রেখে দিতাম আমি। দিন দিন আমার মনের সংকল্প দৃঢ় হয়ে এল। আজকালকার শিক্ষিত যুবক যুবতীরা শুনে আশ্চর্য হবেন যে তখন বিয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের কোন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি বা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি চিত্তাকর্ষণের জন্য মায়ার খেলার অভিনয় করতেও হয়নি; কারণ আমাদের দুজনের এই ধরনের জিনিসের উপর কোন আগ্রহ ছিল না; আগ্রহ থাকলে তাতে কোন বাধা থাকতনা কারণ সেই পরিবারে মর্যাদা, সম্মান ও শালীনতা বজায় রেখে এরকম দেখা সাক্ষাতে আপত্তি ছিল না। ছবিতে আমি তাঁকে দেখলাম সুন্দরী সুশীলা এবং বিশেষ করে তিনি ধর্মপ্রবণা বলে শুনেছি—সেইটেই আমার কাছে যথেষ্ট।

এই পৃথিবীটা যে প্রতারকের পৃথিবী সে ধারণা আমার কখনও হয়নি আর হবেও না জানি! প্রতারক অবশ্য আছে, কিন্তু এত সহজ নয় যে ধর্মী ও ন্যায়বানদের তারা ঠকাতে পারে।

এইখানে কেউ আমার জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, তুমি এর আগে জোর গলায় বলেছ যে, নিজে রোজগার না করলে আর উপযুক্ত না হলে বিয়ে করবে না। আমি বলব ঠিকই বলেছ ভাই, কিন্তু আমি ইচ্ছে করে এমন করিনি বাইরে থেকে দমকা বাতাস এসে আমার মনের সমস্ত ভাবনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস'। ঈশ্বরের ইচ্ছার সামনে আমি তো একটা খড়কুটো! আসামে আমার বিয়ের কথা নিয়ে এত তোলপাড় হয়েছে যে সেই তোলপাড়ের ঢেউ এখানে এসে আমার গায়ে লাগল। সেজন্য আমি বলছি যে ঈশ্বরের ইচ্ছেতে সব হয়। 'There is Divinity even in the fall of a sparrow'—মহাকবি শেকসপীয়রের কথা। অসমীয়া বুড়ো লোকদের কথা—পূর্ব জন্মে যে যার তিল মাসকলাই খেয়ে এসেছে তার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই হবে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবারুণীতে পিতৃদেব আর আমার মাতৃদেবী দুই ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করার জন্য এলেন কলকাতায়। আমি কলেজ ষ্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিলাম এবং সেখানে তাঁরা থাকলেন। তাঁরা কলকাতায় পৌঁছানর পরদিনই আমার ছোটভাই লক্ষ্মণের ভীষণ অসুখ হল আর বারো ঘণ্টার মধ্যেই সে মারা গেল। লক্ষ্মণকে কাঁধে নিয়ে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে দিয়ে আসি। মাতৃদেবী শোকে মুহ্যমান। পিতৃদেব শোকে ম্রিয়মান হলেও ধৈর্য ধরে আমাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন তখন কলকাতায় ছিলেন। ফুকন বেজবরুয়া পরিবারে চিরকালের বন্ধু। তিনি সারারাত লক্ষ্মণের কাছে জেগে ছিলেন। লক্ষ্মণের মৃত্যুতে শোক সহ্য করতে না পেরে গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি যেমন মহিলাদের মতো কেঁদেছিলেন সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কথা আজও আমার মনে আছে। পিতৃদেব যদিও শোক অনুষ্ঠানের বাইরের কাজগুলোতে যোগ দেননি, তবুও আমার আর বুঝতে বাকী থাকলনা যে, তাঁর হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। লক্ষ্মণের মৃত্যুতে তাঁর জীবনের একমাত্র আশার বাতিটি নিভে গেল একেবারে। অন্যান্য ছেলেদের পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে দেখে তিনি তাঁর কাজের পুরানো ধারা আসামের চিরাচরিত শিক্ষা দীক্ষা অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং লক্ষ্মণকে সেই শিক্ষায় বড় করে তোলার মানসে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে সেই লক্ষ্মণের মৃত্যু। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকনকে তিনি

একবার মাত্র বলেছিলেন, আসামে এত দিন ধরে চলে আসা আয়ুর্বেদ বিদ্যা এইবার লোপ পাবে, এইটেই হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বারাণসীতে স্নানাদি কার্য সমাপন করে পিতৃদেব সপরিবারে আসামে ফিরে গেলেন। তার মাসখানেক বাদে আমার বড়দাদা গোবিন্দচন্দ্র বেজবরুয়ার কাছ থেকে একদিন হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেলাম—Your marriage settled with—'s daughter. Come immediately অর্থাৎ অমুকের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছে, এক্ষুনি চলে এস। আমিও উত্তরে টেলিগ্রাম পাঠালাম—My marriage settled with Maharshi Devendranath Tagore's grand daughter মানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনীর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে। এর পরে যে দুদিক থেকে কত টেলিগ্রাম এল গেল তার ইয়ত্তা নেই। শেষের টেলিগ্রামটায় লিখলাম—My marriage will be celebrated tomorrow positively মানে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের এগার তারিখে। আমার বিয়ের এই খবর রংপুর গোলঘাট জোরহাটে কত জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করল তার বিবরণ দিয়ে আর এই লেখা বাড়াবনা। তখন আমাদের বাড়ি থেকে কলকাতার গঙ্গাগোবিন্দ ফুকনকে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন। তিনি যে সে ব্যাপারে কি করেছিলেন—তা আমি জানিনে। তিনি নিমন্ত্রিত হয়েও আমাদের বিয়েতে আসেননি। কিন্তু বিয়ের তিন চারদিন পর তিনি আমাকে ও আমার গৃহিণীকে নেমন্তন্ন করে তাঁর বাড়িতে খাইয়েছিলেন এবং আমাদের দুজনকে আদর যত্ন করেছিলেন খুব। ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথের 'ডেজার্টেড ভিলেজ' বইখানা তিনি আমাকে দিলেন বিয়ের উপহারস্বরূপ। রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়াও সেই সময়ে সস্ত্রীক কলকাতায় ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরাও তাঁদের সঙ্গে ছিল। তাঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু বিয়েতে তো আসতে দেখিনি। তিনি বিয়ের কিছুদিন পর তাঁদের বাড়িতে আমাকে সস্ত্রীক ডেকে খাইয়েছিলেন এবং আদর যত্নও করেছিলেন। তখন কলকাতায় যেসব অসমীয়া ছাত্র ছিল তাঁরা সবাই বিয়েতে এসে ভুরিভোজন করে গেছে।

এই জায়গায় একটা কথা উল্লেখ করা উচিত মনে করছি। কারণ প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো আমি লুকোই নি। হয়তো ছোটখাট ঘটনাগুলো মনে না থাকার দরুন তার উল্লেখ নাও থাকতে পারে।

আমি তখন কলকাতার সানকিভাঙাতে ২ নম্বর ভবানীচরণ দত্তের গলিতে ছাত্রদের সঙ্গে 'মেস' করে থাকি। ঠাকুরবাড়িতে যখন বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী একজন আমার বাসায় এসে জিজ্ঞাসা করে—বিয়েতে আমার দিক থেকে কিছু দাবি আছে কিনা অর্থাৎ আমি কত টাকা চাই। আমি এই কথা জানতাম না যে, বাঙলা দেশে মেয়ের বিয়েতে ছেলের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা জিনিস পত্র পণ নেয়। আর সেই টাকা পয়সা দেনা পাওনার একটা মীমাংসা হলে তবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এইটে যে একটা জঘন্য কুপ্রথা তা বাঙালীরাও স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু মুখে স্বীকার করলে কি হবে, কাজে তা চলে আসছে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বি. এ এম. এ পাস করা ছেলেদের মধ্যেও। তার ফলে অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালী সর্বস্বান্ত হয়েছেন। আর কতকগুলো শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে যা খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেছে:। যেমন কিছুকালের আগের ঘটনা স্নেহলতাব আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা। আর সেদিনও চারজন অবিবাহিতা মেয়ে বাবাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি সেই কর্মচারীটিকে উত্তর দিলাম—আসামে অসমীয়া লোকদের মধ্যে টাকা নিয়ে মেয়ে বিয়ে করার প্রথা নেই। অসমীযারা এই প্রথাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আমি বঙ্গদেশের ভিতরে শিক্ষিত সুমার্জিত আর শ্রেষ্ঠ পরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী আছি, কিন্তু বেনের মতো টাকা নিতে রাজী নই।

আমি বিয়ের দিন, হোমের কাছেই প্রথম আমার সহধর্মিনীর মুখখানা দেখেছিলাম। অবশ্য আমাদের বিয়েতে হোমাগ্নি অনুষ্ঠান পালিত হয়নি। কারণ আদি ব্রাহ্ম সমাজমতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। তাতে হোমের অনুষ্ঠান নেই। শালগ্রাম এবং হোমের বাইরে হিন্দু বিবাহের অন্যান্য সব আচারই পালিত হয়।

কেশববাবুর 'নববিধানে' আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত রেজিস্টারী বিবাহ আদি ব্রাহ্মসমাজে নেই। সেইজন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য রীতি-নীতি হিন্দুঘেঁষা বলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আদি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ বলে ঠাট্টা করতেন। আজ অবধি সেন্সাস রিপোর্টে আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা হিন্দু লিখিয়ে গৌরব অনুভব করেন। মহর্ষির

মুখ্য আদর্শ গোড়ার থেকেই এমন ভাবে চলে এসেছে। আদি সমাজ বৈদিক কালের অপৌত্তলিক হিন্দু সমাজের পরিকল্পনায় গঠিত। বেদ আর উপনিষদ তার ভিত্তি। বেদ উপনিষদের সারভাগ গ্রহণ এবং অনাবশ্যক ভাগ বর্জন, অবশ্য অবজ্ঞাভরে বর্জন নয়। যথাবিধি এই মূল ভিত্তি থেকে বেরিয়ে এসে নববিধান আর সাধারণ সমাজ স্থাপিত হল, প্রথমে কেশবচন্দ্র সেন এবং পরে তাঁর সহকর্মীরা যখন এই আদর্শ মেনে নিতে পারলেন না। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজের সঙ্গে আদি সমাজের পনের আনা মিল; আর্য সমাজের সিদ্ধান্ত যে বেদ সর্ববিষয়ে অভ্রান্ত আর হোম সকলের কর্তব্য—প্রধানত এই দুটো ব্যতীত আর সবেতেই অভিন্নতা। আমার বিয়েতে সপ্তপদী গমন, স্ত্রী আচার, শুভদৃষ্টি আর হিন্দু বিয়েতে অনুষ্ঠিত সব বৈদিক মন্ত্রের সমাবেশ ছিল। মোটের উপর সেটা ছিল শালগ্রাম আর হোমবিহীন বিবাহ। বিয়ের বেদীর কাছে প্রথমে আমি আমার ভাবী সহধর্মিনীকে দেখলাম আর তার পরে কাপড়ের ঢাকনার তলায় শুভদৃষ্টিতে।

আমাদের সপ্তপদী গমনের পর ছাদনা তলায় কাপড়ের আড়ালে অন্যের দৃষ্টিপ্রবেশ নিষিদ্ধ, এমন অবস্থায় আমাদের দুজনের শুভদৃষ্টি ঘটলে আমার সহধর্মিনী ফিক্ করে হেসে দিলেন। তাঁর ঐ রকম হাসি দেখে আমার মুখেও হাসি খেলে গেল। ওদিকে আমাদের বরণ করার জন্য সমবেত মহিলারা গাইলেন,

আয় রে আয়   সোনার জামাই
বরণ করি শাঁখ বাজায়ে।
দেখো যেন   যেও নাকো
ছাদনা তলায় মন হারায়ে।

এই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে বিয়ের কিছুদিন পরে আমি একদিন গৃহিনীকে শুধলাম—তিনি বিয়ের দিন শুভদৃষ্টির সময় ঐরকমভাবে হেসে ছিলেন কেন? তিনি আমায় উত্তর দেন, 'বিয়ের অনেক দিন আগেই তোমাকে আমি একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখা মুখটার সঙ্গে তোমার হুবহু মিল আছে দেখে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল!' সন্দিগ্ধ চিত্তের লোকেদের হয়তো কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি। তার কারণ বিয়ের দিন থেকে এবং আজ পর্যন্ত আমি নানাভাবে ও

নানা অবস্থায় দেখে এসেছি তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। আর সবসময়ই তিনি ধর্মভীরু। জোড়াসাঁকো পরিবারে তাঁর সেই সুখ্যাতি ছিল। আমার কথাটা পক্ষপাতিত্বমূলক বলে যাঁর ধারণা, তিনি তা ভাবতে পারেন, আমার খারাপ লাগবে না। আমি আমার জানা কথাটি সবার সামনে খুলে বললাম মাত্র। আমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবের পূর্বে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কৃতী শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়েছিল। প্রত্যেকবারেই তিনি দৃঢ় অসম্মতি জানান। কিন্তু কেন বলতে পারিনে আমার বেলায় এক কথায় সম্মতি দিয়েছিলেন। অথচ তিনি আমাকে আগে কখনও দেখেননি। এই প্রহেলিকার অর্থ খুঁজে বেড়ান আমার সাধ্যের অতীত। আমি শুধু এই এই কথা জানি প্রকৃত বিবাহ শুধু পার্থিব বস্তুর পার্থিব মিলন নয়। সেটা হচ্ছে দুই আত্মার আধ্যাত্মিক মিলন। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায তা সংঘটিত হয়। বিয়ের আগে আমিও যখন তাঁর ফোটোগ্রাফ দেখি তখন আমার মনে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে যায় আর মনে হয় এ যেন আমার অনেক দিনের চেনা। কথাগুলো অবিশ্বাস করার কারুর ইচ্ছে হয় হোক, কিন্তু আমি জানি এ ধ্রুব সত্য।

বিয়ের তিনদিন পরে আমি ২ নম্বর ভবানীচরণ দত্ত লেনের বাড়িতে ফিরে এলাম এবং আগের মতোই থাকতে লাগলাম। আমাকে ফিরে আসতে দেখে আশ্চর্য হল আমার সঙ্গী সাথীরা। কারণ ওঁরা ভেবেছিলেন খাঁচার থেকে বেরিয়ে যাওয়া এই পাখিটা ফিরে আসবেনা আর। অর্থাৎ আমি শ্বশুরালয়ে বাস করব এই কথাটা তাঁরা ভেবে বসেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের জামাই সম্পর্কে ওঁদের এরকম ধারণা হওয়াটা আশ্চর্যের কথা নয়। আমি এসে দুই হাত বাড়িয়ে তাদের আলিঙ্গন করলাম, ভাবটা এই আমি আগে তোমাদের কাছে যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি।

আগেই বলেছি, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের এগার তারিখে আমার বিবাহ হয়। তখন ঠাকুর পরিবারের মুকুটমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে ছিলেন। তিনি নিজ বাড়ি জোড়াসাঁকোতে না থেকে পার্ক স্ট্রীটে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়িতে তখন তাঁর বৃহৎ পরিবার—ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনী প্রভৃতিতে ভরপুর। ঠিক যেন একটা বড় মৌচাকে মৌমাছির ভীড়। পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে

মহর্ষির সঙ্গে ছিলেন তাঁর বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি সুবিখ্যাত দার্শনিক; 'অশ্রুমতী' 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক রচয়িতা এবং প্রথমে কলকাতায় স্বদেশী জাহাজ যিনি চালান সেই মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মহর্ষির বিধবা বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহর্ষির ছোটছেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে বিশ্ববিখ্যাত কবি), চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধবা পত্নী আমার শ্বাশুড়ী। তাঁর তিন ছেলে হিতেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র, ঋতেন্দ্র আর মেয়েরা তাঁর সঙ্গে ছিল সেখানে। সৌদামিনী দেবীর পুত্র সত্যপ্রকাশ গাঙ্গুলী সপরিবারে সেই বাড়িতে এবং মহর্ষির একজন জামাই যদুনাথ মুখার্জীও সপরিবারে সেখানে বাস করত। দুর্গের মতো সেই বিরাট বাড়িটা সাজ সজ্জা, দারোয়ান, নায়েব, কর্মচারী নিয়ে তখন এক বিরাট ব্যাপার ছিল। মহর্ষির জমিদারীর কাছারীও সেই বাড়ির ভিতরে। মহর্ষির পরিবারের গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর ভাই সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে ছিলেন।

অনেক বছর বাদে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে এই বিবাহ। সেজন্য এই বিবাহ পরিবারের সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল আর সবার কাছ থেকেই আমার আদর যত্ন লাভ হয়েছিল বেশ। সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার এ. চৌধুরীর (পরে কলকাতা হাইকোর্টের জজ স্যার আশুতোষ চৌধুরী) সহধর্মিনী প্রতিভা দেবী আমার স্ত্রীর আপন দিদি। প্রতিভা দেবীর বিয়ের পর প্রায় আটাশ বছর বাদে আমাদের বিয়ে হয়। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সুবিধে করে দিয়েছিল অনেক ব্যাপারে। চারদিক থেকে নিমন্ত্রণ, পার্টির ডাক আসতে লাগল। মহর্ষির সেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ দিকে ব্রজতলা বা বির্জিতলা নামে জায়গাতে আলাদা এক প্রকাণ্ড বাড়িতে বাস করতেন। রোজ বিকেলে এবং সন্ধ্যেবেলায় হাইকোর্টের জজ, ব্যারিস্টার এবং অন্যান্য বড়লোকদের সমাগম হত সেখানে। টেনিস খেলা, সঙ্গীত, পার্টি ইত্যাদি সেখানে দৈনিক ব্যাপার বলা যায়। সেখানে আমার সর্বদাই যাতায়াত ছিল।

এইখানে একটা কথা মনে পড়ে গেছে, বলে ফেলি। তখন বিলেতের 'কুপার্স হিল' কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বলিনারায়ণ বরা কলকাতায় ছিলেন। তখন তিনি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, কি তার আগে এসেছিলেন আমার মনে নেই। তাঁর সংগে মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয়েছিল। বরা মহাশয়ও মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। 'মেজ মা' অর্থাৎ মিসেস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসমীয়া বরার সংগে তাদের নতুন জামাইকে একসংগে মিলিত করার জন্য একদিন এক বড় 'ডিনার পার্টি''র আয়োজন করে বরা মশায়কে নিমন্ত্রণ করলেন। বরা নেমন্তন্ন গ্রহণ করে আসব বলে এলেন না। ডিনারের সময় পার হয়ে গেল, সব অতিথিরা তাঁর অপেক্ষায় আছেন, কিন্তু উনি এলেন না। মিসেস ঠাকুর অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হল ভেবে। আমার মনে অবশ্য তখন অন্য কথা খেলেছিল, কথাটা ভুলও হতে পারে হয়তো। বরা মহাশয় বিলেতফেরত গভর্নমেণ্টের উর্ধ্বতন কর্মচারী, আমি সামান্য একটা কলেজের স্টুডেণ্ট। পরে হয়তো বরা মহাশয় মিসেস ঠাকুরের উদ্দেশ্যর কথা বুঝতে পেরেই এলেন না। আবার বলি, হয়তো আমার অনুমানটা ভুলও হতে পারে।

আগেই বলেছি মহর্ষি তখন পার্ক স্ট্রীটে ছিলেন। বিয়ের পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমরা দুজনে তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে গেলাম। তিনি আমায় আশীর্বাদ করে আমায় একটা সোনার কলম দিলেন। তারপর আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার এই কলম থেকে সুনিপুণ লেখা বেরুবে।' নাতনীর মাথায় হাত দিযে আশীর্বাদ করে হাতে সুন্দর গোলাপ একগুচ্ছ দিয়ে বললেন, 'তোমার যশ সৌরভ এই ফুলের সৌরভের মতো চতুর্দিকে বিস্তার হবে।'

ঈশ্বর জানেন প্রকৃত ঋষিতুল্য এই মহাপুরুষের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে ফলেছিল কি না।

অনেক দিনের পরে সেই বড় পরিবারে এই ধরনের বিয়ের ঘটনার সাড়া পরিবারের শিক্ষিত মার্জিত যুবকদের মনে অনেক দিন ধরে জেগেছিল। তাঁদের ভিতরে নতুন নতুন কাজের প্রতি উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তার দুচারটের কথা আজ বলব। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' নামক নাটক হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে। কবিবর তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রের সংগে সেই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মেয়েদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদুষী গ্র্যাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, ভারতীর সম্পাদিকা মহর্ষিকন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্র্যাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল এবং ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য মেয়েরাও ছিল। প্রজ্ঞা তখন বিবাহিতা বলে আমার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, আমি আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিয়েছিলাম। অভিজাত শ্রেণীর দর্শকের দ্বারা সভা পরিপূর্ণ হয়ে যেত। অভিনয় দেখে এবং তারপরে আহারাদি সমাপন করে পরম তৃপ্তি লাভ করে সবাই বাড়ি ফিরত।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা মিলে 'সুহৃদ সমিতি' নাম দিয়ে একটা সমিতি করলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমরা সবাই ছিলাম সেই সমিতির সভ্য। বাইরের দুচারজন শিক্ষিত বন্ধুকেও সেই সমিতির সভ্য করা হয়েছিল। সভার উদ্দেশ্য—সভ্যদের মধ্যে প্রীতি বাড়ানো। উপায়—সাহিত্য চর্চা এবং মধুর প্রীতিভোজন। সমিতির অনেকগুলো অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে সভ্যদের দ্বারা রচিত ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচনা পাঠ করা হত এবং তার সমালোচনাও করা হত। এর থেকেই বাংলা মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'র জন্ম। তার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হল সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কিছুদিন পর সুধীন্দ্রনাথের স্থান নিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করল 'সাধনা'। কিছুদিন পর 'সাধনা'ও বন্ধ হয়ে যায়। সমসাময়িক না হলেও আগে পরে সেই পরিবার থেকে আর একটি মাসিক পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। তার মূলে ছিলেন হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদিকা ছিলেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। বছর খানেক বাদে সেই কাগজখানিও লুপ্ত হল।

শ্বশুরবাড়ির এই সাহিত্যিক মহিলা আর পুরুষেরা অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষার পার্থক্য এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন ধীরে ধীরে। তাঁরাই এগিয়ে এসে আমাকে তর্ক যুদ্ধে নামাতেন। বাধ্য হয়েই আমায় যোগ দিতে হত, কিন্তু সাধারণত এই রকম অপ্রীতিকর তর্কাতর্কিতে আমি যোগ দিতে চাইতাম না। তাঁরা মনে করতেন পূর্ববঙ্গের ভাষা যেমন বাংলা ভাষারই একটা অঙ্গ অসমীয়া ভাষাও তেমনি। তাঁদের ইচ্ছা যে, আমি অসমীয়া ভাষায় লেখার চেষ্টা না করে বাংলা ভাষাতে লিখতে শুরু করি। গোড়ায় গোড়ায় তাঁদের এমন একটা মনোভাব

ছিল যে, আমি তাঁদের পরিবারভুক্ত জামাই বলে আমার সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁরা বুঝতে পারলেন আমার সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটা ভুল। আমি তাঁদের নিরাশ করলাম। আমার সাজ পোষাকও তাঁদের পরিবারের প্রচলিত সাজ পোষাক নয়। অসমীয়া ভাষার জন্য আমার এত দরদ দেখে তাঁদের মন ভেঙে গেল। রোজ রোজ ভাষা সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে এই তর্ক বিতর্ক বেড়েই চলতে লাগল আর এই যুবকদের নেতা 'রবিকাকা' অবস্থা বিষম দেখে মৌনাবলম্বন করলেন। তখন থেকে আজ এই বুড়ো বয়স অবধি ঠাকুরমশাই তাঁদের এই পোষ না মানা জামাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা ছেড়ে দিলেন। একবার শিলঙে তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন মাত্র, 'তোমরাই তো আসামকে বার করে নিয়ে বাংলা ভাষার পরিসর কমিয়ে দিলে। বই লিখে ছাপাতে গ্রন্থকারদের আর উৎসাহ থাকে কোথায়?' তিনি আমার গুরুজন। কোন তর্ক না করে চুপচাপ থাকলাম। কারণ সেরকম অপকর্মই যদি হয়ে থাকে তা আমার একার দ্বারাই হয়নি শুধু; আমার সঙ্গে অনেক বিক্রমশালী যোদ্ধা আছে; আমি তাদের মধ্যে একজন যদিও, অত্যন্ত একটি ক্ষুদ্র যোদ্ধা।

আমাকে পুরোপুরি বাঙালী করবার জন্য আমার সাহিত্যিক শ্যালকেরা এত উঠে পড়ে লেগেছিলেন যে বলতে গেলেও আমার হাসি পায়। এর আগে আমি একটা কথা বলে নিই। আমার সঙ্গে যখন আমার সাহিত্যিক শ্যালকদের তর্কাতর্কি হতে শুরু হল এবং পরে 'রবিকাকা'র কাছে গিয়ে পৌঁছাল, তখন শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যেও একটি ছোট খাট তর্কযুদ্ধ বাধল। তার পরে মুখের তর্ক বন্ধ হলে রবিকাকা 'ভারতী' পত্রিকায় অসমীয়া ভাষার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে লিখলেন এক প্রবন্ধ। আমি তার প্রতিবাদ লিখে 'ভারতী'তে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। 'প্রতিবাদ'টা ভারতীতে ছাপা হয়। ওদিকে 'পুণ্য' পত্রিকাতেও আমার প্রতিবাদ বেরুল। এরকম ভাবে তর্কযুদ্ধের শেষ হল। আমার স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনগণ হয়তো আমাকে জেব্রা জাতীয় একটা জানোয়ারই ভেবে বসে রইলেন।

এই প্রসঙ্গে ভীষণ একটা মজার এবং হাসির কথা বলি। 'পুণ্য' কাগজে প্রকাশিত আমার নামের সঙ্গে বেজবরুয়া উপাধিটা তাঁরা বদলে দিয়ে 'বিদ্যাবর্য' করে ছাপিয়েছিলেন। আমি তাতে হেসেছিলাম খুব। মোটের

উপর কারো সংগে খাপ খাওয়াতে না পারা এই লোকটি সবাইকে নিরাশ করল।

বিয়ের দুমাস বাদে আমি একলা আমার শিবসাগরের বাড়িতে গেলাম। পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী আমাকে পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের হারানো রতনকে ফিয়ে পেয়ে তাঁরা বুকের মধ্যে জড়িযে ধরলেন। যদিও তাঁরা আমার ব্যবহারে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন কিন্তু আমাকে পেয়ে সব ভুলে গেলেন। পিতৃদেব যদিও প্রাচীনপন্থী এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন তবুও তাঁর একটা মহৎ গুণ ছিল। তিনি সব কথাই গভীরভাবে চিন্তা করে নিজের মনেই তার বিশ্লেষণ করে পরে উদার ভাব অবলম্বন করতেন। সেজন্য তাঁর সংগে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের সংগে আমার বিয়ের কথা উঠলেই তিনি উদার মত প্রকাশ করতেন, সেটা আমার নিজের কানেই শুনেছি। মাতৃ-দেবী বড় সাদাসিধে ছিলেন। তিনি আমাকে ফিরে পেয়ে যেন তাঁর হারানো মাণিককে ফিরে পেয়েছেন মনে হল। আমার বিয়ের কথা শুনে তিনি শিবসাগরের কালীপ্রসাদ চলিহা প্রভৃতি বড় উকীলদের ডাকিয়ে কলকাতার ঠাকুর পরিবারের উপর মোকদ্দমা এনে ক্ষতিপূরণের দাবির সংগে তাঁর ছেলেটাকেও কি করে দখল করে নেবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ঠাকুরবাড়ির লোকেরা তাঁর বুক থেকে ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নিয়ে তাদের ঘর জামাই করে নিযেছেন। সেজন্য এই অন্যায়ের প্রতিকার করতেই হবে।

আমাকে ঘর জামাই করার বিষয়ে একটা ইতিহাস ছিল অবশ্য। আমার কয়েকটি বন্ধু মাকে এই কথাটা লাগিয়ে দিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিল। ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম শিবসাগর পেঁাছেই মায়ের কাছ থেকেই। কে বলেছিল তাঁদের নাম আমি বলব না, কারণ তাঁরা আজ ইহজগতে নেই। মা বলেছিলেন, 'যেদিনই তোর বিয়ের তার শিবসাগরে এসে পেঁাছল, কথাটা ছড়িয়ে গেল চারদিকে। তোর বাবা আর আমি শোকে ভেঙে পড়লাম! শহরের চারদিকে সবাই আলোচনা করতে থাকে এমন কি বাঙালীপটিতেও তুমুল আন্দোলন চলল। কলকাতার ঠাকুরেরা বাঙালীর মাথার মুকুট। এই হেন ঠাকুর-বাড়িতে একজন অসমীয়ার সংগে বিয়ে। নানা কথা চলতে লাগল। আমাদের কালীপ্রসাদ চলিহা শিবসাগরের সিভিল সার্জেন কলকাতার বাঙালী হেমচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলেন কথাটার সত্যতা সম্পর্কে জানতে। ব্যানার্জী চলিহাকে বলেন, কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে অনেক ঘর ঠাকুর আছে, তার কোন একটা পরিবারের সামান্য কারু একজনের সংগে হয়তো বিয়ে হয়েছে। কালীপ্রসাদের কথাটা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেব আরও বলেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনীর সংগে বিয়ে হলে নিশ্চয় সে ঘর জামাই হয়েছে, নাহলে বিয়ে হওয়া অসম্ভব।'

এর কিছুদিন পরে শিবসাগরের কয়েকটি অসমীয়া ছাত্র কলকাতা থেকে ফিরে এলে, মা তাদের ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করেন আমার কথা। একটি ছেলের আমাদের পরিবারের সংগে সম্পর্কও আছে। সে মাকে বলে, লক্ষ্মীনাথ ঠাকুরবাড়ীতে ঘর জামাই হয়েছে সত্যি, যদিও সে সেই কথাটা লুকোবার জন্য মাঝে মাঝে মেসে এসে থাকে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে গেলে দারোয়ানের কাছে কার্ড পাঠিয়ে না দিলে তাকে ভিতরে যেতে দেয়না। ভিতরের থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয় বাইরে।

এই সংবাদদাতা বন্ধু আজ আর ইহ সংসারে নেই। তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমার পাত্র।

অনেক দিন পরে আমি আমার একজন বাঙালী বন্ধুকে নিয়ে সকাল নটা নাগাদ শ্যামবাজারের দিকে হেঁটে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। বন্ধুটি দূর থেকেই আমায় আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ঐটা ডাক্তার হেমচন্দ্র ব্যানার্জির বাড়ি। তিনি আপনাদের শিবসাগরে সিভিল সার্জেন ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে এখানে এসেছেন। আমার কৌতূহল হল, এগিয়ে গিয়ে তার বাড়ির ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম। আমি দেখলাম, ভুঁড়িওয়ালা বাঙালী একজন খালি গায়ে পৈতে গলায় ঝুলিয়ে ঘরের দোর গোড়ায় বসে চাকরকে দিয়ে তেল মাখাচ্ছে। বন্ধুটি বলল, 'ঐ হেমবাবু।' ইনিই কি সেই শিবসাগরের ফিটফাট ব্যানার্জী সাহেব! সেখানে ওর সাহেবিয়ানা য়ুরোপীয় সাহেবকেও হার মানিয়েছিল।

আমার বিয়ের মাস ছয়েক পর একদিন আমার গুরুদেব হেডমাস্টার চন্দ্র মোহন গোস্বামীর সংগে দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাকে স্নেহভরে বলেছিলেন, 'তুমি ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে করেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু নিজের বংশের সম্মান ঠিক রেখে চল। তুমি তাঁদের বলে দিও, তোমরা যেমন বেংগলে বড়লোক, আমরাও আসামে তেমনই। কোন বিষয়েই হীনতা স্বীকার কর না।'

গুরুদেবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করলাম। উঁচুস্তরের বাঙালীর অন্তর কত মহৎ।

শিবসাগর থেকে জোরহাটে গেলাম। সেখানে মুর সাহেব ছিলেন সাব-ডিভিসনাল অফিসার। এই মুর আমার পিতৃদেবের হাতেই তৈরী হয়েছিলেন। তেজপুরে পিতৃদেব যখন, একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার হয়েছিলেন, তখন মুর তাঁর অধীনে কাজ করতেন। সাদা চামড়ার উন্নতি হয় তাড়াতাড়ি। আমি শিবসাগরে ফিরে এসেছি শুনে মুর সাহেব জোরহাটে আমার দাদাকে বলেছিল, 'দেখ সেই ছেলেটা আবার ফিরে এসেছে, এখানে এলে আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিও।' দুঃখের বিষয়, আমি জোরহাটে গিয়েছিলাম কিন্তু মুরের কাছে যাইনি।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

[এই অধ্যায়ের কথা বলার পূর্বে আগের অধ্যায়ের ভিতরের একটা কথা জানতে পেরেছি শ্রীমান জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন—

'আপনার বিয়ের সময় আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার দাদা করুণাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে উত্তর পশ্চিম ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমার দিদি স্বর্ণলতাকে মেয়েদের সঙ্গে কলকাতার ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর বাড়িতে রেখে আর আমাকে আর মেজদা কমলাকে তখন কলকাতায় মাণিকচন্দ্র বরুয়ার বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন তাঁরা। কমলা আর আমি আলাদা ভাবেই আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ কার্ড পেয়েছিলাম আর পেয়ে আনন্দও হয়েছিল। আপনি আমাদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন দেখে আমরা দুজনে খুব মজা পেয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত কনকলাল বরুয়া (রায়বাহাদুর) এবং কাপ্টেন ভুবনচন্দ্র বরুয়ার সঙ্গে আমি সানুকিভাঙা থেকে আপনার বিয়েতে উপস্থিত হলাম। আপনার লেখাতে আছে যে আপনার বিয়েতে বাবাকে আপনি দেখতে পাননি। কথাটা পরিষ্কারভাবে না জানলে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে বিয়েতে আমার বাবার সম্মতি ছিল না বলে তিনি বিয়েতে যাননি। সেটা একেবারেই সত্যি নয়। বরং এই বিয়ের সম্বন্ধে খুব খুশিই হয়েছিলেন বাবা।'

এই সংশোধনটি আমার জীবনস্মৃতিতে ঢুকিয়ে দিলাম খুব আগ্রহের সঙ্গে। —লেখক।]

কলেজ বন্ধ হলে দুনম্বর ভবানীচরণ দত্তের গলিতে সেই মেসটা ভেঙে গেল আর মেসনিবাসী ছাত্ররা নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন মহাশয় আমাদের সেই মেসবাড়িটা বাড়িওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়ে নিজেই ভাড়া নিলেন থাকবার জন্য। তখন মাস পুরো হয়নি বলে, আমাদের বাড়ির বাকী ভাড়াটা তাঁর হাতেই দিলাম যাতে তিনি সম্পূর্ণ মাসের ভাড়াটা একসঙ্গে বাড়িওয়ালাকে দিতে পারেন। তারপর থেকে আমি আর মাজিউ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার শোভারাম বসাক লেনের একটা বাড়িতে

কয়েকটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে লাগলাম। বাড়িটা দোতলা। নীচের তলায় চাকর বাকর ছিল আর ওপরের তলায় ছিলাম আমরা। ওপরে তিনটে ঘর; নীচেও তেমনি। ওপরের ঘরগুলোর সামনে লম্বা একটা বারান্দা, নীচের ঘরগুলোর সামনে উঠোন আর উঠোনের পরে রান্নাঘর। আমাদের দুটো ঘরেই হয়ে যাচ্ছে দেখে আর একটা কামরা আমরা ভাড়া দিলাম এক ভদ্রলোককে। নাম তাঁর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি কলকাতার মর্টন স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁর বাড়ি ছিল এই বাড়িটার কাছেই। ঘরটা তিনি থাকবার জন্য নেননি—নিয়েছিলেন অন্য কারণে। দিনে দুবেলা তিনি এই ঘরটাতে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। 'ম-কথিত' নাম দিয়ে তিনি পাঁচখণ্ডে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পুস্তক রচনা করেছেন। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও নির্মল চরিত্রের। আমার সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্বও হয়েছিল।

কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা কলকাতা ছেড়ে পাটনায় বি. এ পড়তে গেলেন। তাঁর ঘরটি বন্ধ ছিল, মাঝে মাঝে তাঁর পিতৃদেব হরিবিলাস আগরওয়ালা এসে থাকতেন সেখানে। পরে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা (রায়বাহাদুর) সেখানে থেকে পড়তেন কলেজে। 'মাজিউ' ও আমি পরে 'জোনাকী' পত্রিকাখানি চালিয়েছিলাম। মাজিউ পাটনায় চলে গেলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালার সাহচর্য পেলাম। ৺লক্ষেশ্বর শর্মা কিছুদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমাকে সাহায্য করতেন অনেক।

মাস কয়েকবাদে মহেন্দ্রবাবু তাঁর ঘরটা ছেড়ে দিলেন। ভোলানাথ বরুয়া (বি বরুয়া) সেই ঘরটা ভাড়া নিলেন। আমাদের সঙ্গে হরেন্দ্রনাথ সেন নামে একজন উকীল ছিলেন মাস চারেক ধরে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডবল এম.এ বি.এল এবং পরে ব্যারিস্টারও হয়েছিলেন বোধ হয়। লোকটি বিদ্বান, কিন্তু বড় রাগী ছিলেন। রাগী না বলে খিট্‌খিটে বললেই উপযুক্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে উঠতে গেলে দিনরাত পড়ে পড়ে বইয়ের পোকা হলে লোকের যা অবস্থা হয়, তাঁরও তেমনই হয়েছিল। কথায় কথায় তাঁর মাথা গরম হয়ে যেত আর চাকরকে তাঁর মাথায় তেল চাপড়ে চাপড়ে তাঁকে হাওয়া করতে হত। তিনি আবার আসামেও কিছুদিন ওকালতি করেছিলেন। রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার তিনি প্রিয় ছিলেন আর তাঁরই সুপারিশে,

আমরা তাঁকে রেখেছিলাম আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর খিট্‌খিটে স্বভাবের জন্য তিনি বেশিদিন আমাদের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। তিনি যাবার সময় তাঁর থাকা খাওয়া খরচের ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কিছু মনোমালিন্যও হয়েছিল। কিছুদিন পরে শুনলাম তিনি বিলেতে চিরকালের জন্য থাকবেন বলে চলে গেছেন।

মানিকচন্দ্র বরুয়ার সঙ্গে ভোলানাথ বরুয়ার যে বড় ব্যবসায়টা ছিল সেটা বন্ধ হলে ভোলানাথ বরুয়া আসাম থেকে চলে এলেন কলকাতায়। আগে আমার সঙ্গে যদিও তাঁর অসমীয়া ছাত্রের মেসে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং আলাপ পরিচয়ও ঘটেছিল কিন্তু একসঙ্গে থাকার জন্য সেই পরিচয় দিন দিন আরও পরিপূর্ণতা লাভ করল। ভোলানাথ বরুয়া লোকটি যেমন হৃদয়বান, তেমন বিচক্ষণ ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। আমি তখনও কলেজ জীবন থেকে একেবারে ছাড়া না পাওয়া নবীন যুবক। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে আমি তাঁর ব্যবহারে খুব মুগ্ধ। দিন দিন তিনি আমার মন জয় করে নিলেন সর্বতোভাবে। সাংসারিক জীবন যাত্রা নির্বাহে তিনি যেন ঝুনো নারকেল আর আমি হলাম কাঁচা ডাব। আমার সম্বল হচ্ছে, কলেজে পড়া পুঁথির বিদ্যার দৌড় আর আকাশচুম্বী অদূরদর্শিতা। তাঁর সম্বল হচ্ছে জীবনযুদ্ধে ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা সংগ্রহ করা অভিজ্ঞতা আর বহুদর্শিতা। এমন বিপরীত-ধর্মাবলম্বী পদার্থের রাসায়নিক সম্মেলন ঘটে ভাল রাসায়নিক পণ্ডিতের হাতেই। যাই হোক, দুজনের মধ্যে, বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হল শীঘ্রই। অসমীয়াতে একটা কথা আছে 'মোষের চেয়েও শিং চড়া'। তখন আমার চেয়েও আমার সাহেবী ধরণটা ছিল আরও উগ্র। সেজন্য বরুয়া মহাশয় প্রথম দিন থেকেই আমাকে 'সাহেব' 'সাহেব' বলে ডাকতে থাকায় আমি আত্মপ্রসাদের গর্ব অনুভব করতাম। 'জোনাকী'তে প্রকাশিত আমার লেখাগুলো পড়ে আগের থেকেই আমার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নিয়েছেন তিনি। এখন আমার সঙ্গে একসঙ্গে থেকে তাঁর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বুঝতে বাকী থাকল না আমার স্বভাব প্রকৃতি। তিনি মজার মজার হাসি ঠাট্টার সঙ্গে তামাসা করে আমার মন জয় করে নিলেন সম্পূর্ণভাবে। আমার বিয়ে সম্পর্কেও তিনি উদার মত পোষণ করাতে আমি তাঁর উপর আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলাম। কারণ তখন

আমার বিয়ের ব্যাপারে নানা মন্তব্য শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা একসঙ্গে দিন পনের থাকার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী। সেই সময়ে আমি আইন পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। পরীক্ষার অল্প কিছুদিন বাকী। পরীক্ষার পড়া একপাশে ঠেলে রেখে দিনরাত সেবা করতে লাগলাম তাঁর। কারণ তখন সেটাই আমার কর্তব্য ছিল বলে বিশ্বাস। দিনরাত প্রায় সব সময়ে তিনি আমায় ডাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাস করতে আমি যে খুব চটপট পারতাম না, সেটা আমার সমসাময়িক সবাই জানত এবং আমার নিজেরও ধারণা ছিল তাই। পরীক্ষায় কোন রকমে টায়টুয়ে পাস করে যেতাম আমি। সেজন্য শেষ সময়ে এমন একটা ঘটনা আমার পক্ষে ভীষণ সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করল ফলে যা হবার তাই হল। আমি বি.এল পরীক্ষায় সসম্মানে ফেল করলাম। বি. এল পরীক্ষায় যেসব ঘটনা ঘটেছে তা এর পরের অধ্যায়ে জানাব। কিন্তু এম. এ পরীক্ষার কথাটা আগে বলে নি। কারণ দুটো পরীক্ষাই ছিল সামনা সামনি। বি.এল-এর পর এম.এ পরীক্ষা দেবার জন্য মনে বল নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু তাতেও ফেল করি। ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ দিয়েছিলাম। আমার অধ্যাপক ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে বিদ্যার জাহাজ টনি সাহেব। এম.এ পরীক্ষার সময় অবশ্যি পড়েছিলাম ভাল করে, কিন্তু কেন যে তাতে ফেল করলাম বলি। সেখানে অ্যাংলো স্যাক্সন নামে অসভ্য একটা সাবজেক্ট ছিল, (অবশ্য আমার জন্য সভ্য) সেজন্য আমি তাকে অগ্রাহ্য করে ছেড়েই দিয়েছিলাম একেবারে। অথচ সেই আমার মাথায় মারল লাঠির বাড়ি। আমি আঘাত পেয়ে টনি সাহেবের কাছে আমার দুঃখ নিবেদন করি। তিনি আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাতেই সমাপ্তি। যে জিনিসটাকে লোকে তুচ্ছ বলে হেয় করে, সেই সবচেয়ে আগে চরম শিক্ষা দেয়। কংস কৃষ্ণকে রাখাল ছেলে বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং তারই হাতে প্রাণ হারায় সে। রাবণ নর আর বাঁদরকে অগ্রাহ্য করায় নর এবং বাঁদরের হাতেই সোনার লঙ্কাপুরী, নিজের কুড়িটা চোখ ও কুড়িটা হাত এবং দশটা মাথা নিয়ে পুড়ে মরে। ওটাই নীতি কথা।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

এই আখ্যান আরম্ভ করার আগে একটা সংশোধন করতে হবে। এইটে আমার গৃহিণীর দিক থেকে উত্থাপিত। তিনি এতদিনে আমার জীবন স্মৃতির দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে ফেলেছেন কিনা জানিনে। আজকে আবার লিখতে শুরু করেছি মাত্র, এমন সময় তিনি আমার পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাকে কে বললে যে আমাদের 'পুণ্য' কাগজখানা মাত্র একবছর চলেছিল, 'পুণ্য' তো তিন বছর ভালভাবে চলেছিল এবং পরে বন্ধ হয়ে গেল।' কথাটা শুনে আমি প্রথমে চমকে উঠি। পরে ভাল করে ভেবে দেখলাম তাঁর কথাই ঠিক। আমি ভুল সংশোধনে সেটা শুধরে দেব বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তার পরে তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমার জীবন স্মৃতিতে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের ভিতরের কথা লিখেছ কেন? যেমন, সপ্তপদীগমনের কথা?'

আমি শুধলাম, 'সেই হেসে দেওয়ার কথাটা বলছ তো? আমার এরকম অপরাধ মাঝে মাঝে তোমায় মেনে নিতে হবে। লেখার সময় আমি বাড়ির আর বাইরের কথা বেছে বেছে লিখতে পারিনে, এইটেই আমার দোষ। সেজন্যই এতসব বিভ্রাট ঘটেছে আর ভবিষ্যতে যে ঘটবে না সে সম্পর্কেও জোর করে কথা দিতে পারিনে।' তাই কথাটা উপযুক্ত সময়েই বলে ফেলা ভাল।

আমি বি. এল পরীক্ষায় সসম্মানে ফেল করার কারণটা বলি। আমরা পরীক্ষা দেবার পর 'সিণ্ডিকেট মিটিং' করে বি. এল পরীক্ষার পাশের ন্যূনতম নম্বরের সংখ্যাটা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছিলাম তাতে পাসের ঘরে উঠতে পারিনি। অবশ্যি পুরনো নিয়ম অনুযায়ী আমরা যে নম্বর পেয়েছিলাম তাতে পাস করে যাওয়ারই কথা। সেজন্য আমাকে নিয়ে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র 'ফেল' করেছিল। এই তিরিশ জনের ভিতর কয়েকজন বেশ ভাল ছাত্র ছিল আর তারা কলকাতার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সন্তান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এমন কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা খেপে গিয়েছিলাম। একেক দিন ভবানীপুরে সেই ছাত্রর বাবার বাড়িতে আমাদের সভা বসত। সিনেটের সভ্য স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, ডব্লিউ সি ব্যানার্জী

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সাহায্য করেছিলেন। আমাদের বিপক্ষে ছিলেন সিণ্ডিকেটের মেম্বার স্যার রাসবিহারী ঘোষ, কালীচরণ ব্যানার্জী, আশুতোষ মুখার্জী (পরে স্যার) প্রভৃতি। আমরা কলকাতা হাইকোর্টে কলকাতা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করব বলে ঠিক করলাম ইউনিভার্সিটি যাতে 'পাস করা' ছাত্রদের তালিকার ভিতরে আমাদের নাম নিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বুকে বল নিয়ে আমরা কজন উৎসাহের সংগে এই যুদ্ধে নেমে গেলাম। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র বিনোদচন্দ্র মিত্র (পরে স্যার অ্যাডভোকেট জেনারেল) আমাদের কর্ণধার হলেন। বিনোদ মিত্র যদিও ফেল করা শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না, কারণ তার আগের বছরই তিনি বি. এল পরীক্ষায় পাস করে হাইকোর্টে ওকালতি করছেন, তবুও তিনি এবং তাঁর ভাই প্রভাস মিত্র আমাদের সাহায্যকারী হয়ে উঠল। ভবানীপুরে একজনের বাড়িতে একটা বড় পার্টির আয়োজন হল। সেখানে আমাদের সমর্থনকারী অনেক বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—খুব সমারোহের সংগে সেই পার্টি শেষ হল।

আর্জিপত্র প্রস্তুত হল। আমাদের দিক থেকে ব্যারিস্টার এল. পি. পিউ, এ চৌধুরী ও এস পি সিংহকে নিযুক্ত করা ঠিক হল। শেষে কিনা এক ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হল। আর্জিপত্রে সই করার জন্য আমাদের মধ্যে এগারজন ছাত্রকে ঠিক করা হল। কিন্তু সই করার সময় 'ও বাবা' বলে কেউ সই করতে এগিয়ে আসে না। একজন একজন করে সব কজনেই পিছিয়ে পড়ে। কেউ বলে, বাবা মানা করেছেন, কেউ বলে, মামা বলেছেন, নরেন খবরদার, তুমি সই করবে না, ইত্যাদি। এতদিন এত কষ্ট করে সব কিছু ঠিক করে সেখানেই ফেলে দিতে হল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম অন্য কেউ সই দিক বা না দিক আমি ঠিকই দেব। চারিদিক থেকে আমি সবার কাছ থেকে সাধুবাদ পেতে লাগলাম। আমার একলা সইয়ের উপরই মোকদ্দমা চলতে লাগল। আমার সইয়ের সেই 'প্লেইণ্ট' খানা দেখে ব্যারিস্টার এ চৌধুরী বলেছিলেন, দেখছি, একলা আমাদের লক্ষ্মীনাথেরই সই। তাঁর কাছ থেকে ছাত্রেরা সেইটা নিয়ে তাঁকে কি বলেছিল আমি জানি না। সেই ব্যাপারে চৌধুরী পরে আমায় কোন কথা বলেন নি। তাঁর দেশের বাঙালী ভাইদের ঐ ধরনের ব্যবহারে তিনি যে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিনোদ মিত্র তাঁর

স্বদেশী ভাইদের এমন ব্যবহারের কথা অনেকদিন ধরেই বলতেন। এমন কি, কিছুদিন পরে, তিনি বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসার পর, একদিন আমায় ইণ্ডিয়া ক্লাবে দেখতে পেয়ে করমর্দন করে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমাদের মোকদ্দমাটা হাইকোর্টে জাস্টিস সেলের আদালতে উঠেছিল। আমাদের দিকের ব্যারিস্টার ছিলেন ব্যারিস্টার পিউ, চৌধুরী এবং সিংহ। অন্যদিকে ছিলেন স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ফিলিপস্ প্রভৃতি। সিণ্ডিকেটার মেম্বার হিসেবে আমাদের প্রতিবাদী ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, কালীচরণ ব্যানার্জী, আশুতোষ মুখার্জী প্রভৃতি। হাইকোর্টে কলকাতা ইউনিভার্সিটির উপরে আমার হয়ে 'রিট অফ ম্যাণ্ডামাস' (writ of mandamus) ইস্যু করলে আমরা আনন্দে নাচতে লাগলাম। সারা কলকাতাতে এ নিয়ে সেন্সেসন সৃষ্টি হল। তার পরে আমাদের বিপক্ষদের ভিতরে নানা চেষ্টা চরিত্র হল যাতে ইউনিভার্সিটি মোকদ্দমায় তারা হেরে মান না হারান; ফলে সেল সাহেব আমাদের বিপক্ষে রায় দিলে আমরা হেরে যাই। মোটের উপর ইউনিভার্সিটির প্রেস্টিজের সামনে আমাকে বলি দেওয়া হল। আমার উপরে মোকদ্দমার খরচের ডিক্রী দিল। যাইহোক, আমাদের এই আন্দোলনের ফলে, তিন মাসের মাথায় ইউনিভার্সিটি আবার একটি সাপলিমেণ্টারী বি. এল পরীক্ষা নিল। সেই পরীক্ষা আমিও দিতে বসলাম, অন্যান্য ছাত্রদের সংগে। কিন্তু প্রথম দিনের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরে আর যাইনি। কারণ পরীক্ষার সময় ইউনিভার্সিটির কর্মচারীগণ এমন ভাবে আমার উপর নজর দিতে লাগলেন যেন আমি একটা দাগী চোর। প্রশ্নের উত্তর কর্মচারীর হাতে দিয়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় অফিসার একজন এসে আমার কাছে মোকদ্দমার ডিক্রি খরচের টাকা দাবি করল। আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, এবং তখনই ধমকে দিয়ে বললাম 'চলা যাও'। ভাবলাম, ওরা আর কখনই আমাকে পাস করাবে না। সেই কথা চিন্তা করে কলকাতা ইউনিভার্সিটির চরণে নমস্কার জানিয়ে আর পরীক্ষা দিতে গেলাম না। আমার সংগীদের মধ্যে অনেক ছাত্রই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

উকীল আর হব না বলে দৃঢ়সংকল্প করলাম। ভাবলাম আমাদের বংশে উকীল মানায় না। সেজন্য বোধহয় পিতৃদেব যখন এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট

কমিশনার পদে ছিলেন তখন উকীলের বইতে নাম লিখিয়ে অনেককে উকীল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের একজন ছেলেকেও তা করে দেন নি। তখনকার দিনে বি. এল বা এল. এল পরীক্ষা না দিয়েই হাকিমের 'সুপারিশে' উকীল হতে পারত অনেকে। পিতৃদেবের মতে উকীলের ব্যবসায়টা খুব সম্মানজনক ছিল না।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

কলকাতার এক বিশিষ্ট অসমীয়া পরিবারের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল আমার জীবনে। সেই পরিবারের বিশিষ্ট লোক এবং আসামের সর্বজনবিদিত ইতিহাসবিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া। তিনি দীর্ঘকাল আসামে এবং প্রধানত নগাঁওতে একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারের কাজ করে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অবসর নিয়ে কলকাতায় বসবাস করার জন্য আসেন। তিনি বড়ই আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তিনি অবসর নেবার পরদিন থেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর বাড়িতে একটার পর একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তাঁকে তা সহ্য করতে হয়েছে—একথা মনে পড়লেও খারাপ লাগে। আমি দেখে আশ্চর্য হতাম যে তিনি এত সব ঝড় ঝঞ্ঝাট মাথায় পেতে প্রশান্ত মনে কি করে সহ্য করে গেছেন। একদিনের জন্যও তাঁর আনন্দময় মুখে বিষাদের ছায়া পড়তে দেখিনি। গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞ লোকের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাঁর মুখে আমরা অনেকটা সেইরকম লক্ষণ দেখতে পাই। যেমন,

দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

বাস্তবিকই আমার জীবনে এরকম আনন্দময় অথচ ধীর স্থির পুরুষ দৈবাৎ দেখেছি আমি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে। সেদিনই কলকাতায় তাঁর একমাত্র জামাতা ডাক্তার নন্দ কুমার রায়ের মৃত্যু হয়। পয়লা এপ্রিলের দিন এই শোক সংবাদ তিনি আসামে জানতে পারেন। তাঁর অতি আদরের কন্যা স্বর্ণলতা অকালেই বিধবা হল।

এর পরে বরুয়া মহাশয় চলে এলেন কলকাতায়, এই আশায় যে এখানে অন্তত সুখে বাকী জীবনটা কাটাতে পারবেন। তিনি একটা ভাল বাড়ি ভাড়া নিলেন আর ছেলেমেয়েদেরও স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। প্রথমেই আমি বরুয়া মহাশয়ের স্ত্রীকে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতে দেখি মাণিক-তলা স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। সেই মিষ্টভাষী মহিলার স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ের পটে লেখা হয়ে আছে, তা মুছে যায় নি। আমাদের বংশের

সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল এবং সম্পর্কে আমি ওঁর 'মামা' হতাম বলে তিনি আমায় মামা বলে ডাকতেন। পরে মাণিকতলা স্ট্রীটের বাড়ি থেকে তাঁরা উঠে এলেন ছাব্বিশ নম্বর স্কটস্ লেনে। সেখানে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখে এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কিছু পরেই আমি সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম সেই শোকাবহ দৃশ্য। আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। দেখলাম মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকা মায়ের পায়ে মাথা দিয়ে স্বর্ণলতা বিনিযে বিনিয়ে কাঁদছে। আর ছেলেগুলোও কাঁদছে হু হু করে। গুণাভিরাম বরুয়া নির্বাক। ছেলে কমলা ও জ্ঞান তখন ছোট। স্কুলের থেকে এসে তাঁরা দেখতে পেল যে তাঁদের মাতৃদেবী আর এই সংসারে নেই। বরুয়া মহাশয় শোকে ভেঙে পড়লেও অচল, অটল। তাঁর ধৈর্য অসীম। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্ম ব্যক্তিরা মৃতদেহের চারপাশে ঘিরে আছেন। একজন ব্রহ্মসংগীত গাইছেন,

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম,
ভবজলধির পারে।

উপস্থিত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা পরামর্শ করে একখানা গোরুর গাড়িতে করে শব তুলে নিমতলা ঘাটে নিয়ে গেলেন সংকারের জন্য। বরুয়া মহাশয় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন, কোন ব্যবস্থাতে হস্তক্ষেপ করলেন না। আমি দুঃখিত মনে বাড়ি চলে আসি। বরুয়া মহাশয় তাঁর স্ত্রীর অসুখে কলকাতা থেকে বড় বড ডাক্তার আর গঙ্গাপ্রসাদ ও দ্বারকানাথ কবিরাজ প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা করিয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি গিরিডি আদি জায়গাতেও নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে। কিন্তু কালের করাল গ্রাস থেকে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। আজকাল যেখানে বঙ্গবাসী কলেজ হয়েছে সেই ২৬ নম্বর স্কটস্ লেনের বাড়িতে তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করে বরুয়া মহাশয়কে বুড়ো বয়সে একলা রেখে আর ছেলেমেয়েদের মাতৃহীন করে চলে গেলেন। সেই বিপদের কটা দিন ছোট ছেলে কমলা আর জ্ঞান আমাদের বাড়িতে খেয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পর আমরা তিন নম্বর ওল্ড বৈঠকখানার ঘর ছেড়ে দিলে গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয় সেই বাড়িটাতে এলেন। সেখানে মাসচারেক তাঁরা সুখেই ছিলেন আবার কিসে এসে তাঁদের আঁকড়ে ধরে। বরুয়া মহাশয়ের

বড় ছেলে করুণার জ্বর হল। আবার বড় বড় ডাক্তার আর কবিরাজের আনা গোনা হল। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, জহরুদ্দিন, ম্যাকডোনাল্ড আদি ডাক্তার দেখলেন তাঁকে। ম্যাকডোনাল্ড করুণাকে সমুদ্র পার থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। তখন তিনি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালার (তখন কলেজের ছাত্র, পরে রায়বাহাদুর) সংগে করুণাকে জাহাজে করে বর্মা পাঠিয়ে দেন। জাহাজের আসা যাওয়ার ভাড়া আড়াইশ টাকা দিয়ে দুজনকে পাঠালেন। যেদিন করুণাকে জাহাজে তুলে দিয়ে বার্মা পাঠালেন সেদিন বরুয়া মহাশয়ের কী আনন্দ! যে কয়দিন করুণা জাহাজে ছিল, একদিনও ওর জ্বর হয় নি, এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা। রেংগুণে যতদিন ছিল, একদিনও জ্বর হয়নি করুণার। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে আবার করুণার জ্বর হল। তারপরে করুণাকে সংগে নিয়ে বরুয়া মহাশয় পুরুলিয়া চলে যান। তখন পুরুলিয়া বেংগল নাগপুর রেল কোম্পানীর একটা বড় স্টেশন ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানে করুণার স্বাস্থ্যের কোন উপকার না হওয়াতে তিনি আবার মধুপুরে নিয়ে গেলেন ওঁকে। তিন নম্বর ওল্ড বৈঠকখানার বাড়িতে তাঁর আরও দুটি ছেলে ও মেয়ে ছিল। পরে কমলা ও জ্ঞানকেও মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছু দিন পরে কমলা ও জ্ঞান ফিরে এসে আমাদের সংগে শোভারাম বসাক লেনের বাড়িতে থাকে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুলাই মধুপুরে করুণার মৃত্যু হয়। করুণার মৃত্যুর পর বরুয়া মহাশয়ও আমাদের সংগে শোভারাম বসাক লেনের বাড়িতে দুদিন ছিলেন। শ্রীযুক্ত নবীনরাম ফুকনও তখন ছিলেন সেখানে। করুণাকে যমের হাতে সমর্পণ করে এসে বরুয়া মহাশয় যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন আমাদের মনে হল আমরা আর তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারব না। কিন্তু আমরা দেখে অবাক হলাম তাঁর মুখে সত্যি বিষাদের কালিমা নেই। সেই চিরকালের আনন্দময় মুখ। তাঁর মুখের কথায় হাসি লেগে আছে আর তিনি মজার মজার কথা বলে চলেছেন অনর্গল। কি আশ্চর্য সংযম! আজকেও আমার মনে আছে, একদিন নবীনরাম ফুকনের মুখখানা তিনি গম্ভীর দেখে ফুকনকে গাড়িতে করে নিয়ে গ্রেটইস্টার্ন হোটেল থেকে চারটাকা কি পাঁচ টাকায় কতকগুলো কামিজ কিনে দিয়ে তাঁর মুখে প্রসন্নতা এনেছিলেন। এবং আগেও নাকি কারুর গোমড়া মুখ দেখলেই তিনি ঐরকম উপায় অবলম্বন করে তাকে খুশি করতেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখে শনি কি রবিবারে ৮ নম্বর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় একুশদিন ধরে জ্বরে ভুগেছিলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। ডাক্তার ম্যাকডোনাল্ডও তাঁকে চিকিৎসা করেছিলেন। কলকাতাবাসী অসমীয়া ছাত্ররা তাঁর অসুখে রাত জেগে তাঁকে সেবা করেছিল। আমিও দু একদিন তাঁর সেবা করি। বিধির অখণ্ডনীয় বিধানে তিনি আর আরোগ্য হলেন না। অসমীয়া ছাত্রেরা তাঁর মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে নিমতলা ঘাটে দাহ করে আসে। অবশ্যি সমবেত ব্রাহ্মব্যক্তিরা আগের মতো তাঁর স্ত্রীকে যেমন করে গোরুর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়েছিল, সেরকমই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এদের আপত্তিতে তা অগ্রাহ্য হল। সরকারী কাজের থেকে অবসর নিয়ে এই মানুষটি যদি আরও দশ বছর বেঁচে থাকতেন, তাঁর দ্বারা আমাদের অনেক হিতকার্য সাধিত হত—বিশেষ করে সাহিত্য সাধনা ক্ষেত্রে। 'জোনাকী' এবং 'বিজুলী'তে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। জোনাকীতে প্রকাশিত 'আগের দিন, এখনকার দিন' প্রবন্ধ যদি আরও কিছুদিন তিনি লিখে যেতে পারতেন, তাহলে ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথা আমরা জানতে পারতাম। তাঁর এই অবসর কালের সুযোগ সুবিধাতে অসমীয়াগণ ইচ্ছেমত তাঁর কাছ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি আদায় করে নিতে পারেনি। কেননা তিনি অবসরের সুখ শান্তি উপভোগ করতে পারলেন না। নিষ্ঠুর কাল তাঁর সংগী হল। আমাদের কপালে এত দুর্ভাগ্য। তখনকার কালে বিলেত থেকে যে Opium Commission (আফিং-সেবন রহিত কমিটি) এসেছিল, সেই কমিটিতে বিপক্ষে তিনি তাঁর অভিমত দেন। অভিমতখানা এই লেখককে তিনি একবার পড়তেও দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'কঠিন শব্দের রহস্য ব্যাখ্যা' পড়ে কোন অসমীয়া আছেন যে আনন্দ উপভোগ না করে থাকতে পারেন? তিনি ছোট বড় কারু সংগে ব্যবহারে পার্থক্য করতেন না। বিশেষ একজন অসমীয়া লোক দেখলেই তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন—তিনি বড়লোকই হন বা হন সামান্য লোক। একবার তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে রেলগাড়িতে একজন সাধারণ গ্রাম্য অসমীয়া লোককে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে দুই হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং তাঁর সংগে কথা বলে যে কত আনন্দ পেয়েছিলেন, সেকথা আমি তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। সবাই দেখেছে যে, কলকাতার ঘোড়াগাড়ির মুসলমান

'গাড়োয়ান'গুলো যখন ঘোড়াগাড়ির স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন মুসলমান তামাক বিক্রেতারা লম্বা নলওয়ালা গুড়গুড়িতে তামাক ভরে গাড়োয়ানকে খাইযে দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে এক একটা করে পয়সা নিত। একদিন বরুয়া মহাশয় হ্যারিসন রোড দিয়ে সেইরকম একটা ঘোড়াগাড়ির স্ট্যাণ্ডের কাছে আসতে, তাঁকে মুসলমান ভেবে সেই লোকটি গুড়গুড়ির নলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। তিনি কথাটা বুঝতে পেরে হেসে সেই নলটা হাতে ধরে মিছিমিছি টোঁ টোঁ শব্দ করে তাঁকে নিরাশ না করে পয়সা একটা দিয়ে চলে যান। সেই ঘটনাটা তিনি নিজেই রঙ চঙ দিয়ে খুব মজা করে আমাদের বলতেন আর হাসতেন। এই রকমই প্রশান্ত আনন্দময় পুরুষ ছিলেন আমাদের গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয়।

বরুয়া মহাশয়ের মৃত্যুর পর রজনীনাথ রায কমলা আর স্বর্ণকে তাঁর নিজের 'রিট্রিট' নামের বাড়িতে নিয়ে যান। রজনীনাথ রায় রায়বাহাদুর মহাশযের জামাতা ডাঃ নন্দকুমার রাযের দাদা। তিনি গভর্নমেণ্টের একজন বড় চাকুরে ছিলেন। এই সময়ে একটা গুজব আমাদের মনে খুব কষ্ট দিযেছিল—বিশেষ করে বরুযা মহাশয়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণ আর তাঁর ছোট ভাই দুটিকে। সেই গুজবের কথা সত্যি কি মিথ্যা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু রায়বাহাদুরের পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী বাঙালীরা শুনতে পেয়েছিলেন কথাটা। গুজবটা হচ্ছে রাযবাহাদুরের বংশের গণ্যমান্য লোক একজন আদালতে নালিশ করে চেষ্টা করে দেখছিলেন, যাতে বরুয়া মহাশয় এবং তাঁর স্ত্রীর বিবাহটা আইনমতে অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাহলে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে কমলা আর জ্ঞানকে বঞ্চিত করে তারা উত্তরাধিকারী হতে পারে। বরুয়া মহাশয় কোন উইল করে যাননি। বোধহয় তিনি কখনও ভাবতেও পারেন নি যে তাঁর মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এমন কথা উঠতে পারে। বাবু দুর্গামোহন দাস বরুযা পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি হাইকোর্টের একজন বড় উকীল ছিলেন।

একদিন তিনি রজনী রায়ের বাড়িতে এসে স্বর্ণলতাকে বলেন, স্বর্ণ তোমাদের কোন ভয নেই। তোমার ভাইদেরও ভয় নেই। আমি তোমাদের স্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের বন্দোবস্ত করেছি। সত্যি তিনি তাই করেছিলেন। এমন ব্যাপারে দুজন সাক্ষীর দরকার। একজন তিনি নিজে হয়েছিলেন এবং আর

একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু। যদিও তিনি সাক্ষী হতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু দুর্গামোহন বাবুর অনুরোধে রাজী হয়েছিলেন। হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার মিঃ বেল চেম্বারের কাছে দুর্গামোহন দাস নিয়ে গিয়ে স্বর্ণকে সনাক্ত করে দিয়েছিলেন এবং কাগজে স্বর্ণের সই দিয়েছিলেন। দুর্গামোহন বাবু তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত গুণাভিরাম বরুয়ার বিষয় সম্পত্তি 'ম্যানেজ' করে এসেছিলেন।

এর কিছুকাল পরে চিরকাল ইয়োরোপ প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকারাম ফুকন কলকাতায় এসে হাজির হলেন। জনশ্রুতি যে তিনি বরুয়া মহাশয়ের বিষয় সম্পত্তি 'ম্যানেজ' করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু দুর্গামোহন দাসের জন্য বরুয়া মহাশয়ের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আর কোন গণ্ডগোল হল না।

কিছুদিন বাদে স্বর্ণকে ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে অবস্থিত ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে তাঁর দুজন মেয়ের সংগে রাখা হল আর কমলা ও জ্ঞানকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিকটে অবস্থিত ব্রাহ্ম বয়েজ বোর্ডিং হাউসে রাখা হল। দুঃখের কথা যে, ছেলে দুটো 'ব্রাহ্ম বয়েজ' বোর্ডিং হাউসে থাকার সপ্তাহখানেক বাদে কমলা জ্বরে পড়ে। আমি প্রায়ই যেতাম স্বর্ণ ও ছেলে দুটির খোঁজখবর নেবার জন্য। আমার মনে আছে, একদিন কমলা কাঁদ কাঁদ মুখ করে বলল, এইবার আমার পালা। কথাটা শুনে আমার হৃদয় ভেঙে গেল। তবুও আমি যতটা পারি কমলাকে সান্ত্বনা দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু বেচারা ওর মন থেকে সেই ভাবনাটা গেল না। ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পরামর্শমতে কমলাকে আর জ্ঞানকে দার্জিলিঙে পাঠিয়ে দিয়ে লুই জুবিলি স্যানাটরিয়ামে রাখা হল। তাতে কমলার বিশেষ উপকার না হওয়ায় দুজনকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। সেখানে বির্জিতলায় পার্বতী দাসের বাড়ি ভাড়া করে ওদের রাখা হল। সেখানে ছিল দুখানা ঘর ও একটা বাথরুম। ডাক্তার ক্রম্বির চিকিৎসা চলল। চিকিৎসায় কোন উপকার হচ্ছে না দেখে ডাক্তার ক্রম্বির পরামর্শ অনুযায়ী কমলাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এটোয়াতে। সংগে দারোয়ান রামভরোসা গেল ও একজন ব্রাহ্ম লোককে কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করা হল। এটোয়া থেকে কমলা বম্বেতে যায়। রজনী রায়ের পরামর্শে কমলা ডাঃ আত্মরাম পাণ্ডুরঙের চিকিৎসার অধীন হয়। সেখানে তখন শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া ও শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ দাস ডাক্তারী পড়তেন।

তাঁরাও কমলার খোঁজ খবর নিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বম্বে থেকে কমলাকে কলকাতায় নিয়ে এসে ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের কাছে একটা ঘরে রাখা হল। সেখানে প্রায় চার মাস রেখে কমলাকে হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপাথি ও কবিরাজী চিকিৎসা করান হল। বড় কবিরাজ ভিষগরত্ন দ্বারকানাথ সেনেরও চিকিৎসা চলে। কিন্তু সব কিছুই ব্যর্থ হল।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সেখানেই কমলা মারা যায়। দুবছরের মধ্যেই এই কৃতী পরিবারের চারজনের মৃত্যু ঘটে। গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয়ের সন্তানদের মধ্যে জীবিত শুধু জ্ঞানদাভিরাম ও স্বর্ণলতা। এখন আমাদের প্রধান চিন্তা হল কেমন করে জ্ঞানদাভিরামকে বাঁচানো যায়। তাঁকে সমুদ্র যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার ঠিক হল। সংগে গেলেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার। কারণ ডাক্তার সরকারেরও শরীর খারাপ। ওঁর আত্মীয়-স্বজনেরা মনে করলেন ওঁর যখন শরীর খারাপ, তখন তিনিও বেড়িয়ে আসুন না কেন, বিশেষ করে পরের খরচে। জ্ঞানের দিদি কালীমাইচেনা তখন তাঁর ছেলে প্রিয়নাথকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতেই ছিলেন। আমরা প্রিয়নাথকেই জ্ঞানের সংগে পাঠাবার কথা বললাম, কিন্তু সেই দাবী ব্রাহ্ম ব্যক্তিদের দ্বারা অগ্রাহ্য হয়। বি. আই. এস. এন কোম্পানির লায়াড়া জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে করে জ্ঞানকে বিপিন বাবুর সংগে পাঠান হল। তাঁরা মাদ্রাজ হয়ে গেলেন বম্বে। সেই যাত্রায় প্রায় একমাস সময় লেগেছিল। তারপরে তাঁরা মুংগেরে গেলেন থাকবার জন্য। গৌহাটির শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বরুয়া তখন ছিলেন মুংগেরে। প্রথমে তাঁর সংগেই ছিল জ্ঞান। পরে সে আলাদাভাবে একটা ঘর ভাড়া নেয়। সেখানে থাকতেই জ্ঞান জানতে পারে যে ইয়োরোপ থেকে শ্রীরাধিকারাম ফুকন কলকাতায় এসেছেন তাঁদের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল কি মে মাসে জ্ঞান মুংগের থেকে এসে শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁর পরিবারের সংগে দার্জিলিঙে যায়। তার পরে পনের বছর বয়সে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, বি. আই. এস. এন কোম্পানির জাহাজ ডনেরাতে উঠে সে চলে যায় বিলেতে পড়বার জন্য। বিলেতে শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু জ্ঞানের পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে কথা ছিল, কিন্তু তিনি তা না করে তাতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন। ডাক্তারের কথায় জ্ঞানের অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে পড়ার প্রস্তাব পাল্টে গিয়েছিল ও তাতে জ্ঞানের শিক্ষার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। জ্ঞান যখন বিলেতে ছিল সেই সময় ডাঃ জগদীশ বসু একবার আমাকে তাঁর বাড়িতে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, জ্ঞানের

শিক্ষার ভার নাকি আমারই নেওয়া উচিত, ওঁর জ্ঞানের সম্পর্কে কিছু করার আর ইচ্ছে নেই।

বিলেতে শরীর ভাল না থাকায় জ্ঞান ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে আসে। কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকে রোজমেরি লেনের বাড়িতে, তারপর বেন্টিঙ্ক লেনে ছোট একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে চলে যায়। সেখানে চার পাঁচ মাস ছিল সে। স্বর্ণও প্রায় মাসখানেক জ্ঞানের সঙ্গে থেকেছিল। তারপর ২৫০ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে। এর কিছুকাল আগেই হুগলী কলেজের গুণী এবং বিদ্বান শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সঙ্গে স্বর্ণলতার পুনর্বার বিয়ে হয়। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কিছু দূরে হ্যারিসন রোডে ক্ষীরোদবাবু জ্ঞানের জন্য একটা বাড়ি নির্মাণ করেন (অবশ্যি জ্ঞানের টাকাতেই)। সেখানে ক্ষীরোদবাবু ও স্বর্ণ কিছুদিন ছিলেন। ক্ষীরোদবাবু হুগলী কলেজের থেকে, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে বদলী হয়ে যান। একদিন ওদের হ্যারিসন রোডের বাড়িতে ইন্দুর মরতে দেখে, স্বর্ণের রান্নার লোককে বাড়িতে রেখে দিয়ে স্বর্ণকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। দুদিন পরে গিয়ে দেখি সেই পাহারাদার বামুনটি প্লেগে মারা গেছে। তারপরে স্বর্ণ মেয়ে দুটোকে নিয়ে ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে কটকে চলে যান।

এর কিছুদিন পরে জ্ঞান আসামে চলে যায়। পুজোর পরে সে কলকাতায় ফিরে এসে হাওড়াতে আমাদের রোজমেরি লেনের বাড়িতে ওঠে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বালিগঞ্জের ঝাউতলা রোডের একটা বাড়িতে উঠে যায় জ্ঞান। সেই বছরেই তার বিয়ে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে লতিকার সঙ্গে। আমি সে সময়ে শ্রীভোলানাথ বরুয়ার সঙ্গে কাশ্মীরে ছিলাম।

আমার দাদা ডাঃ গোপালচন্দ্র বেজবরুয়া (ডাঃ জি সি বেজবরুয়া) বিলেতে ডাক্তারী পাস করে অনেক বছর দক্ষিণ আমেরিকার ডামেরারা নামক জায়গাতে সিভিল সার্জেন হিসাবে কাজ করেছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে হাওড়াতে গোলাবাড়ি রোডের ৩৫ নম্বরের একটা ঘরে ছিলেন। তিনি হাওড়া মিউনিসিপালিটিতে হেলথ অফিসারের কাজ করছিলেন। সেখানে আমার দাদার বিয়ে হয়। তাঁর বিয়ের পরে জ্ঞান বেন্টিঙ্ক

লেনের বাড়িতে চলে আসে। ১৯০০ সনের মার্চ কি এপ্রিল মাসে আমি যখন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়ার সংগে একই সংগে ডবসন্ রোডের একটা বাড়ি কিনি তখন বাড়িটাকে ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে নি। 'গৃহ প্রবেশ' উৎসবের দিন জ্ঞান আর তাঁর ভগ্নীপতি ক্ষীরোদবাবু উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছিল দুগুণ। আদি ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সেই উৎসবে মন্ত্র পাঠ করে উৎসবের কাজ সমাধা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়া যখন বিলেতে গেলেন, জ্ঞানকে তাঁর পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি নিয়ে গেলেন বিলেতে। অবশ্যি জ্ঞান তার জাহাজের ভাড়া নিজেই দেয়। বরুয়া বিলেতে ছিলেন প্রায় ছ মাস। জ্ঞান সেখানে থেকে এইবার ব্যারিস্টারি পাস করে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চলে আসে কলকাতায়।

আমি গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয় ও তাঁর পরিবারের বিষয়ে এমনভাবে এইজন্যই লিখছি যে বিধির নিষ্ঠুর পরিহাসে এমন একটা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর পরিবার ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল, সেকথা সবাইকে জানাতে হবে। আমরা কত আশা করেছিলাম ; আমাদের আশা ঈশ্বরের অলংঘ্য বিধানে ভংগ হয়ে গেল। আবার বলি যদি গুণাভিরাম বরুয়া মহাশয় অন্তত আরও বছর দশেক বেঁচে থাকতেন এবং অবসর কালের সুখ শান্তি ভোগ করতে পারতেন, তাহলে যে তিনি অসমীয়াদের মংগলের জন্য এবং বিশেষ করে অসমীয়া সাহিত্যের জন্য কত কাজ করে যেতেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর সুন্দর ছেলেরা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আসামে আরও দুটি জে বরুয়ার মত ছেলে পেতাম বলে আমার বিশ্বাস। ঈশ্বরের অনেক কৃপা যে কোনমতে জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া তাঁর অনুগ্রহে বেঁচে থেকে আসামের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তিনি তাঁর উদার হৃদয়সম্পন্ন ও উন্নত মনযুক্ত পিতৃদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলা যায়। ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবি করে কুশলে রাখুন, ঈশ্বরের চরণে এই জীবন-স্মৃতি লেখকের এইটেই প্রার্থনা।

কলকাতার ইউনিভার্সিটির কাছে শেষকালে এরকমভাবে জব্দ হয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আর ও মুখো হব না। মনে মনে সংকল্প করলাম, স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করব। আমার মনের কথা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়ার কাছে একদিন বলে ফেলি, তিনি তক্ষুনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর সংগে মিলে মিশে ব্যবসা করা ঠিক করে আমি একান্তমনে সেই কাজে লেগে যাই। তাঁর

শরীর সুস্থ হওয়ার পর (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে) তিনি ছোটখাট ব্যবসা করতে আরম্ভ করেছিলেন, প্রথমে কলকাতার ম্যাকলিয়ড কোম্পানির কাছে বার চারেক গারোপর্বত থেকে তুলো এনে বেচেছিলেন তিনি। তার পরে 'বি ব্রাদার্স' নাম দিয়ে কলকাতার বাংলা পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'তে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে বি. ব্রাদার্স কোম্পানি সেগুন কাঠের বরগা চৌকাঠ ইত্যাদি সত্বর ও সস্তায় সরবরাহ যোগাবে। তাঁর এই উদ্যম সফল হল না। তার পরে তিনি ই. আই, আরের আসানসোল স্টেশনে ছোট দোতলা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে খুচরা হারে আসামের চা বিক্রী করতে থাকেন। চায়ের সঙ্গে দু চারটে করে কাঠও বিক্রী করার চেষ্টা করেন। বঙ্কুবিহারী কর নামে একজন বাঙালীকে মাসে টাকা চারেক মাইনে দিয়ে সেই ব্যবসায়ের কাজে রেখেছিলেন। তার পরে বেঙ্গল নাগপুর স্টেশন গুইলকের আর মনোহরপুরে ছোটখাট রেলের স্লিপারের ব্যবসায় করার মনস্থ করে তিনি গভর্নমেণ্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে সামান্য গাছ রয়্যালটিতে বন্দোবস্ত করে নিয়ে সেই কাজে হাত দিয়েছিলেন। সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের বংশের গোপীনাথ বরুয়া নামে একজনকে ঠিক করে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে তাকে শোভারাম বসাক লেনের বাড়িতে রেখেছিলেন। তখন যাঁরা 'জোনাকী' কাগজ পড়তেন তাঁরা দেখেছিলেন যে দুমাস তাকে 'জোনাকী'র প্রকাশক বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম আমি। গ্রাহকদের 'জোনাকী' পাঠানো ও তার হিসেব রাখার কাজে গোপীনাথকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারপরে বি. বরুয়া গোপীনাথকে গুইলকের ও মনোহরপুরে নিয়ে গেলেন তাঁর ব্যবসার কাজে সাহায্য করার জন্য। এর পরে আমি বি. বরুয়ার ব্যবসায়ে ঢুকলাম।

আমাদের কাঠের ব্যবসাযের ক্রমশঃ উন্নতি হতে লাগল। বি. বরুয়া তাঁর ভাগ্নে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার বলিনারায়ণ বরার ভাই শ্রীযুত মহীনারায়ণ বরাকে গৌহাটি থেকে নিয়ে এলেন। মহীনারায়ণও আমার সঙ্গে ছিলেন কিছুদিন শোভারাম বসাক লেনের বাড়িতে।

কিছুদিন পরে বি বরুযা আর আমি শোভারাম বসাক লেনের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চোদ্দ নম্বর গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে এসে উঠি। আমার গৃহিনীকেও তাদের জোড়াসাঁকোর ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে নিয়ে এলাম সেখানে। গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িটা ছিল বড় ও দোতলা। সেখানে

আলাদা আলাদা দুটো দিক ছিল। রাস্তার সামনের দিকে বি. বরুয়া আর ভিতরের দিকে আমরা থাকতাম। খাওয়া দাওয়া আমরা একসংগেই করতাম। ইতিমধ্যে মহীনারায়ণ বরাকে মনোহরপুর স্টেশনে পাঠান হল কাজ করার জন্য। আমার কাজ হ'ল কলকাতার দিকে ব্যবসায়ের সকল কাজ কর্ম দেখা। মাঝে মাঝে আমি অবশ্য যেতাম বি এন আর লাইনে অবস্থিত আমাদের ব্যবসাযের কেন্দ্রগুলো দেখতে। বি. বরুয়া লাইনের দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দিন দিন আমাদের ব্যবসাযের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

আমি কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে করেছিলাম বলে আমার জন্য কলকাতার বেশীর ভাগ অভিজাত শ্রেণীর লোকের দরজা খোলা ছিল। অনেকের সংগে আমার ভাল করে চেনা শোনাও হয়েছিল এবং তাঁরা আমাকে যথেষ্ট আদর আপ্যাযন করতেন। বি. বরুয়া আমাকে তাঁর নিজের ভাই বলে সর্বত্র পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথমে যদিও এতে আমার একটু অস্বস্তি লাগত, পরে তা একেবারে সহজ হয়ে যায় আর আমি তা জেনে নিয়ে চলাফেরা করতাম সহজভাবেই। সেই সূত্রে তাঁরও এই অভিজাত পরিবারে অবারিত দ্বার। ব্যবসায় সম্পর্কে কারুর সংগে দেখা করতে গেলে আমরা দুজনই যেতাম একসংগে। কলকাতার নিমতলায় কাঠের গোলা। সেই গোলাগুলো বেশীর ভাগই ছিল গিরীশচন্দ্র বসুর। সেগুন কাঠের ব্যবসায়ে গিরীশবাবু তখন একছত্র ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। গিরীশবাবুর উপদেশ অন্যান্য সকল কাঠের ব্যবসায়ীরাও মেনে চলতেন। উনি প্রথমে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ তারকনাথ প্রামাণিকের ছেলে কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের ফার্মে সামান্য চাকরী করতেন। তাঁর সংগে বি. বরুয়ার পরিচয় ঘটলে তাঁকে কাঠের ব্যবসায় নামলেন একটু আধটু করে। বি. বরুয়া ও তাঁর সংগে আমি গিরীশবাবুর কাঠের গোলাতে গিয়ে বসতাম। গিরীশ বাবুর সামনে বি. বরুয়া আমাকে তাঁর নিজের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের সংগে আমাদের ভালভাবে চেনা হয়েছিল। প্রামাণিকের অন্যান্য ব্যবসায়ের সংগে জাহাজ মেরামত করার একটা ডক্ ছিল হাওড়াতে। ডকটার নাম ছিল ক্যালিডনিয়া ডক। ডকের ম্যানেজার সাহেব ছিলেন ইয়োরোপীয়ান। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার একজন ছিলেন বাঙালী, নাম তার অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। অতুলবাবুর মতো উচ্চমনের অমায়িক ও পরোপকারী লোক বিরল। কলকাতার

সুবিখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট এবং ধাত্রী বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার স্যার কেদারনাথ দাস, অতুলবাবুর নিজের ভাগ্নে ছিলেন। অতুলবাবুর সংগে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল কিছুদিনের মধ্যেই। সুযোগ সুবিধা পেলেই আমি অতুলবাবুর কাছে চলে যেতাম তাঁর সংগে কথাবার্তা বলার জন্য। বি. বরুয়া কলকাতায় এলে তাঁকেও নিয়ে যেতাম আমি। বৃদ্ধ কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক আর তাঁর তিন পুত্র—আশুতোষ, প্রমথ ও মন্মথ প্রামাণিকের সংগেও আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়িটি ছিল কলকাতার কাঁসারীপাড়ার বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে। কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক আমার সংগে স্নেহভরে কথা বলতেন। তিনি জানতেন যে ভোলানাথ ও লক্ষ্মীনাথ দুজন ভাই। প্রামাণিকের সংগেও আমরা একটু আধটু ব্যবসায়ের সম্পর্ক গড়ে তুললাম।

আমাদের ব্যবসায়ের প্রথম দিকটায় বছর পাঁচেক কলকাতায় আমাদের গাড়ি, ঘোড়া এবং কেরানী মুহুরী কিছুই ছিল না। আমরা 'গৌর নিতাই দুই ভাই' পায়ে হেঁটে বা ট্রামে করে ঘুরে বেড়াতাম। সব জায়গাতে দুজনে যেতাম একসংগে। বি. বরুয়ার গায়ে ছিল খাঁকী কোট (গলাবন্ধ) আর প্যাণ্ট, মাথায় কালো কিংবা ছাই রঙের টুপী, হাতে ছাতি, আর আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সাজ। বি বরুয়া ট্রাম থেকে নেমে পদব্রজের আশ্রয় নিলেই তাঁর মুখ থেকে এই গান বেরুত—

চল রে মন যাইরে কাশী,
বাবা বিশ্বনাথকে দেখে আসি।
কাশী গেলে দেখতে পাব,
কত শত যোগী ঋষি।

নানা কৌশলে লোককে বশ করার বিদ্যায় বি. বরুয়া খুবই পটু ছিলেন। বেংগল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানির ফরেস্ট ম্যানেজার ছিলেন মিঃ হুইফিন। তাঁর হেড কোয়ার্টার ছিল বি এন আরের রঘুনাথ পালী বা পানপোস স্টেশনে। সেখানে বড় সাহেব হুইফিন আর ছোট সাহেব রাইট আর দুচারজন ইয়োরোপীয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। হুইফিন আমীরি মেজাজের সাহেব ছিলেন। টাকা ভাঙাতে দিলে তাতে যদি খুচরা পয়সা থাকে, এমনকি বার আনাও, তিনি সেগুলো না নিয়ে সিকিটা তুলে নিয়ে চলে আসতেন। তাঁর এই ধরনের স্বভাবে তার চাকর বাকর কেরানীবাবু সবাই খুব প্রীত ছিল। পানপোসে উনি যে

বাড়িটাতে ছিলেন সেটা সুন্দর সাজানো এক রম্যপুরী ছিল। বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল থেকে শুরু করে সকল রকমের বিলাতী খেলার সরঞ্জাম ছিল সেখানে। বাংলাদেশে তখন ইয়োরোপীয়দের পার্টি নাচ ইত্যাদি সব সময়ই হত। বাড়ির ভিতরে ছোটখাট জুওলজিক্যাল গার্ডেনও একটা করেছিলেন তিনি। কলকাতার 'জার্ডিন স্কীনার কোম্পানি' বেংগল টিম্বার কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টস। কলকাতার হেড অফিসে বেংগল টিম্বারের বড় সাহেব ছিল স্টুয়ার্ড। বি. বরুয়া আস্তে আস্তে হুইফিন সাহেবকে সন্তুষ্ট করে বেংগল টিম্বারের ঠিকাদার হয়ে বেংগল টিম্বারে শ্লিপার সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলেন। 'ফাইনান্স' অর্থাৎ জংগল নেওয়াও শ্লিপার কাটানো প্রভৃতি সব খরচ বেংগল টিম্বার সপ্তাহে সপ্তাহে বি বরুয়া কোম্পানকে দিতে থাকে। চন্দননগরনিবাসী বাবু বটকৃষ্ণ পাল নামে একজন বাঙালী বি এন আর লাইনে ঠিকাদারী করে কিছুদিন শ্লিপারের কাজ করেছিলেন। তাঁকে বি বরুয়া কোম্পানির অধীনে ঠিকাদার করে নেওয়া হল আর বি. বরুয়া কোম্পানি 'ফাইনান্স' করতে লাগল। বটুবাবু কর্মক্ষম ও উপযুক্ত ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। তাঁকে পেয়ে আমাদের কাজের খুবই সুবিধে হয়। মোটের উপর বেংগল টিম্বার আমাদের 'ফাইনান্স' করতেন আর আমরা বটুবাবু ও অন্যান্য ঠিকাদারদের টাকা দিতাম। এই ধরনের কাজকর্ম চলতে থাকে আর আমাদের ব্যবসায়েরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। গাংপুর একটা 'ফিউডেটরি স্টেট'। গাংপুরের রাজার সংগে বি বরুয়ার পরিচয় হয় এবং পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। উনি ওর স্টেটের শাল কাঠের জংগল কাটবার জন্য বন্দোবস্ত করে ফেলেন। বি বরুয়া বি এন আর লাইন দিয়ে রাত দিন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর আমি বিশেষ করে কলকাতার ইউরোপীয় ও দেশী ব্যবসায়ীদের ফার্মগুলোতে ঘুরে বেড়াতে থাকি। জার্ডিন কোম্পানির অফিসে যাওয়াটা আমার দৈনন্দিন কাজ। দুপুর একটা নাগাদ থেকে কাঠের ব্যবসায়ী দেশী মহাজনেরা জার্ডিনের অফিসে মিলিত হয়। বিপিনবিহারী দাস তার হেডবাবু ছিলেন। বিপিনবাবুর অফিসে ওঁকে ঘিরে জটলা হত আর সেখানে কাজ থেকে আরম্ভ করে শরীরচর্চা অবধি নানারকম আলোচনা চলত। বিপিনবাবুর ঘরের আড্ডা তিনটের সময় ভেঙে গেলে আমরা গিল্ডের আর বুথনট কোম্পানির কাঠের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বসতাম। তাদের বড়বাবু ছিলেন ক্ষেত্রবাবু। বিপিনবাবুর কাছে যেমন মজলিস জমত তাঁর কাছে

তেমনভাবে জমত না। অবশ্য কিছুটা জমত। তার পরে জর্জ হেণ্ডার্সন, ম্যাকেঞ্জি লায়েল ইত্যাদি অফিসে গিয়ে আমরা বাড়ি ফিরতাম পাঁচটায়। তখনও বি বরুয়া কোম্পানির নিজের গাড়ি ছিল না। নিজের বাসস্থানেই কলকাতার অফিস আর অফিসটা ছিল কেরানী মুহুরী বর্জিত।

বছর দুয়েক আমরা গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের বাড়িতে থাকার পর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম বলরাম দে স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। কলকাতার হেড অফিসের হিসেব পত্র রাখা এবং অন্যান্য ছোটবড় কাজ আমাকেই করতে হত। পানপোসের বড় সাহেব হুইফিন আর তাঁর অ্যাসিস্টাণ্টদের পর্যন্ত, এমন কি হুইফিন সাহেবের হেড ক্লার্ক বাবু শ্যামল ব্যানার্জীকেও ফল ও তরকারীর চুবড়ি পাঠাতে হত কলকাতা থেকে। আমি ট্রামে চড়ে নিউ মার্কেট, নয়তো বড়বাজারে গিয়ে কি গ্রীষ্মে কি বর্ষায় রাশি রাশি ফল আর শাকসব্জী কিনে থলের মধ্যে ভরে সেলাই করে কুলীর মাথায় হাওড়া স্টেশনে বুক করে এসে বাড়ি ফিরতাম। মাসে প্রায় দশ বারো বার আমার এমন কাজ করতে হত। সেই কাজ করতে এক একদিন আমার তিনটে বেজে যেত। বি. বরুয়ার আদেশে বি এন আরের প্রধান ফিরিঙ্গি কর্মচারীদের এমন বাস্কেট পাঠানো হত। বড়দিনের সময় সেটা একটা বৃহৎ ব্যাপার হয়ে উঠত। নিউ মার্কেটের কেক, ফল, শাকসব্জীর বাস্কেট পাঠানোর আর অন্ত ছিল না। এই কাজগুলো আমি খুশি মনে ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে করতাম। কারণ আমার দৃঢ় ধারণা এগুলো আমাদের ব্যবসায়কে বড় করে তোলার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। আবার বলি, এই কাজে সাহায্য করার জন্য তখন আমাদের অফিসে একটা চাপরাসী বা পিয়নও ছিল না। আমাদের ব্যবসায় যাতে কম খরচে চলে সেইটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

অনেকে জানে এবং বঙ্গদেশে প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারের লোকেরা জানেন যে আমার সহধর্মিনী রন্ধনবিদ্যায় পটু। ছোটবেলা থেকে তাঁর রান্নায় প্রবল ঝোঁক ছিল। নতুন মাল মশলা দিয়ে নানা উপায় উদ্ভাবন করে সেকালে অনেক রকমের রন্ধন প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তিনি যখন আমাদের গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে এলেন, তখন আমাদের খাওয়া দাওয়া খুব ভাল হতে থাকে। যদিও একটা সাধারণ রাঁধুনে ছিল আমাদের বাড়িতে, তাকে নিয়ে তিনি নানা দেশী ও বিলাতী সুস্বাদু আহার প্রস্তুত করতেন। বি.

বরুয়া তখন আমাদের ব্যবসায় সম্পর্কিত বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে লাগলেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের সাব কন্ট্রাক্টর বটুবাবু ও তাঁর কর্মচারীগণ মাসের মধ্যে তিন চারবার এসে আমাদের বাড়িতে ভুরি ভোজন করে যেতেন। এরকম কাজ আমার বা আমার স্ত্রীর একদিনের জন্যও বিরক্তি উৎপাদন করেনি। তার কারণ বি. বরুয়া ছিলেন আমাদের নিজের ভাইয়ের মতো। তাঁর ব্যবসাই আমাদের ব্যবসা, তাঁর মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। ভোলানাথ আর লক্ষ্মীনাথ হরিহর আত্মা। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসায়ক্ষেত্রে অসমীয়ার নাম সবদিক দিয়ে বড় হয়ে ওঠে—তাই ছিল আমাদের চরম লক্ষ্য।

গাংপুর রাজার কথা আগেই বলেছি। তখনকার কালে ওড়িয়া রাজারা তেমন উন্নতি করতে পারেন নি। তাঁরা যদিও ইংরাজী ও বিশেষ করে বাঙালীদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন, তবুও তাঁরা অনেক পিছনে পড়ে ছিলেন। আজকাল অবশ্যি সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গাংপুর রাজার সঙ্গে যখন আমাদের জানা শোনা হল আর তাঁর স্টেটের জঙ্গলে যখন আমাদের কাঠ কাটা চলতে লাগল, তখন বি. বরুয়ার ইচ্ছে হল রাজাকে এবং রাজকুমারদের ভাল করে বশ করা এবং তাঁদের সভ্যতা শেখানোর। সেই কাজের ভার পড়েছিল আমার আর আমার গৃহিনীর উপরে। আমার গৃহিনী রান্নাঘরে এবং আমি বাইরে। আমরা প্রাণ দিয়ে অতিথি সেবা করেছিলাম। রাজার অনেকগুলো ছেলে। রাজার বড়ছেলে, মেজছেলে, বরমাজু, ছোটমাজু ইত্যাদি। বড়ছেলে যুবরাজকে 'টিকায়েৎ' বলা হয়। তারপর এক একজনের নাম—'মাজুনুনু, ভুলকুনুনু ইত্যাদি অনেক 'নুনু'। মাথায় জরির কাজ করা টুপী, গায়ে জরির কাজ করা মখমলের জামা পরে যখন রাজা তাঁর পুত্রদের নিয়ে আমাদের গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে এসে উঠত, তখন আমাদের আশেপাশের বাঙালী লোকেরা উদগ্রীব হয়ে দেখতেন। মেয়েরা বাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়দের এমন ভাবে বলতে আমি শুনেছি—আরে ভাই পচা! দেখছিস না এটা যাত্রার দল। আজকে এদের বাড়িতে যাত্রা হবে। হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড হবে। আজ রাত্রে দেখা যাবে অখন।

এঁদের সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে কলকাতা দেখাবার জন্য আমি ঘোরাতে নিয়ে যেতাম। বছরে তিন চারবার এইরকম কাজ করতে হত আমার।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'out of evil cometh good'। গৃহিনীর এই বিরাট রন্ধনকার্যের ব্যাপার থেকে হল একটা বড় উপকার। তিনি 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' নামের বড় বড় তিন খণ্ড রান্নার বই রচনা করলেন। আজকেও বাংলাদেশের সর্বত্র এই বই প্রচলিত। এর আগে বিপ্রদাস মুখার্জী নামে একজন ভদ্রলোক পাকপ্রণালী সম্পর্কে বই রচনা করলেও এই বইয়ের সংগে কোন তুলনাই হয় না।

আমরা গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে থাকতেই আমেরিকা থেকে ডাঃ গোলাপচন্দ্র বেজবরুয়া এসে কিছুদিন ছিলেন। তারপর তিনি S. S. Mersey নামক জাহাজে কলকাতার গার্ডেনরিচ থেকে কুলীর তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার হিসেবে কুলী নিয়ে আবার ফিরে যান আমেরিকায়। প্রায় একবছর কি দেড় বছর বাদে তিনি বিলেত হয়ে ফিরে আসেন আবার আমাদের কাছে। অবশ্য তখন আমরা গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে ছিলাম না। সেখান থেকে ২৭ নম্বর বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়িতে এসে, সেখানে একবছর থেকে হাওড়ায় চলে যাই।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের বাড়ি থেকে আমরা উঠে এলাম বলরাম দে স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। এই বাড়িটাও ছিল খোলামেলা ও প্রশস্ত। তখন আমরা একটা ছোট গাড়ি আর ঘোড়া কিনে ফেললাম। নিজের গাড়িতে করে অফিসে যাওয়া ছাড়াও এখানে সেখানে বেড়াতে কী আনন্দই না লাগত। সেই আনন্দের অনুভূতি বোধ করলাম, আমি এই প্রথম। প্রথম যেদিন আমি ঘোড়াগাড়িতে চড়ি, সেদিন কোচোয়ানটা যখন মাথায় পাগড়ী লাগিয়ে আর পাগড়ীর সামনে পিতলের চাকিতে গাড়ির মালিকের নাম লেখানো লম্বা আচকান আর চোস্ত পাজামা পরে আর সহিসটা যখন হাতে একটা চাবুক নিয়ে 'হেইও নগরওয়াল, তফাৎ যাও' বলে কলকাতায় রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায় তখন আমার মনটা স্বর্গরাজ্যে পেঁৗছানোর কোন উঁচু বাঁশে গিয়ে পেঁৗছায় তা বলতে পারিনে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমার খালি মনে হয়েছিল পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় না কেন? আমার এই ভালোলাগার ঘোড়াগাড়িটার যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ছিল তা নয়, এইরকম ঘোড়াগাড়ি কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াত হাজারে হাজারে।

একটা কথা বলতে বাকী ছিল যে, আমরা গোপীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে থাকতেই আমাদের প্রথম কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। ওর নাম ছিল সুরভি। সুরভির জন্মের কিছুদিন আগেই আমার বাবার ভীষণ অসুখের কথা শুনে আমি গৃহিনীকে তাঁর পিত্রালয়ে জোড়াসাঁকোতে রেখে দিয়ে চলে গেলাম শিবসাগরে। আমি শিবসাগরে ছিলাম মাত্র দশ বারো দিন। এমন সময় আমাদের ব্যবসায়ের কোন জরুরী একটা কাজের জন্য ভোলানাথ বরুয়া আমাকে ডেকে পাঠান। আমি পিতৃদেবকে টেলিগ্রামটা দেখিয়ে সেই অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে ফেলে রেখে দিয়ে কলকাতায় চলে আসি। আমি চলে আসার পরদিনই পিতৃদেব নৌকা করে কমলাবাড়ি সত্রে যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকার পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে মে পরলোকগমন করেন।

তাঁর গুরুর স্থান পুণ্যভূমি কমলাবাড়ি সত্রে দেহত্যাগ করার বাসনা নিয়েই,

তিনি সেখানে যান। সেখানে তিনি ঋষিসুলভ ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করে তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। Times of Assam কাগজে তাঁর মৃত্যুসম্পর্কে যা লিখেছিল, নীচে তার উদ্ধৃতি দিলাম :

His calmness and resignation to the will of God were, no doubt noble and pathetic in the presence of his Guru. When he saw the king of Terrors approach, he was all resignation to the divine will and left this world in such a cheerful way as if he was going to visit a friend. He had his senses up to the last moment and performed all the rites that are necessary before the death of a devout Hindu. At last fixing his eyes towards Heaven he faintly repeated the prayer similar to 'Unto Thy hands I commit my soul, for Thou hast redeemed me. O! The God of my salvation!' And then closed his eyes never to be opened again.

আমার গৃহিনী শুধু রন্ধনবিদ্যাতেই নয়, চিত্রবিদ্যাতেও নিপুণা। সেই সময়ে তিনি অনেক তৈলচিত্রও এঁকেছিলেন। পোর্ট্রেট পেণ্টিং অর্থাৎ মানুষের প্রতিকৃতি আঁকায় তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। পিতৃদেবের একখানা ফোটো থেকে তিনি এঁকেছিলেন পিতৃদেবের একটা বড় তৈলচিত্র। আমি শিবসাগরে যাওয়ার সময় পিতৃদেবের ছবিখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। পুত্রবধূর ভক্তির স্মারকচিহ্ন হিসেবে পিতৃদেবকে একখানা বেনারসী ধুতির সঙ্গে ঐ ছবিখানা উপহার দিয়েছিলাম। তিনি সেই উপহার পেয়ে খুশি হয়ে পুত্রবধূকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই স্নান করে উঠে সেই ধুতিখানা পরেছিলেন এবং আনন্দ মনে ঠাকুর ঘরে গিয়ে নামপ্রসঙ্গে গিয়ে বসেছিলেন। সেই ছবিখানা আজও হয়তো আছে আমাদের শিবসাগরের বাড়িতে ; কারণ আসাম সাহিত্য সম্মেলনে ১৮৫৩ শকের ১৩ই পৌষ, ইংরাজী ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে আমি যখন আসাম প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র আনতে যাই, তখনও আমি দেখেছিলাম সেই ছবিখানা।

পিতৃদেবের মৃত্যুর একমাস বাদে জোড়াসাঁকো বাড়িতে সুরভি জন্মগ্রহণ করে। আমি অবশ্য তখনই আসাম থেকে চলে আসি কলকাতায়। এই মেয়েটিই

আমার প্রথমা কন্যা। নিজের ছেলেমেয়েকে অন্যের ছেলেমেয়ের চেয়ে সুন্দর দেখাটা মানুষের স্বভাব। সেজন্য আমি যদি বলি আমার মেয়েটি সুন্দরী ছিল, সেকথার কোন মূল্য নেই। কিন্তু আর পাঁচজনে যদি বলে, তবে সে কথাটা প্রকাশ করতে পারি হয়তো। সেজন্য আমি আর পাঁচজনের সঙ্গে মত মিলিয়ে বলছি যে তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে এবং কলকাতায় তাদের সম্পর্কীয় অন্যান্য জায়গায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এত সুন্দরী মেয়ে ছিলনা। সেজন্য বোধ হয় সুরভি সবারই খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। ঠিক পাঁচ বছর বয়সেই মৃত্যু হয় সুরভির।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার গুণের পরিচয় এমনভাবে দিত যে সবাই তার উপর খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। মাত্র তিন চার বছর বয়সেই সে Nursery Rhymeএর বড় বই একটা মুখস্ত করে ফেলেছিল। তাছাড়াও অন্য অনেক ইংরাজী কবিতাও সে অনর্গল বলে যেত। সে 'টুইংকল টুইং-কল লিট্‌ল স্টার'কে বলত 'টুনিকোল্‌ টুনিকোল্‌ লিটল স্টার' কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটা সে মুখস্ত বলে যেত একটানা। কাউকে ধন্যবাদ জানাতে হলে ও 'থ্যাংক ইউ' না বলে বলত 'ফ্যাংক ইউ'। কিন্তু তবুও সেই ভদ্রতার কথাটি বলতে ও ভুলে যেত না কখনই। ওর কথা বার্তা ছিল খুবই মিষ্টি এবং বয়স্ক লোকদের মতো যুক্তি সংগত। ভয় বলে কোন কিছুই ছিল না। একদিন আমার সঙ্গে বাজি রেখে সেই ছোট মেয়েটি আমাদের বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে পনের মিনিট ধরে ছিল। একবারের জন্যও কিছু ভয়ের লক্ষণ দেখায় নি সে। সেই ঘরটা এত অন্ধকার যে বড়রাও সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। অন্ধকারে গা ছমছম করে। সুরভি আমার সঙ্গে সেই বাজিতে জিতে একটাকা পেল। বিধির নিষ্ঠুর বিধানে এই রকম মেয়েটি মারা গেল মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। সুরভি আমাদের সারা মন জুড়ে ছিল। ও চলে যাওয়াতে আমাদের হৃদয় ভেঙে গেল। ওর হাবভাব দেখে সর্বদাই আমার মনে হত যে এইরকম একটি মেয়ে পৃথিবীতে থাকলে হয়। সুরভি বেঁচে থাকলে আজকে ওর বয়েস হত একচল্লিশ। সুরভির মৃত্যুতে ঠাকুর পরিবারের সকলের এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবেরও মন ভেঙে যায়—সকলেরই মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া পড়ে। আমার ভায়েরাভাই শ্রীআশুতোষ চৌধুরী অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু সুরভির মৃত্যুতে তাঁরও চোখ দিয়ে

অশ্রুধারা বয়ে যেত অবিরত। মোটের উপর সুরভি ছিল—একটি কবিতা।

একদিন সকালে দেখলাম সুরভি ঢোক গিলতে পারছেনা। তখনই নিয়ে এলাম ডাক্তার। ওর গলা পরীক্ষা করে বলেন যে, ডিপথেরিয়া হয়েছে। তখনকার দিনে ডিপথেরিয়া রোগের ওষুধ এণ্টিটক্সিন ছিল না তা নয়, কিন্তু আমাদের যিনি পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন তিনি জানতেন না বা তাঁর হয়তো ভুলের জন্যই সেই ওষুধটা দেওয়া হল না। আমি ও আমার স্ত্রী তখন সেই ওষুধটির কথা জানতাম না। একদিনের মধ্যেই অসুখ ভীষণ বেড়ে যেতে লাগল। নিরুপায় হয়ে আমি বিকেলে সুরভিকে নিয়ে গেলাম জোড়াসাঁকোতে। আমার আজও মনে আছে, গাড়িতে সুরভি আমার কোলে বসে ঘোড়ার দিকে মুখ করে বসেছিল। গঙ্গার পুল পার হতেই সে বলে, বাবা আমি সামনের দিকে বসছি। আমার গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে। তুমি কিছু মনে কর না। এই বলে সে উঠে গিয়ে আমার দিকে মুখ করে সামনের আসনে গিয়ে বসল। সে অবশ্যি সেকথা আমায় হিন্দীতে বলেছিল। কারণ হিন্দী আর ইংরাজী ছাড়া সে অন্য ভাষা জানত না। সেই সময়ে আমি সম্পূর্ণভাবে সাহেবিয়ানা রোগে রোগগ্রস্ত ছিলাম। সেজন্য আমি সুরভির জন্য হিন্দুস্থানী আয়া রেখে ওকে হিন্দুস্থানী শিখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে-ছিলাম—যাক সে কথা।

সেই রাত্তিরেই জোড়াসাঁকো বাড়িতে আমি আমার সেই সোনার পুতুলটিকে হারালাম। ওর মায়ের এবং আমার হৃদয় ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হল। মৃতদেহ রাত্তিরে কে যে নিয়ে নিমতলা ঘাটে পোড়াল তা আজও আমি বলতে পারব না। কারণ তখন আমার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। সুরভিকে যমের বুকে সমর্পণ করে তারপর দিনই আমরা দুজন আমাদের হাওড়ার শূন্য বাড়িতে ফিরে এলাম, আমাদের মনের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত।

এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন জিনিসই একভাবে থাকে না। ইংরাজীতে আছে 'Time is a great healer'। আস্তে আস্তে আমরাও কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরে এলাম। ভাগবত গীতাই ছিল আমার জীবনের সম্বল। বিশেষ করে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ শ্লোকটা আমার মনের ভাবকে প্রশান্ত করে,

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

অর্থাৎ প্রাণীরা আদিতে অব্যক্ত, মাত্র মাঝে ব্যক্ত অথবা প্রকাশিত ; আবার মারা গেলেও আবার অব্যক্ত হয়। সে কারণে তার জন্য শোক কেন ?

পূজনীয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সুরভির মৃত্যুতে একটি কবিতা রচনা করে পাঠান। কবিতাটি নীচে দিলাম :

সুরভি ছিল তোমার নাম
তাই বুঝি ফুলের মতন
সৌরভ করিয়া বিতরণ
দুদিনে ত্যজিলে মর্ত্যধাম।
সে সৌরভ চিরদিনরাত
রহিল মোদের এই ঘরে,
তুমি থাক দেবতার তরে,
অমর অমল পারিজাত।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

তখন আমি মাঝে মাঝে সম্বলপুরে যেতাম বেড়াতে। সম্বলপুরের গভর্নমেণ্ট উকীল শ্রদ্ধাস্পদ ৺যোগেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., বি. এল. আর তাঁর শিক্ষিতা সহধর্মিণী কবি ও গ্রন্থকর্ত্রী ৺সরোজকুমারী দেবী আমাদের খুব বন্ধু ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে আমরা মাঝে মাঝে সম্বলপুরে বেড়াতে এসে তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতাম। আমি সম্বলপুরে ব্যবসায় সূত্রে বাস করার আগেকার এই ঘটনা। সরোজকুমারী দেবী সুরভিকে আগে দেখেন নি। মৃত্যুর পরে সুরভির ছবি একখানা দেখে তিনি এই কবিতাটি রচনা করে আমাদের দিয়েছিলেন :

চিত্রদর্শনে

সহসা বেসুরো করি দুটি হৃদিবীণা
কোন নন্দনের বনে,
খেলিতে মলয়া সনে,
গিয়েছে সুরভি মেয়ে ভুলিয়ে আপনা।

এসেছিল পথ ভুলে,
মা বাপের স্নেহ কোলে,
সহসা ভেঙেছে মোর খেলার বাসনা।
তাই সে গভীর রাতে
গেছে স্বরগের পথে,
ধরার বাঁধন খুলি স্নেহের কামনা।

কবে এই ধরাপরে,
পারিজাত শোভা করে
সুরভি কে লভে কোথা, এযে শুধু ভুল।
ত্রিদিবের শোভা-রাশি
ধরায় কে দেবে আসি,
দরিদ্র মানব বুকে আকাঙ্ক্ষা বিপুল।
সুখের স্বপন প্রায়,
চকিতে মিলায় হায়,
শুধু ভেঙে দিয়ে গেল দুটি হৃদিকুল।
স্বর্গের সুরভি সে যে সুরভির প্রায়।
মধুর সুবাস ধারা,
ঢালিযা জগতে সারা,
চলে গেছে মুগ্ধ করি মানব হিয়ায়
সুরভি পরশ করে,
কে কোথা পেয়েছে ভবে,
শুধু অনুভব কর শিরায় শিরায়।
স্মৃতির নিরালা ঘরে,
জাগাইয়া অশ্রু থরে,
স্নেহ-মন্দাকিনী ধারে সিঞ্চিও তাহায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কৃষ্ণনগরের যদু পাল মাটির মূর্তি এবং প্যারিস প্লাস্টারের মূর্তি গড়তে নিপুণ ছিলেন। তাঁর দ্বারা আমি সুরভির একটি প্যারিস প্লাস্টারের মূর্তি

তৈরি করিয়েছিলাম। সুরভির ছবি দেখে যদু পাল সেই মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন। মূর্তিটি হুবহু হয়েছিল। সেই মূর্তিটি আজও আছে আমার বৈঠকখানা ঘরে। আমি বি. বরুয়ার সংগে হাওড়ার ডবসন রোডের বাড়িতে থাকতে মন্দিরের মতো একটা ছোট পাকা ঘর নির্মাণ করে তাতে মূর্তিটি সাজিয়ে রেখেছিলাম। আমরা যখন বি. বরুয়ার কাছ থেকে চলে এসে হাওড়ার রোজমেরি লেনে আলাদা বাড়ি কিনে থাকতে এলাম, তখন মূর্তিটা সেখানে নিয়ে এলাম উঠিয়ে, আর আমি চলে আসার পর সেই ছোট মন্দিরটি বি. বরুয়া ভেঙে মাটির সংগে সমান করে দিলেন।

। অষ্টম অধ্যায় ।

মাণিকচন্দ্র বরুয়া কোম্পানির ভোলানাথ বরুয়া গৌহাটি ছেড়ে দিয়ে এসে কলকাতায় যে বিরাট কাঠের ব্যবসায় করেছেন, সেই খবরটা কানাঘুষা হয়ে আসামেও পৌঁছেছিল। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বরুয়ার ব্যবসায়ে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়া যদিও প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার ছিলেন না, তবুও তিনি যে কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোক এবং তাঁর টাকা পয়সা হয়েছে এই কথা ভেবে কোম্পানির পাওনাদারেরা শ্রী ভোলানাথ বরুয়াকে জড়িয়ে আদালতে ডিগ্রি করল। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বরুয়ার হাতে টাকা নেই, কিন্তু ভোলানাথ বরুয়ার হাতে আছে যথেষ্ট টাকা। ভোলানাথ বরুয়া কলকাতায় নতুন ব্যবসায় করে টাকা পয়সা করেছেন এই মতলবে ডিগ্রিটা কলকাতায় 'ট্র্যান্সফার' করে অর্থাৎ তুলে এনে যাতে সম্পূর্ণ টাকাটা আদায় করতে পারা যায় তারই মতলব তারা ভাঁজতে লাগল। এদের মধ্যে স্কালান নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কিছু টাকা উপার্জন করার আশায় তৎপর হয়ে ওঠে। স্কালান গৌহাটিতে গিয়ে সংবাদদাতারূপে 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে একটা কলম বার করে—সেখানে শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র বরুয়ার দেনার হিসেব দিয়ে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়ার নামটাও উল্লেখ করে। আসামে এই কথা রটে গেল যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বরুয়া মাণিক চন্দ্র বরুয়ার কোম্পানির টাকা নিয়ে এসে সেই কোম্পানিকে 'ফেল' করিয়ে দেয় এবং নিজে কলকাতায় গিয়ে নতুন ব্যবসায় করেন। বরুয়া কোম্পানি থেকে ভোলানাথ বরুয়া টাকা এনেছিলেন কি না আর তার জন্য কোম্পানি ফেল হয়েছিল কি না এই বিষয়ে আমি বিন্দু বিসর্গও জানিনে। আজ পর্যন্ত সেই ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনে এবং জানবার আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত আমার হয়নি। সেই কথা অস্বীকার করে বি. বরুয়া নিজে আমায় যা বলেছিলেন সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলে আমি বিবেচনা করেছিলাম। কারণ তখন তাঁর উপরে আমার অগাধ বিশ্বাস। তিনি আমার সহোদর ভাই স্থানীয়। তাঁকে আমি নিজের লোকের মতোই মনে করতাম। তাঁর সম্মান রক্ষা করাটাই আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ বলে আমি মনে করতাম এবং তার জন্য চেষ্টাও করতাম আমি।

বি. বরুয়া বেংগল নাগপুর লাইনের থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। বেশীদিন থাকতেন না তিনি এখানে। কলকাতার সব কাজের ভার ছিল আমার উপর। কলকাতায় তিনি আমার ছায়ায় ছায়ায় ছিলেন। আমাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সব টাকা পয়সাই আমার নামে রাখা হত ব্যাংকে। কতকগুলো ব্যাংকে টাকা রাখা হয়েছিল—Credit de Lyons, National Bank, Calcutta Bank, Hindusthan Bank, Hongkong & Shanghai Banking Corporation ইত্যাদি। এইসব ব্যাংকের কয়েকটির অস্তিত্ব আজ আর নেই। ব্যাংকের সমস্ত কাজকর্ম আমিই করতাম। বি. বরুয়ার অনুরোধে আমি আমার বেজ বরুয়া উপাধির বানান বদলিয়ে এল এন বি বরুয়া করেছিলাম। বি বরুয়া যখন ভাই হিসাবে পরিচিত তখন আমার বেজবরুয়া উপাধি কি করে হবে? এই প্রশ্নটি যাতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদয় না হয়, আর যাতে এই প্রশ্ন আমাদের জানাশুনা ইযোরোপীয ও বাঙালীদের মধ্যে না জাগে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি প্রথমে ব্যবসায় সম্পর্কিত কাগজে পত্রে এল এন বরুয়া এণ্ড কোম্পানি নামে সই করতাম। আমার শ্বশুর বাড়ির কযেকজন অতি আপনার লোকের বাইরে আর সবাই জানত যে বি. বরুয়া আমার নিজের ভাই। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আমাদের দুজনকার মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি দেখে সন্তুষ্ট হতেন এবং আনন্দ প্রকাশ করতেন। বি. বরুযা শুধু ব্যবহারেই নয় মুখেও সে রকম ভাব প্রকাশ করতেন। এমন কি, জার্ডিন স্কিনার কোম্পানির থেকে শুরু করে অন্যান্য সবাই আমাদের দুজনের এই সম্পর্কটাই ঠিক বলে জানতেন। বি. টি. টি কোম্পানির কলকাতার অফিসার আমার সংগে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করতেন—How is your brother? When he is coming to Calcutta? কতবার ব্যবসার ক্ষেত্রে আমি নিজের মুখে বলতে শুনতাম—আমরা দুজন ভাই।

আমরা গোপীকৃষ্ণ পাল লেন এবং বলরাম দে স্ট্রীটে থাকতে, এমন কি হাওড়ার বাড়িতেও প্রথম দিকে বি. বরুয়া আসামের থেকে যে সব লোক তাঁর সংগে দেখা করতে আসতেন, তিনি কারুর সংগেও দেখা করতেন না, এমনকি তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজনের সংগেও। তাঁর দাদা হেমকান্ত বরুয়া একবার তাঁর সংগে দেখা করতে এলেন। তিনি তো দেখা করলেনই না, উপরন্তু আমাকে দিয়ে তিনি তাঁর কালীঘাটে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং কিছুদিন পর দেশে পাঠাবার বন্দোবস্তও করে দেন। হেমচন্দ্র বরুয়ার ছেলেদের সংগেও তিনি

সেইরূপ ব্যবহার করেছিলেন। সবসময় তিনি আড়ালে আড়ালে থেকে দূরের থেকে আমাকে দিয়ে সবরকম ব্যবস্থা করাতেন। লাভের মধ্যে হত এই যে, আমি সবারই অপ্রিয় হয়ে পড়তাম। তাঁর বংশের সবাই মনে করতেন যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কুপরামর্শে বি. বরুয়া সকলকার সংগে এমন আচরণ করছেন। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম। বরং তাঁর নির্দেশে ঐ ধরনের আচার আচরণ করতে আমি নারাজ ছিলাম এবং অস্বস্তি অনুভব করতাম। আসামের থেকে যত লোক আসতেন, বিশেষ করে গৌহাটির থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের সবার সংগেই তিনি ঐরূপ আচরণ করতেন। এই রকম আচরণের ব্যতিক্রম ঘটেছিল মাত্র দুএকজনের ক্ষেত্রে—শ্রীবলীনারায়ণ বরার ভাই হরনারায়ণ বরা এবং অন্যান্য দু একজনের বেলায়। তিনি কেন এরকম করতেন তা নানা কৌশল অবলম্বন করে ঢাকবার চেষ্টা করলেও আমি যে বুঝতে পারতাম না, তা নয়। বুঝতে পারলেও সেই ভাবটা একপাশে ঠেলে রেখে দিয়ে এই ভেবেই সান্ত্বনা পেতাম যে, আমাকে তিনি এত ভালবাসতেন, যে, ভ্রাতৃপ্রেমের বশে তিনি বংশের আর কাউকেই আমল দিতেন না। নিজের আত্মীয় স্বজনও তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন আমার জন্য।

আগেই বলেছি যে কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের ডকের অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার বাবু অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সংগে আমাদের, বিশেষ করে আমার খুবেই বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং সেই বন্ধুত্ব প্রীতিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি কেমন উদার চিত্ত ও প্রকৃতির লোক ছিলেন, তা আগেই বলেছি। একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভোলানাথ বরুয়া ও আমি আমার মেয়ে সুরভিকে নিয়ে আমাদের ঘোড়া-গাড়িতে চেপে অতুলবাবুর সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম তার হাওড়ার বাড়িতে। হাওড়ার ক্যালিডনিয়া ডকের কাছে অতুলবাবুর বাড়ি। বি. বরুয়াকে সুরভি জ্যাঠা বলে ডাকত। অতুলবাবু যখন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন, সুরভি তখন তাঁকে হাওড়ার 'জ্যাঠা' বলে ডাকতে আরম্ভ করে। অতুলবাবু সুরভিকে খুবেই স্নেহ করতেন। ওঁর ওখানে কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে যখন বাড়ি ফিরব বলে গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ অতুলবাবুকে বলে—দেখ হাওড়ার জ্যাঠা! হাওড়াটা আমার ভাল লাগে কলকাতা আর ভাল লাগছে না। তোমার বাড়ির কাছেই আমাদের জন্য একটা বাড়ি কিনে নাও, আমরা হাওড়ায় চলে আসব। সেই চারবছরের মেয়ের মুখে একথা শুনে অতুল

বাবু অবাক হলেন। আমরাও আশ্চর্য। অতুলবাবু ওর গালে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেন 'মা, আমি নিশ্চয় বলছি আমার বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি ঠিক করে দেব। দিন সাতকের মধ্যেই। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে চলে এলাম। পথে বি. বরুয়া সুরভিকে শুধোন হঠাৎ তুমি অতুল বাবুকে কেন ঐ রকম ভাবে বললে?

সুরভি মুচকি হাসি হেসে চুপচাপ রইল।

অতুলবাবু হাওড়ায় প্রতিপত্তিশালী ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন। কি ইয়োরোপীয়, কি ভারতীয় সকলেই শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন তাঁকে। সত্যি, সাতদিনের মধ্যেই তিনি আমাদের ৩৭ নম্বর ডবসন্ রোডের বাড়িটা ঠিক করে দিলেন। প্রায় আড়াই একর জমিসহ একতলা বড় বাড়ি দেখে আমাদের খুব পছন্দ হল। বাড়িটা Mrs. Dickson নামে একজন মহিলার ছিল। বারো হাজার টাকায় বাড়িটা কিনে নিলাম। বি. বরুয়ার নামেই দলিল লেখা হল। সেটা বিশেষ করে আমারই ইচ্ছেতে হয়। কারণ উনিই মুখ্য, জ্যেষ্ঠ ও বড় ভাই। আর বি বরুয়া ও আমি, আমি ও বি. বরুয়া। অবিবাহিত বি. বরুয়ার আমি ছাড়া কেউ নেই।

ঘরটা কেনার সঙ্গে সঙ্গেই, তাকে ভালভাবে মেরামত করে, চুনকাম করে রঙ করিয়ে সুন্দর করে ফেললাম বাড়িটা। এক মাসেই মধ্যেই কলকাতার বলরাম স্ট্রীটের বাড়ি থেকে সেখানে উঠে এলাম। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের হাতে উপাসনা করিয়ে গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করলাম। তার পরের দিন থেকেই বাড়িটা, তার চারদিকে ইঁটের বেড়া, চাকর বাকরের ঘর, ঘোড়াগাড়ির ঘর, ফটকআদি মেরামত করতে লেগে গেলাম। তিন মাসের মধ্যেই বাড়িটা রম্যপুরী হয়ে ওঠে। বাড়ির ভিতরের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছোট একটা পুকুর ছিল, সেটা অবশ্যি বুজিয়ে ফেলি। টেনিস খেলার জন্য টেনিস লনও করলাম আর লনের দুপাশে সাদা পাথরের বেঞ্চ। ফুল আর ফুলের বাগান করে সুন্দরভাবে সাজানো হল বাড়িটা। তার এক বছর বাদেই বাড়িটা দোতলা করলাম। সামনে পাকা বারান্দায় বিলিয়ার্ড টেবিল রেখে বিলিয়ার্ড খেলারও ব্যবস্থা করলাম। আমি তখন সর্বদাই ইণ্ডিয়া ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতাম। অতুলবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী সেই বিলিয়ার্ড ঘরটা সাজানো হয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়িতে আর

বিলিয়ার্ড টেবিল নেওয়া হলনা আর আমার বন্ধু অতুলবাবুর বিলিয়ার্ড খেলা হল না। আজকেও হাওড়ায় ডবসন্ রোডের বাড়িটা যে দেখবে সেই বুঝতে পারবে যে মাত্র বারো হাজার টাকায় বাড়িটা কিনে আমি তাকে সুন্দর ভাবে নির্মাণ করে সাজিয়ে প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তিতে পরিণত করি। বাড়িটার কোন কাজই আমি কোন ঠিকাদারের হাতে দিইনি। রোদ বাতাস মাথায় নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে সেই কাজ করেছিলাম আমি হাসিমুখে। আজ অবধি সেই বাড়ির বাইরে ভিতরে সৌন্দর্যের প্রকাশে যে আমার পাঁচ আঙুলের ছাপ আছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মুছে যাবে না।

॥ নবম অধ্যায় ॥

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ নভেম্বরে কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অরুণার জন্ম হয়। সুরভি তখন সেখানেই ছিল। অরুণার জন্মের পরের দিন সকালে আমি জোড়াসাঁকো বাড়িতে গেলে সুরভি আমাকে বলে, 'দেখ তো বাবা, সবাই বলছে আমার বোন কালো। তুমি দেখবে এসো ও কালো হয়নি ; শুধু আমার চেয়ে একটু কম ফর্সা। এই কথা নিয়েই আজ সকাল থেকে সবার সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি।' আমি সুরভির গায়ে স্নেহভরে হাত বুলিয়ে বলি, আমি দেখছি এক্ষুনি। তুমি মনে দুঃখ করবে না ; তোমার বোন কখনও কালো হতে পারে না।

অরুণার জন্মের আঠার দিনের দিন রাত্রে চার ডিসেম্বর সুরভি আমাদের শোক সাগরে ডুবিয়ে রেখে চিরকালের জন্য চলে গেল।

ক্রমেই আমাদের ব্যবসা চাঁদের কলার মতো বাডতে থাকে। কলকাতায় যত কাঠের ব্যবসায়ী ছিল, তাঁদের মধ্যে কি মাড়োয়ারী কি বাঙালী সবার চেয়ে আমাদের স্থান ছিল উপরে। বাবু গিরীশচন্দ্র বসুর কথা আগেই বলেছি। কলকাতায় কাঠের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তার স্থান ছিল সবার উঁচু। তখন আমাদের ব্যবসা তাঁকেও ছাড়াবার উপক্রম। ইংরাজী ফার্ম জার্ডিন স্কীনের কোম্পানিতে আমাদের প্রতিপত্তি দেখে গিরীশবাবুর বুক কেঁপে ওঠে। বর্মাযুদ্ধের সময় ক্রোড়পতি হয়েছিল যে মাড়োয়ারী কাঠের ব্যবসায়ী তিনি তখন বেঁচে ছিলেন না। তাঁর ফার্মের আগের প্রতিপত্তি কমে গেছিল। চিমনলাল গান্ধারীওয়াল মতিলাল রাধাকিষাণ প্রভৃতি মাড়োয়ারী ফার্মেরও বি. বরুয়ার কোম্পানির কাছে হাত পাততে হত। কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের ফার্মের অবস্থা তখন ভাঁটার দিকে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে যখন আমাদের ফার্মের অবস্থা ভালোর দিকে গেল, তখন আমরা দুজনে পরামর্শ করলাম যে ব্যবসায়ে বিশেষ করে সেগুন কাঠের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ আর সকলের শ্রদ্ধেয় বাবু অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে আমাদের ব্যবসায়ে নিয়ে আসতে পারি তো সোনায় সোহাগা হবে। তখন কলকাতার কেউ আমাদের

সঙ্গে পেরে উঠবে না। এটাই ঠিক করে অতুলবাবুর কানে আমরা আমাদের মনের কথাটা গুনগুন করে গুঞ্জরণ করতে থাকি। আগেই বলেছি যে, আমি অতুলবাবুর বিশেষ ভালবাসার পাত্র। ভোলানাথ, লক্ষ্মীনাথ এই দুই ভাইয়ের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অফুরন্ত। তিনি ভেবেচিন্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত হলেন। তখন কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের ব্যবসায়ের পড়ন্ত অবস্থা। সেজন্য আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হতে অতুলবাবুর বিশেষ বাধা ছিলনা। কিন্তু তিনি চিরকাল কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের নুন খেয়ে এসেছিলেন, কাজেই তাঁদের কাছ থেকে খোলা মনে সম্মতি চাওয়াটা তিনি আবশ্যকীয় মনে করলেন। কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক এবং তাঁর ছেলেরাও আমাদের পরমবন্ধু, সেজন্য আমরা তাঁদের অনুমতির অপেক্ষায় রইলাম। বুড়ো কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক বড় উদার প্রকৃতির লোক। হিন্দুর সব রকমের নৈষ্ঠিক আচার আচরণ ও কার্যকলাপে তার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি অচলা। তাঁর পিতৃদেব তারকনাথ প্রামাণিক নিজের বাড়িতে একটা কাপড় পেতে তার উপরে এক লক্ষ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়ে সেই পদধূলি জড় করে একটা সোনার কৌটার মধ্যে ভরে রেখেছিলেন আর তাঁদের বাড়িতে সেটা অতি যত্ন করে রাখা আছে আজও। সেই ব্রাহ্মণের পদধূলি সমস্ত রকম অশুভ-বিধ্বংসী পরম মঙ্গলময় বলে তাঁরা আজও ভাবেন। তাঁর ছেলেরাও ছিলেন উদার প্রকৃতির এবং অত্যন্ত ভদ্র। তাছাড়াও তাঁদের বিস্তৃত ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়ে ছোট করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য অতুলবাবুকে ছেড়ে দিতে বিশেষ করে আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে তাঁরা বিশেষ আপত্তি করেন নি। তাঁরা আনন্দচিত্তে অতুলবাবুকে ছেড়ে দিলেন আমাদের হাতে। অতুলবাবু আমাদের কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর তাদের ব্যবসা বিভাগে যুক্ত কিশোরীমোহন সিংহও আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। তিনি হিসেব পত্র রাখার ব্যাপারে নিপুণ ছিলেন। তাঁকে পেয়ে আমাদের আনন্দের মাত্রা আরও গেল বেড়ে।

বি এন আর লাইনে আমাদের শালকাঠের ব্যবসায়ের প্রসারতা ও বিপুলতা বুঝতে তার সাপ্তাহিক খরচের টাকার হিসেব শুনুন। প্রত্যেক সপ্তাহেই আমি কলকাতা থেকে দশ পনের হাজার থেকে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা পাঠাতাম। সাধারণত আমাদের কেরানী ও বিশ্বাসী চাপরাশী এই টাকা নিয়ে যেত। বেশী করে পাঠাতে হলে আমি নিজেই নিয়ে যেতাম সেই টাকা। জঙ্গলের

কাজে গভর্নমেণ্টের কারেন্সী নোট চলে না। নোট ভাঙিয়ে টাকা, আধুলি সিকি, দুআনা আর পয়সা না নিয়ে গেলে কাজ অচল। কারণ অশিক্ষিত জংগলের লোক, গাড়োয়ান ও কুলীরা নোটের মূল্য বোঝে না। সপ্তাহে সপ্তাহে দশ পনের হাজারের টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যোগান কি মুশকিলের কথা, সেকথা যার ওপর সেই কাজের ভার না থাকে সে বুঝতে পারে না। তার উপরে রেলে চোর ডাকাতের ভীষণ ভয়। আমি সংগে একটিও জনপ্রাণী না নিয়েই (খরচের ভয়ে ব্যয়সংকোচ করে) মাসে দুবার তিনবার বি এন আর লাইনে আমাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেতাম। সেই কাজ করতে দুএকবার যে আমার কোন অঘটন ঘটেনি তা নয়, অবশ্য সাংঘাতিক ধরনের কিছু নয়। একবার ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে আমি ঐরকম ভাবে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে যেতে ঝাড়সুগুদা স্টেশনে—যেখানে আমার নামার কথা ছিল সেখানে নামতে না পেরে, নেমেছিলাম রায়গড় স্টেশনে। তখন প্রায় রাত একটা। রেল এসে ঝাড়সুগুদা স্টেশনে থামে। আমি সারাদিন ক্লান্ত থেকে রাত্রে ঘুমে অঘোর। কখন যে ঝাড়সুগুদা স্টেশনে গাড়ি থামল আমি টেরই পেলাম না। গাড়ি যখন ঝাড়সুগুদা স্টেশন ছেড়ে দিয়ে হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে লম্বা রাস্তায় পাড়ি দিল, তখনই আমার হুঁশ হল। আমি হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম, সর্বনাশ! টাকার বাক্সটার দিকে তাকিয়ে দেখি সে নিরাপদে আগের জায়গাতে বসে আমাকে যেন শুকনো হাসি দিয়ে বলছে, 'বন্ধু, আজকে তো পড়েছ বিপদে। বেঞ্চের উপর চিত হয়ে নাক ডেকে শুয়ে থাক।' অশান্তি ও ব্যর্থতায় আমার মানসিক যন্ত্রণার সীমা নেই। ওদিকে রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে বুক না করে এক বাক্স টাকা সংগে। কি করি! বাক্সটা নড়াতে চড়াতে পারছিনে। টাকায় ভীষণ ভারী হয়ে আছে। রেল তখন পরের স্টেশন রায়গড়ে এসে থামল। ঝাড়সুগুদা থেকে রায়গড় দুঘণ্টার রাস্তা। সেখানে ট্রেণ পাঁচ মিনিটের বেশী থামে না। এ দিকে রাত তিনটে বেজে গেছে। স্টেশনে কুলী নেই। আমি তো মরি বাঁচি করে সেই ভারী টাকার বাক্সের প্যাঁটরাটা টেনে হিঁচড়ে প্ল্যাটফর্মে এনে নামালাম কোন-রকমে। স্টেশনমাস্টার ছিলেন বাঙালী। আমি আমার দুঃখের কথা তাঁকে জানালে তিনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। কোনরকমে আমি যাতে রাত্রের মধ্যে ঝাড়সুগুদাতে ফিরে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য তাঁকে

অনুরোধ করি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে ঘণ্টাখানেক বাদে একটা মালগাড়ি ঝাড়সুগুদায় যাবে, তিনি সেই মালগাড়ির ফিরিঙ্গি গার্ডকে বলে গাড়িতে উঠিয়ে দেবেন আর একটা কুলীকে দিয়ে আমার বাক্সটাকে উঠিয়ে দেবেন। সেরকম ভাবেই কাজ হল। পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ আমি ঝাড়সুগুদা স্টেশনে এসে পৌঁছাই। ঝাড়সুগুদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার মাথাটা ঠিক গলার উপর আছে কিনা দেখে নিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম তার জন্য। তখন রায়গড় স্টেশনে জনপ্রাণীর সমাগম ছিল না বেশী। ঝাড়সুগুদা আর রায়গড়ের মাঝখানের রাস্তাটুকু বনে জঙ্গলে ভরা। নির্জন সেই রাত্রে যদি কেউ এক প্যাঁটরা টাকার লোভে আমায় খতম করে দিত তবে এই জীবনস্মৃতি লেখককে আর জীবনস্মৃতি লিখতে হত না।

আমার ডায়েরী লেখা বা দৈনন্দিন কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখার অভ্যাস খুব ছিল না। তবুও আমার পুরানো ডায়েরী থেকে কতকগুলো কথা সংক্ষেপে এখানে জানাচ্ছি, যার থেকে পাঠকেরা জানতে পারবেন আমাদের ব্যবসায় কত বড় ছিল, আর আমার জীবন ছিল কত কর্মময়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৪ই ফেব্রুয়ারি—সকালে বড় বাজারের সুতাপটিতে যাই। সেখানে দোকানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করি। ইত্যাদি। বিকেল। কাল ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ের ঠিক করা হল।

১৫ই ফেব্রুয়ারি—সন্ধ্যেবেলা স্বর্ণের বিয়েতে গেলাম। উপাসনার পরে রেজেস্ট্রি হল। আমিও একজন সাক্ষী হই। সকালে হাওড়ার শালকিয়াতে যাই। ইত্যাদি।

১৬ই ফেব্রুয়ারি—Credit Lyons ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার টাকা তুলি। এটা ঝাড়সুগুদার ব্যবসায়ের খরচের জন্য।

১৭ই ফেব্রুয়ারি—দশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে সকাল সাড়ে আটটায় ঝাড়সুগুদা যাত্রা করে রাত এগারটায় ঝাড়সুগুদা পৌঁছাই। আসানসোল পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে। তারপরে ইণ্টারে। তখন ঐরকম ভাবে ঘুরে ঝাড়সুগুদা যেতে হত।

১৮ই ফেব্রুয়ারি—ঝাড়সুগুদাতে।

২০শে ফেব্রুয়ারি—ঝাড়সুগুদা থেকে কলকাতা যাত্রা। সঙ্গে বি. বরুয়া ও গাংপুরের টিকায়েৎ।

২১শে ফেব্রুয়ারি—বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে আসানসোল ছেড়ে ৬টা ৩০ মিনিটে কলকাতা পেঁছাই।

২২শে ফেব্রুয়ারি—সকালে চেতলার হাটে যাই। বিকেলে আর বেরুলাম না বাড়ি থেকে। বড় ক্লান্ত লাগছিল। গদাধরকে সংগে নিয়ে হাট থেকে অনেক জিনিস কিনি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি—সকালে দিল্লীওয়ালার দোকানের জন্য জিনিস কিনলাম। শিবসাগরের স্কুলে আমার সহপাঠী শুভেন্দুমোহন গোস্বামীকে হঠাৎ সেখানে দেখে বড় আনন্দ হল।

২৪শে ফেব্রুয়ারি—হাওড়ার ডকে গিয়ে আসানসোলে আমাদের বাড়িতে কাজ করার জন্য গোটা চারেক রাজমিস্ত্রীর বন্দোবস্ত করলাম। ব্যারিস্টার জ্ঞানেন রায়ের সংগে দেখা হল, তাঁর সংগে বিজনেস 'টক' হল।

২৫শে ফেব্রুয়ারি—সকালে বৌবাজারের সম্বলপুরের জে. এন সেনের জন্য 'ড্রয়িংরুম সেট' একটা কিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করে আমাদের মিসলেনিয়াস স্টোরের দোকানের হিসেব দেখতে গেলাম। বিকেলে বড়বাজারে গিয়ে আমাদের আমদা, বার্ডরফেলা অফিসের জন্য দুটো লোহার রড কিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

২৭শে ফেব্রুয়ারি—ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে আসানসোল যাওয়ার জন্য সন্ধ্যে ৬'৪২ মিনিটে রেলে উঠি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি—সেখান থেকে ভবানীর সংগে (বি. বরুয়ার ভাগনে) ঝাড়সুগুদা যাবার জন্য বি. এন আর গাড়িতে উঠি। আজ কলকাতায় ইন্দিরা দেবীর সংগে প্রথম চৌধুরীর বিয়ে। আমার আর যাওয়া হল না।

১লা মার্চ—কলকাতা রওনা হলাম। সংগে জার্ডিন কোম্পানি থেকে নেওয়া ৭৫,০০০ টাকার হুণ্ডি একখানা।

২রা মার্চ—কলকাতায়।

৬ই মার্চ—স্টীল ট্রাংকের একটা consignment-এর জন্য হরিশচন্দ্র বোস কোম্পানিকে অর্ডার দিলাম।

১৭ই মার্চ—আসানসোলের বাড়ির জন্য করগেটেড আয়রণ শীট কিনে পাঠালাম।

২৫শে মার্চ—আমার বাইসাইকেলটা মেরামত করতে পাঠাই।

২৮শে মার্চ—ওয়াটকিনস্ কোম্পানিকে ৫০০ টাকা দিলাম গাংপুরের রাজাকে ; হিংগির successions হিসেবে।

২২শে এপ্রিল—গাংপুরের রাজাকে দেবার জন্য ১০০০ টাকার সোনা কিনে নিয়ে আসানসোল হয়ে ঝাড়সুগুদাতে রওনা হই।

২৬শে এপ্রিল—হংকং ব্যাংক থেকে ১২৫০ টাকা এনে গাংপুরের রাজাকে দেবার জন্য Watkins কোম্পানিকে দিলাম।

২৮শে এপ্রিল—শ্রীযুক্ত তরুণ ফুকনের (ব্যারিস্টারের) সংগে বাইসাইকেলে করে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাই।

২৯শে এপ্রিল—সকালে ডকে যাই, সন্ধ্যেবেলা বাইসাইকেলের দোকানে, পরে বিলিয়ার্ড খেলতে যাই ইণ্ডিয়া ক্লাবে।

৩০শে এপ্রিল—আসানসোল যাত্রা।

১লা মে—সেখানে কার্য পরিদর্শন।

৩রা মে—সকালে প্রমথনাথ বোসের সংগে দেখা করি, আবার রাত্রের গাড়িতে কলকাতায় ফিরি।

৮ই মে—অক্ষয় নন্দীকে ঝাড়সুগুদা থেকে ২৫,০০০ টাকার হুণ্ডি I. S & Co.-র নামে দিলাম। সেখানে হংকং ব্যাংকে পাঠিয়ে ২৫,০০০ টাকার নোট আনলাম।

৯ই মে—বর্ধমানে ঘরটা দেখতে যাই। বাড়ি কেনার জন্য দুটো ঘর দেখি, ভাল লাগে নি।

১০ই মে—সকালে ফলের বাস্কেট ঝাড়সুগুদাতে পাঠাই। সকালে ২৫,০০০ টাকার নোট নিয়ে ঝাড়সুগুদা যাওয়ার জন্য আসানসোল যাত্রা করি।

১১ই মে—রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ঝাড়সুগুদা পেঁছিলাম। বি. বরুয়া পেণ্ড্রাতে (বি এন আরের একটা স্টেশন) ছিলেন।

১৩ই মে—ঝাড়সুগুদাতে গাংপুরের উকীল (পরে সম্বলপুরে) রমাপদ চ্যাটার্জীর সংগে আমার চেনাশুনা হল।

১৬ই মে—বি. বরুয়া পেণ্ড্রা থেকে ঝাড়সুগুদা এসে পেঁছান।

১৭ই মে—আসানসোলে রওনা হলাম।

১৮ই মে—কলকাতায় যাবার জন্য সন্ধ্যেবেলা পাঞ্জাব মেলে উঠি। রাত্রি আড়াইটার সময় আসানসোলে। খুব খারাপ সময়।

১৯শে মে—সকালে কলকাতা।

২২শে মে—আবার আসানসোলে যাত্রা।

২৩শে মে—বি বরুয়ার সংগে কলকাতায় ফিরলাম, আবার সেই পাঞ্জাব মেলে।

২৪শে মে—কলকাতায় এলাম। বি বরুয়ার খুব জ্বর হয়।

২৫শে মে—বি বরুয়ার খুব জ্বর। টেম্পারেচার ১০৩ ডিগ্রী।

২৬শে মে—ডাঃ রাসেলকে ডাকা হয় চিকিৎসার জন্য।

২৭শে মে—জ্বর কমেছে। রাসেল আজও এসেছে।

২৮শে মে—বি বরুয়ার জ্বর ছাড়ে

২৯শে মে—নিজে বাজারে গিয়ে আম কিনে ঝুড়িতে করে গাংপুরে পাঠান হল।

৪ঠা জুন—৪০০ 'পিট্‌স্' ঝাড়সুগুদাতে পাঠালাম।

৭ই জুন—বি বরুয়া দার্জিলিঙে গেলেন।

৮ই জুন—সকালে মিসলেনিয়াস স্টোর্সে'র কাজ দেখলাম। দুপুরবেলা বুক কোম্পানির নীলামে গিয়েছিলাম।

১০ই জুন—আসানসোলে ১০,০০০ টাকা নিয়ে সেইটা উমাচরণ সরকারের মারফৎ ঝাড়সুগুদাতে পাঠিয়ে রাত্রে ফিরে এলাম।

১১ই জুন—সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

১২ই জুন—বি. টি. টির বড় সাহেব মিঃ হুইফিন আর শ্যামবাবুকে (হেড ক্লার্ক) আনতে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি পাঠালাম। শ্যামবাবু আমাদের বাড়িতে থাকলেন। হুইফিন হোটেলে গেল।

১৫ই জুন—শ্যামবাবু ফিরে যায়।

১৬ই জুন—গদাধরের সংগে দোকানে গিয়ে জিনিস কিনলাম।

১৭ই জুন—আজকেও গদাধরের সংগে দোকানে গিয়ে জিনিস কিনি, বাকী সময়টুকু বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়িতে কাটাই।

২০শে জুন—আসানসোলে কাজ দেখতে যাই।

২২শে জুন—আজ ফিরে এসে ডকে যাই। আসানসোলে জমির মাপ ও দলিল বি বরুয়ার কাছে দার্জিলিঙে পাঠিয়ে দি।

২৯শে জুন—বি বরুয়া ফিরে এলেন। সুরভির খুব জ্বর।

৩০শে জুন—বি. বরুয়া আসানসোল গেল। সুরভির জ্বর কমে।

১লা জুলাই—হাজি নুর মহম্মদ আয়ুবকে ৭,০০০ টাকা দিলাম ঝাড়সুগুদা থেকে নিয়ে আসা হুণ্ডির উপরে। রাত্রি দশটার গাড়িতে আসানসোলে রওনা হলাম।

৩রা জুলাই—কলকাতায় ফিরে এলাম।

২২শে জুলাই—ভূতনাথ মুখার্জী বাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে দমদমে হেঁটে এলাম। আবার হেঁটে ফিরেও গেলাম। এই রকম করেছিলাম আমি বাহাদুরী দেখানোর জন্য কারণ উনি মনে করতেন আমি হাঁটতে পারি না।

২ আগস্ট—বনাই স্টেটের lease ছাপতে দি। হুইফিন সাহেবকে আমাদের বাস্কেট পাঠালাম। রাঁচীর কৈলাসবাবুকে রবারের বালিশ একটা পাঠালাম। গাংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাওয়া দুজন এম. এ. বি. এল কে পরীক্ষা করে একজনকে বেছে নি।

তখনকার দিনে কলকাতায় বি. বরুয়া কোম্পানিতে আমার কাজের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

কিশোরীবাবু আর তারপরে অতুলবাবু আমার ফার্মে আসার পরে আমার জীবনের বিবরণের নমুনা স্বরূপে ১৯০১ এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের এমন সংক্ষিপ্ত বিবরণ এর পরের অধ্যায়ে দেব।

॥ দশম অধ্যায় ॥

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বি বরুয়ার সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক জীবন কেমন ছিল তার নমুনাও একটু-আধটু এই অধ্যায়ে দিলাম। আমি বি বরুয়ার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আসার পর যে সব লোক, যার কথা শুনেই হোক, যেসব মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা আসল কথা কিছুই জানতেন না।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ

১লা জানুয়ারী—আমার গৃহিনী বেবীর সঙ্গে ঝাড়সুগুদাতে গেল। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ৩৮ নম্বর ডবসন রোডের বাড়িতে আমার সঙ্গে ছিলেন।

১০ই জানুয়ারী—বি বরুয়া ঝাড়সুগুদা থেকে এলেন। আমি ব্যাংকের থেকে দশ হাজার টাকা তুললাম। জাডিঁন দশ হাজার টাকার একখানা চেক দিয়েছিল সেটা বেংগল ব্যাংকে জমা দিলাম।

১৪ই জানুয়ারী—২,০০০ টাকা বেংগল ব্যাংক থেকে তুলি।

১৫ই জানুয়ারী—বি বরুয়া ১,৫০০ টাকা নিয়ে ঝাড়সুগুদাতে যান। আমার 'জিপসী' নামের কুকুরটাও সংগে নিলেন তিনি।

১৬ই জানুয়ারী—আমাদের ঠিকাদার বটুবাবুকে ৫০০ টাকা দিলাম।

১৭ই জানুয়ারী—বেংগল ব্যাংক থেকে ১০,০০০ টাকা তুলি।

১৮ই জানুয়ারী—J. S. Co-এর থেকে ১০,০০০ টাকার চেক পেয়ে বেংগল ব্যাংকে জমা দিলাম। বি বরুয়ার জন্য বটুবাবুর হাতে নগদ দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম। J. S. Co-এর নামে আমাদের হয়ে টিক টিম্বারের টেণ্ডার দিতে কিশোরীবাবু লক্ষ্ণৌ গেলেন।

১৯শে জানুয়ারী—ঠিকাদার অক্ষয়বাবুর হিসেবে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য আমাকে ১,৫০০ টাকা দেন।

২০ শে জানুয়ারী—১,৫০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিলাম। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা আজ আসামে গেলেন।

২২শে জানুয়ারী—জাডিঁন থেকে ১০,০০০ টাকা আনলাম।

২৫শে জানুয়ারী—১৫,০০০ টাকা নিয়ে ঝাড়সুগুদাতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম গৃহিনী আর বেবী ভালই আছে।

২৭শে জানুয়ারী—ঝাড়সুগুদা থেকে সস্ত্রীক এসে আমরা জে. এন. সেনের বাড়িতে থাকলাম। তাঁরা খুব আদর যত্ন করে রাখেন। টেনিস খেলি ও সম্বলপুরের অনেক জায়গা তাঁদের সংগে ঘুরে ঘুরে দেখি।

২৮শে জানুয়ারী—সম্বলপুরে আরও দিন দুয়েক থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বি বরুয়া ডেকে পাঠানোর জন্য কলকাতা ফিরে যেতে হয়। ২০,০০০ টাকা বি বরুয়াকে দি।

৩০শে জানুযারী—আজ ঝাড়সুগুদা থেকে কলকাতা রওনা হলাম।

৩১শে জানুযারী—কলকাতায জাডি´নের থেকে ১৫,০০০ টাকার চেক আনি। ৬,০০০ টাকা ব্যাংক থেকে ওঠাই। তার পরে E. B. S. R-এর শিয়ালদহে অফিসে গিয়ে টাকা আনার চেষ্টা করে পেলাম না।

১লা ফেব্রুয়ারী—৬,০০০ টাকা পান্নালাল দারোয়ানের হাতে ঝাড়সুগুদাতে পাঠালাম। ১৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দি।

২রা ফেব্রুযারী—বি. বি ঝাড়সুগুদা থেকে এল। আমি O & R Ry-এর কিটিং সাহেবকে আমাদের এবং জাডি´ন স্কীনারের সেগুন কাঠ দেখানোর জন্য শিবপুরে টিম্বার ওয়াডে´ নিয়ে গেলাম।

৭ই ফেব্রুযারী—জাডি´নের থেকে ১৬,০০০ টাকার চেক পেয়ে বেংগল ব্যাংকে জমা দি।

৮ই ফেব্রুয়ারী—বি বরুযা ১৬,০০০ টাকা নিয়ে ঝাড়সুগুদায় যান।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—শাল স্লিপারের হিসেবে জাডি´নের থেকে ১৫,০০০ টাকার চেক পেয়ে বেংগল ব্যাংকে জমা দি। বটুবাবুর হাতে ১০,০০০ টাকা ঝাড়সুগুদাতে পাঠিযে দি।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—বি বয়ুযার কথামতো শ্রীযুত এম. সি. বরুয়াকে ২০০ টাকা দিলাম।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—এম. সি. বরুয়া ভুবনের সংগে আসামে ফিরে যায।

২১শে ফেব্রুয়ারী—জাডি´নের থেকে ১৫,০০০ টাকার চেক পেলাম। কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের কাছ থেকে ৪,৬১০ টাকা পেলাম।

২২শে ফেব্রুয়ারী—১৫,০০০ টাকার চেক ব্যাংক অফ বেংগলে জমা দি।

৪,৬১০ টাকাও। ৩,০০০ টাকা শ্রীযুত রমাকান্ত বরকাকতীকে দিলাম শ্রীযুত মাণিকচন্দ্র বরুয়ার জন্য—in full settlement of his claim—অর্থাৎ এম. সি. বরুয়ার রেমফ্রিকে দেয় ধার শোধ। সকাল বেলা বি বরুয়া এলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—শিবপুরে ম্যাকেঞ্জি লায়েলের যোগে আমাদের surplus কাঠগুলো নীলামে বেচলাম।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—ব্যাঙ্কের থেকে ১৫,০০০ টাকা আনি।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—জার্ডিন ১৫,০০০ টাকা দিল। বি বরুয়া সেই টাকা নিয়ে যান।

২রা মার্চ—নতুন ঘর নির্মাণের কাজ আজ থেকে আরম্ভ করি।

৭ই মার্চ—১৮,০০০ টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক থেকে ওঠাই। জার্ডিনের থেকে ১৫,০০০ টাকা পেয়ে ব্যাঙ্কে জমা দি।

৮ই মার্চ—২০,০০০ টাকা নগদ নিয়ে ঝাড়সুগুদা যাই। রাত্রে over-carried হয়ে রায়গড় পেঁছাই। মালগাড়িতে চড়ে পরদিন ঝাড়সুগুদা পেঁছাই। বড় বিপদ গেল।

৯ই মার্চ—আজকে আমার গৃহিনী ঝাড়সুগুদার আমাদের অফিসের কর্মচারী, ঠিকাদার এবং রেলের বাবুদের পার্টি দিলেন, বিরাট পার্টি, সবাই সন্তুষ্ট।

১০ই মার্চ—সস্ত্রীক বেবীকে নিয়ে হাওড়ায় ফিরে আসার জন্য যাত্রা করি।

১১ই মার্চ—হাওড়া পেঁছাই।

২৮শে মার্চ—বি বরুয়ার জন্য ১৫,০০০ টাকা পাঠাই। কটক যাত্রা করি।

২৯শে মার্চ—ক্ষীরোদ বাবুর বাড়িতে উঠি। স্বর্ণ এবং অন্যান্য সবাই আমাকে দেখে খুশী হয়।

৩০শে মার্চ—ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে কটকের দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি। কদম-রসুল (মহম্মদের পদশিলা) দেখতে গিয়েছিলাম।

৩১শে মার্চ—সকাল সাড়ে ৬টায় কটক থেকে রওনা হলাম। রাত ৭টায় হাওড়া।

২রা এপ্রিল—ঝাড়সুগুদাতে যাবার জন্য রেলে চড়ি।

৩রা এপ্রিল—বি বরুয়া আমাকে একটা টিক টিম্বারের অর্ডার দিলেন। সন্ধ্যে ৮টায় হাওড়ায় আসার জন্য গাড়িতে উঠলাম।

৪ঠা এপ্রিল—বেংগল ব্যাংক থেকে ১০,০০০ টাকা এনে ঝাড়সুগুদাতে পাঠালাম। National Bank-এ চেক দিয়ে ২৫,০০০ টাকা বেংগল টিম্বার কোম্পানিকে দিলাম। ১১,০০০ টাকা Mackenzie Lyall & co-কে দিলাম, D. L. মার্কা টিক টিম্বার তাদের থেকে কেনার জন্য। কার্জন থিয়েটারে গেলাম, complimentary টিকিট পেয়ে। শ্রীযুত হরিপ্রসাদ নাথের ছেলে গোয়ালপাড়া থেকে এসে হাজির। শিয়ালদহে হরিনাথের সংগে তাঁকে রেখে বি বরুয়াকে খবর দি।

১৪ই এপ্রিল—শিবপুরে আমাদের টিম্বার ইয়ার্ডে তৈরী সুন্দর বাড়িতে আজ আমাদের প্রবেশ। শিবপুরে সবাইকে বড় একটা পার্টি দেওয়া হয়। সবাই খুশী।

জোড়াসাঁকোতে নববর্ষের উৎসবের উপাসনায় গিয়েছিলাম। 'কর্তামশায', মহর্ষিকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলে মহর্ষি আমাকে ও গৃহিনীকে আশীর্বাদ করেন। আমাকে প্রশংসা করে কথা বলছিলেন।

হাওড়াতে আমাদের বাড়িতে 'কলসী-উৎসর্গ' উৎসব করলাম। সকাল নটায়। 'কর্তামশায়' পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সেই উৎসবের কর্তব্য কাজগুলো সমাপন করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যেবেলা গংগার পুলের উপর দিয়ে গাড়ি যেতে আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। গাড়িতে, আমি আমার স্ত্রী ও দাদা (হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আমাদের ঘোড়া লাফ দিয়ে অন্য একটা ঘোড়ার গাড়ির সংগে ধাক্কা দিল। গাড়ি আর ঘোড়ার বিশেষ ক্ষতি হয়নি যদিও, আমরা গাড়িখানা রেখে দিয়ে অন্য একটা ভাড়া গাড়ি করে চলে এলাম।

১৬ই এপ্রিল—সম্বলপুর থেকে সস্ত্রীক জে. এন. সেন আমাদের বাড়িতে। তারপর খেয়ে দেয়ে তাঁরা গেলেন দার্জিলিঙে। আমি শিয়ালদহে তাঁদের গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম।

১৮ই এপ্রিল—জার্ডিনের থেকে ১৫,০০০ টাকার চেক পেয়ে বেংগল ব্যাংকে জমা দিলাম। ১,২০০ টাকা ব্যাংকের থেকে এনে ঝাড়সুগুদাতে পাঠাই। বি বরুয়ার নির্দেশ অনুযায়ী ৩০০ টাকা রবিনারায়ণ বরাকে পাঠালাম। প্রসাদ দাস বড়ালের অফিসে ২,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ভাঙালাম—একশ ৯৭।৶ করে। মোট ২,০৩৭৷৶ পেলাম। এইটে Teak Department এর টাকা।

১৯শে এপ্রিল—বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ১৫,০০০ টাকা জমা দিলাম।

২৫শে এপ্রিল—বেঙ্গল ব্যাঙ্ক থেকে ৮,০০০ টাকা তুললাম।

২৬শে এপ্রিল—আবার ২,০০০ টাকা তুলি। ঝাড়সুগুদাতে ১০,০০০ টাকা পাঠাই। বি বরুয়ার ভাইপো চন্দ্রকান্ত আসাম থেকে এসেছিল। তাঁকে নন্দকিশোরের সঙ্গে ঝাড়সুগুদাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর. সি. নস্করের থেকে দশ হাজার ইট কিনলাম।

২৮শে এপ্রিল—A. B. R-এর Mr. Cheshire আজ আমাদের শ্লিপার 'পাস' করেন। আমি attend করেছিলাম।

২৯শে এপ্রিল—নগাঁও থেকে গোলকচন্দ্র বরুয়া এলেন। বি বরুয়ার কথামতো তাঁকে ঝাড়সুগুদাতে পাঠালাম।

২১শে মে—বিলেতে রাজার করোনেশন উপলক্ষে আসাম থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রীজগন্নাথ বরুয়া বিলেতে যাবার জন্য এলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেন। বি বরুয়া এলেন, তিনি অসুস্থ।

২৩শে মে—শ্রীজগন্নাথ বরুয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়া ক্লাবে যাই। জার্ডিনের থেকে ১৫,০০০ টাকার চেক আনি।

২৪শে মে—বেলেঘাটা থেকে চুন কিনি।

২৫শে মে—হরিনাথের হাতে ১০,০০০ টাকা ঝাড়সুগুদাতে পাঠাই।

২৮শে মে—জগন্নাথ বরুয়া আজ বিলেতে গেলেন। Chord Mail-এ বম্বে গেলেন, সেখান থেকে জাহাজে উঠবেন।

১৬ই জুন—জে এন সেন সস্ত্রীক দার্জিলিঙ থেকে এসে আমাদের বাড়িতে ওঠেন।

১৭ই জুন—ব্যারিস্টার সুকুমার রায় আমাদের বাড়িতে এলেন অতিথি হয়ে।

১৮ই জুন—সেন সম্বলপুরে গেলেন।

২৬শে জুন—ব্যারিস্টার সুকুমার আমাদের বাড়ি থেকে ব্রাহ্মপাড়ার বাড়িতে যান।

২৭শে জুন—বি বরুয়া বিলাসপুরে যান। ব্যাঙ্কে ১৫,০০০ টাকা জমা দি। 'ভারতী' নামে বাঙালী মাসিক পত্রিকায় 'বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধের একটা সমালোচনা লিখে ভারতীতে ছাপানোর জন্য পাঠাই।

১৩ই আগস্ট—বাড়ি তৈরীর কাজ শেষ। খালি রঙের কাজ ও গ্লাস লাগানো বাকী।

২রা সেপ্টেম্বর—জার্ডিনের থেকে ৬২,৫০০ টাকা পাই। তার থেকে ২০,০০০ টিক টিম্বারের খরচা দি।

৩রা সেপ্টেম্বর—'পুত্রবান পিতা' নামের একটা প্রবন্ধ লিখে জোনাকীতে ছাপতে পাঠাই সত্যেন্দ্রনাথ বরার কাছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—শ্রীজগন্নাথ বরুয়া বিলেত থেকে ফিরলেন। সঙ্গে শ্রীবুদ্ধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভট্টাচার্যের সঙ্গে কলকাতায় একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। দেখে ভাল লাগল। ঝাড়সুগুদা স্টেশন থেকে বি বরুয়া ভুবন চন্দ্র বরুয়া ও জগন্নাথ বরুয়ার সঙ্গে একসঙ্গে এসেছিলেন। জগন্নাথ বরুয়া আমাদের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট করলেন। বিকেলে তিনি ইণ্ডিয়া ক্লাবে থাকবেন বলে গেলেন। আমরা অসমীয়ারা তাঁকে হাওড়া স্টেশন থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসি।

১০ই সেপ্টেম্বর—শ্রীজগন্নাথ বরুয়া আসাম রওনা হন। শিয়ালদহে আমরা তাঁকে বিদায় দি। রাত দশটায় তিনি গোয়ালন্দ মেলে চড়লেন।

২১শে সেপ্টেম্বর—বি বরুয়া বিলাসপুর পেঁছান। আজ অরুণার অন্নপ্রাশন উৎসব। সকালেই করা হল। জোড়াসাঁকো থেকে কর্তামশায় পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যারত্ন উপাসনাদি করলেন। বি বরুয়া অরুণার মুখে ভাত দিলেন। সব কিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর—বি বরুয়া বিলাসপুরে গেলেন।

১০ই অক্টোবর—আমি আজ রাত দশটায় গোয়ালন্দ মেলে চড়ে আসাম যাত্রা করি।

১৩ই অক্টোবর—সকালে গোয়ালন্দে জাহাজে উঠি।

১৪ই অক্টোবর—জাহাজে।

১৫ই অক্টোবর—গৌহাটিতে। হেম গোঁসাই ও সত্যেন্দ্রনাথ বরার সঙ্গে দেখা করি। হেম গোঁসাই আমাকে ডাক বাংলোয় খাইয়ে রাত্রে A. B. R গাড়িতে তুলে দেন।

১৬ই অক্টোবর—গোলাঘাটে কমারবন্ধা রোড স্টেশনে নামি। শ্রীনাথ দাদা

সেখান থেকে নিয়ে গেলেন এসে। তাঁর বাড়িতেই উঠি। সেখানে মাতৃদেবীকে দেখে কি আনন্দ হল।

১৭ই অক্টোবর—গোলাঘাটে। সেখানে ১৯ তারিখ অবধি ছিলাম।

২০শে অক্টোবর—যোরহাটে এলাম। সেখানে ২৪ তারিখ অবধি শ্রীযুত গোবিন্দদাদার কাছে ছিলাম।

২৩শে অক্টোবর—শ্রীজগন্নাথ বরুয়ার বাড়িতে গোবিন্দ দাদার সংগে নেমন্তন্ন খেলাম। দুজনের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল, তা দূর হল।

২৪শে অক্টোবর—সেখান থেকে ককিলামুখ 'পেংগুইন' জাহাজে উঠে ডিবরুতে। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা আমাকে জাহাজঘাটি থেকে আনলেন। ডিবরুতে ছিলাম জগন্নাথ দাদার বাড়িতে। শুনলাম, শ্রীনাথ দাদার ছেলে হয়ে মারা গেছে গোলাঘাটে। আমার খুব খারাপ লাগল।

২৬শে অক্টোবর—ডিব্রুগড় থেকে শ্রীযুত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার সংগে তামোলবারী চা বাগানে গেলাম। সেখানে বিষ্ণু আগরওয়ালার সংগে দেখা হয়। সেখানে ৩০শে অক্টোবর অবধি আনন্দে ছিলাম। ৩০শে চন্দ্রকুমারের সংগে ডিগবৈ গেলাম। সেখানে আমার দাদা জয়কৃষ্ণ ছিলেন। তার সংগে এক রাত ছিলাম।

৩১শে অক্টোবর—ডিবরু ফিরে এসে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার বাড়িতে থাকি। আগরওয়ালা আমাকে খুব যত্ন করতেন। তিনি আমার স্ত্রীর জন্য রেশমের রিহা-মেখলা পাঠিয়ে দিলেন। আমাকেও কাপড় দেন। আমার 'হরিভক্ত' কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সংগে দেখা হল সেখানে।

২রা নভেম্বর—ডিবরু থেকে এসে রাত্রে জাহাজে ঘুমোলাম। কারণ সকালেই জাহাজ ছাড়বে। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাও আমার সংগে। জাহাজটির নাম বজার্ড। আগরওয়ালা তেজপুরে নামলেন। আসবার আগে দাদা জগন্নাথ বেজবরুয়ার বাড়িতে ভাত খাই।

৪ঠা নভেম্বর—চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা তেজপুরে নেমে যায়। গৌহাটির জাহাজঘাটে দুতিন মিনিটের জন্য হেমচন্দ্র গোঁসাইয়ের সংগে সাক্ষাৎ ঘটে। বেশীক্ষণ কথা বলতে না পারায় ভাল লাগল না।

৬ই নভেম্বর—গোয়ালন্দ ঘাট। রেল আসতেই স্টেশনে ই. বি. আরের চীফ এঞ্জিনীয়ার আর এজেণ্ট রায়বাহাদুর বলরামকে তার সেলুন গাড়িতে

দেখি। তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে আগ্রহের সংগে তুলে নেন। তাঁর সংগে শিয়ালদহ পর্যন্ত আসি। স্টেশনে গৃহিনী ও বেবী অরুণার সংগে সাক্ষাৎ।

১৩ই ডিসেম্বর—বি বরুয়া আহমেদাবাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে চাওয়াতে তেজপুরের শ্রীপদ্মনাথ বরদলৈকে আমি টেলিগ্রাম করে দি যাতে তিনি ডেলিগেট করে দেন বি বরুয়াকে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এমন ভাবেই কাজকর্ম চালিয়েছিলাম। আর আমাদের ব্যবসা আরও বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বছরের শেষের দিকে বি বরুয়া আর আমার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। ভূমিকম্পের কম্পন অনুভব করলাম ১৯০৩ সালের শেষের দিকে আর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কম্পনে এতদিনের তৈরী বাড়িটা ভেঙে গেল। অবশ্যি তখনও আমি এইরকম ভাবেই কাজ চালিয়েছি। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার লেখা ডায়েরীর পাতা শোকাবহ হয়ে ওঠে।